যেমন দেখেছি ওয়ান ইলেভেন

আহমেদ মূসা

আহমেদ মূসার জন্ম ১৯৫৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই-হাজার থানার ইজারকান্দি গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা একুশ। প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাসসমগ্র, নির্বাচিত গল্পগ্রন্থ, মঞ্চ ও টিভি নাটকসমগ্র। শিশুদের জন্য প্রকাশিত হয়েছে দু'টি গ্রন্থ। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড-বিরোধী এবং মুক্তিযুদ্ধ-কেন্দ্রিক কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। রয়েছে ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস ও প্রবাসজীবন-কেন্দ্রিক উপন্যাস। অনেক টিভি নাটক ও ধারাবাহিক নাটকের নাট্যকার তিনি। প্রদর্শিত হয়েছে তার মঞ্চ নাটকও।

সরাসরি দলীয় রাজনীতি করেছেন প্রায় একযুগ। বর্তমানে দলীয় কোনো রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা নেই। পেশাগত জীবনে সাংবাদিকতার বাইরেও তিনি ছিলেন বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক। বাংলাদেশে সর্বশেষে যুক্ত ছিলেন বাংলাভিশন ও *সাপ্তাহিক ২০০০*-এর সঙ্গে। চার বছর ধরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী। প্রথাগত শিক্ষা শেষ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন স্মৃতি পুরস্কারসহ কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছেন।

প্রচ্ছদ

নিয়াজ চৌধুরী তুলি

ওয়ান ইলেভেন-এর কর্তাব্যক্তিরা উদ্ধার-কর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অবশেষে প্রস্থান করেছেন বাস্কেট-কেস হয়ে।

জনতার কাছে তারা প্রথমে ছিলেন তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক, মিশরের নাসের, লিবিয়ার গাদ্দাফী বা ঘানার নক্রুমার মতো।

কিন্তু তাদের পরিণতি হয়েছে উগান্ডার ইদি আমিন, পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খান বা বাংলাদেশের এরশাদের মতো।

ওয়ান ইলেভেন-এর অংশ-বিশেষ কাছে থেকে দেখার সুবাদে পর্যবেক্ষণসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ এবং অন্য অনেক অজানা তথ্যসমৃদ্ধ রচনা নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে– বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিক আহমেদ মূসা'র *যেমন দেখেছি ওয়ান ইলেভেন*।

বইয়ের শিরোনাম লেখাটি বই প্রকাশের আগে অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

বইটিতে ওয়ান ইলেভেন-এর ওপর লেখাটি ছাড়াও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থকারের আরো কিছু লেখা রয়েছে। এসব লেখায় বেশ কিছু অকথিত-অনুক্ত তথ্য আছে, যা আগ্রহী পাঠক ও গবেষকদের খোরাক জোগানোর পাশাপাশি ভবিষ্যৎ রাজনীতির ইতিহাস রচনায় সামান্য হলেও অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। গ্রন্থের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে কয়েকটি সাক্ষৎকারও এ গ্রন্থে মলাটবন্দি করা হলো।

সূচীপত্র

ISBN 978-984-8558-06-5

যেমন দেখেছি ওয়ান ইলেভেন

আহমেদ মূসা

সূচীপত্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

সূচীপত্র

প্রকাশক □ সাঈদ বারী
প্রধান নির্বাহী, সূচীপত্র
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন □ ০১৭৬৬-১০৯৫০২

যেমন দেখেছি ওয়ান ইলেভেন

আহমেদ মূসা

গ্রন্থস্বত্ব © গ্রন্থকার
প্রথম প্রকাশ □ জানুয়ারি ২০১৫
প্রচ্ছদ □ নিয়াজ চৌধুরী তুলি
বর্ণবিন্যাস □ রেজোয়ানা জামান
মুদ্রণ □ সাদাত প্রিন্টিং প্রেস, ১৪ কবিরাজ গলি লেন, ঢাকা ১১০০

ভারতে পরিবেশক □ রাজু বুক স্টোর স্টল নং ৭, ব্লক-২, কলেজ স্কয়ার (দক্ষিণ), সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশক □ মুক্তধারা জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক, www.muktadhara.com, যুক্তরাজ্যে পরিবেশক □ সঙ্গীতা লিমিটেড ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, কানাডায় পরিবেশক □ এটিএন বুক এন্ড ক্রাফ্‌টস ২৯৭০ ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউ, টরেন্টো, অনলাইন বুকশপ □ www.rokomari.com/sucheepatra

Jemon Dekhechi One Eleven by Ahmed Musa. Published by Saeed Bari, *Chief Executive*, Sucheepatra, 38/2Ka Banglabazar Dhaka 1100, Bangladesh.
Ph : (+88) 01766-109502, e-mail : saeedbari07@gmail.com,
www.facebook.com/groups/sucheepatra
Price : BDT.300.00 Only. US $ 10.00 £ 7

মূল্য : ৳ ৩০০.০০ মাত্র

ISBN 978-984-8558-06-5

এই বইয়ের বিষয়বস্তু ও মতামত গ্রন্থকারের নিজস্ব -প্রকাশক

www.priyodeshnews.com

উৎসর্গ

পুত্রবৎ মঈনউদ্দিন আহমেদ

গ্রন্থ সম্পর্কে

ওয়ান ইলেভেনের ওপর লেখাটি ছাড়া বাকিগুলো সাপ্তাহিক ২০০০, ঠিকানা, আজকাল, প্রবাস ও বর্ণমালায় প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে আমার নেয়া কয়েকটি সাক্ষাৎকারও যুক্ত করলাম। এ গ্রন্থের অনেকগুলো লেখায় বেশ কিছু অকথিত-অনুক্ত তথ্য আছে। এগুলো আগ্রহী পাঠক ও গবেষকদের খোরাক জোগানোর পাশাপাশি ভবিষ্যৎ রচনায় সামান্য হলেও অবদান রাখার আশা আমি করি। তথ্যগত বা যে-কোনো প্রকারের ভুল যদি কারো কাছে ধরা পড়ে, সংশোধনের স্বার্থে আমাকে অবগত করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

সূচীপত্রের সাঈদ বারীকে ধন্যবাদ তার বিরামহীন তাগাদা, বইটি প্রকাশ এবং আমার সঙ্গে কিছু ঝুঁকি শেয়ার করার জন্য।

আহমেদ মূসা
১৬ ডিসেম্বর ২০১৪

সূচি

যেমন দেখেছি ওয়ান ইলেভেন ১১
অন্য বিচারগুলো কি রোজ হাশরের ময়দানের জন্য তোলা থাকবে ৩০
কানু ছাড়াও আছে গীত ৩৪
বাংলাদেশের জন্ম-শত্রু প্রতিরোধ আন্দোলনের অনুক্ত কথা ৩৮
হায় প্যালেস্টাইন ৪৯
মাদ্রাসা শিক্ষা : দায়-দরদ বনাম ধিক্কার-বিদ্রুপের কথা ৫৪
মোমের আগুনে দাবানলের উত্তাপ ৬৫
ভারতপন্থিতা ও বিরোধিতা নিয়ে কথা ৭৭
ইতিহাসের সঙ্গে রসিকতার খেসারত ৮৬
বিজয়ের আলোয় আলোয় ৯১
এক মহান মওলানার কথা ৯৫
হুমায়ূন আহমেদ ও আইডিয়ার জীবন ৯৭
মানব-মণীষা কলিং-বেল টিপছে মহাকাশে ১০১
স্বদেশ-প্রবাস কথকতা ১০৩
নিউ ইয়র্ক, অরুন্ধতী রায় ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ১০৫
সাত শ' কোটিতম শিশুদের কানে কানে... ১০৮
বই নিয়ে কথা আছে বৈকি ১১১
উন্মুল আবহে গ্রন্থ-বান্ধবদের সংগ্রাম ১১৪
একটি নাটক ও দুই দিকপাল ১১৬
স্বপ্নের ফেরিওয়ালা এক সাংবাদিকের কথা ১১৯

মুখোমুখি পর্ব ১২২
এক. আবুল কাশেম ফজলুল হকের মুখোমুখি ১২২
দুই. হায়দার আকবর খান রনোর মুখোমুখি ১২৪
তিন. মমতাজউদদীন আহমদের মুখোমুখি ১২৮
চার. ড. নূরন নবীর মুখোমুখি ১৩৩
পাঁচ. গৌতম ঘোষের মুখোমুখি ১৩৫

যেমন দেখেছি ওয়ান ইলেভেন

এক : বুলেটের পথ-প্রদর্শনের কাল

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে সেনাবাহিনীর কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তার আগ্নেয়াস্ত্রের ঔরষ এবং ফখরুদ্দিন আহমদ সরকারের জঠর থেকে ওয়ান ইলেভেন 'ভূমিষ্ট' হওয়ার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমি বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়ার গুলশানের বাসায় গেলাম পরিস্থিতি বোঝার জন্য। গিয়ে দেখি ড্রইংরুম ভর্তি মানুষ। মান্নান ভুঁইয়া এর-ওর কথায় মাথা নাড়ছেন, কখনো ডানে-বায়ে, কখনো উপরে-নিচে। এক পাশে কালো চশমা পরা হারিস চৌধুরী। আমি বসার পর ডক্টর মঈন খান আমাকে প্রশ্ন করলেন, ইয়াজউদ্দিন সাহেবের ভাষণ শুনে কি মনে হলো? 'দেশ দুর্নীতিতে ভরে গেছে'– এ লাইনটি কেমন হয়ে গেল না?

আমি বললাম, ভাষণটি কলম-কালি দিয়ে লেখা হয়নি, লেখা হয়েছে বেয়োনেট দিয়ে।

সায় দিলেন অন্যরা। আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর সবাই উঠে গেলেন আস্তে আস্তে। হারিস চৌধুরীও। এরপর হারিস চৌধুরীকে বাংলাদেশে আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। তিনি এখনোও নিখোঁজ।

ওয়ান ইলেভেনের সময় কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ-প্রচার সম্পাদক হিসেবে একটি ক্ষুদ্র পদে আমার অবস্থান থাকলেও তৎকালীন মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়ার সঙ্গে প্রায়-সর্বক্ষণ থাকার সুবাদে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আমি নীরব সাক্ষী। অনেক দিন ধরেই অনেকে আমাকে বলে আসছেন, সংস্কার প্রস্তাবের আদ্যাপান্ত অত্যন্ত কাছে থেকে দেখেছেন, বিভিন্ন জনের ভূমিকা প্রকাশ করেন না কেন। জবাব না দিয়ে আমি নিশ্চুপ থেকেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য সব সময়ই নিশ্চুপ থাকব। কারণ, আমি দেখেছি, ওয়ান ইলেভেনের সময় যারা মান্নান ভুঁইয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, সেটা তারা অনেকটা করেছেন প্রাণের ভয়ে, সম্মানহানির ভয়ে, গ্রেফতারের ভয়ে। মানুষের অসহায় অবস্থা নিয়ে কাহিনী ফাঁদা বা তাদের দুর্বল জায়গায় আঘাত করা আমার সংস্কৃতি ও রুচি অনুমোদন করে না। আবার সমসাময়িক কালে বিএনপির নেতৃবৃন্দের বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হিসেবে অনেক ক্লাসিফায়েড তথ্যের সঙ্গেও আমাকে জড়িত থাকতে হয়েছে। নৈতিক কারণে সে-সবও প্রচার-প্রকাশ থেকে বিরত থাকবো। তবে এসবের বাইরেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আছে, যেগুলো ইতিহাসের উপাদান হতে পারে। ভবিষ্যতের গবেষকদের গবেষণায় এসব কাজে আসতে পারে। কাজে আসতে পারে রাজনৈতিক কর্মীদেরও। সেই লক্ষ্যে নিয়েই আমার এই স্মৃতিচারণ।

মান্নান ভুঁইয়া জরুরি টেলিফোন পেয়ে ড্রইং রুম থেকে মোবাইল হাতে উঠে গেলেন ভেতরের দিকে। আমি অপেক্ষা করতে থাকি তার জন্য। ফাঁক পেয়ে মান্নান ভুঁইয়ার ড্রাইভার জাহাঙ্গীর এসে আমাকে বললেন, স্যার, সেদিন যে পরামর্শ দিয়েছিলেন সেটা হলেও আজ এই অবস্থা হতো না।

'সেদিন' মানে জানুয়ারির দুই বা তিন তারিখের ঘটনা। বিএনপি অফিসে গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আমি ও সাংবাদিক নেতা আবদুর রহমান খান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। অনেক যুক্তিতর্কের পর আমরা তিনজনই পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিএনপির একটি আশু করণীয় সম্পর্কে একমত হলাম। ফর্মূলাটি হচ্ছে, বিএনপি ঘোষণা করে দিক, যেহেতু সব দলই নির্বাচন বর্জন করেছে, সেহেতু বিএনপিও নির্বাচনে যাবে না। এই পরিস্থিতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যা ভালো হয় করবে। তাতে বিএনপির কোনো দায়-দায়িত্ব থাকবে না, কারণ বিএনপি তো আর সরকারে নেই। জটিল পরিস্থিতি থেকে বিএনপি-র বের হয়ে আসার এটাই হবে সম্মানজনক পন্থা। কিন্তু এই ফর্মূলা সর্বোচ্চ মহলে কিভাবে পৌছানো হবে। আমরা তো বিএনপি'র নীতিনির্ধারকদের কেউ না। তখন গয়েশ্বর রায় ও আবদুর রহমান খান আমাকে বললেন বিষয়টা মহাসচিবের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়ার কাছে তুলে ধরতে। এর মানে আমি মহাসচিবকে বলব, তিনি ম্যাডামকে বলবেন। জরুরি কাজে মান্নান ভুঁইয়া তখন শিবপুর। বিকেলে ফিরে হাওয়া ভবনে ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা। আমি তাঁর বাসায় গিয়ে বসে থাকলাম। বিকেলে উনি ঢুকেই হাত মুখ ধুয়ে কাপড় পাল্টে হাওয়া ভবনে যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন। ভাবছিলাম চা খাওয়ার সময় কথাটা তুলব। কিন্তু তিনি চা না খেয়েই গাড়িতে উঠলেন। আমি পাশে গিয়ে বসলাম। বাসা থেকে হাওয়া ভবন খুব বেশি দূরে নয়। আমি দ্রুত আমাদের 'ফর্মূলা' তুলে ধরলাম। মনে হলো সিরিয়াসলিই নিয়েছেন। তাঁর সহকারী শাহানশাহ শাহীনও সায় দিলেন। মান্নান ভুঁইয়া কিছু টেকনিক্যাল প্রশ্ন করলেন, আমি সাধ্যমতো জবাব দিলাম। বাকি দু'জনের রেফারেন্সও দিলাম। অনুরোধ করলাম বিষয়টি ম্যাডামের কাছে তুলে ধরতে। উনি দ্রুত ম্যাডামের রুমে ঢুকে গেলেন। এই অফিসে আমার খুব একটা আসা হয়নি। আমার কর্মক্ষেত্র নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় অফিস ও মহাসচিবের বাসা। হাওয়া ভবন তখন ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় নির্বাচনপন্থীদের দখলে। এর মধ্যেই 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' অনেকে নির্বাচিত হয়ে বসে আছেন। অনেকেই এই নির্বাচনের বিপক্ষে হলেও মুখে তেমন প্রতিবাদ করেন নি। কারণ সর্বোচ্চ মহল ছিল নির্বাচনের পক্ষে। যাদের আগে কখনো হাওয়া ভবনে দেখা যায়নি তাদের কেউ কেউ নিয়মিত এক ধরনের 'পাহারা' দিতো, যাতে অন্যপক্ষ ম্যাডামের কাছে ঘেঁষতে না পারে। অবশ্য মহাসচিবের যাতায়াত ছিল অবাধ।

ঘন্টা খানেক পর ম্যাডামের কক্ষ থেকে বের হয়ে এলেন মান্নান ভুঁইয়া। বাইরে অপেক্ষারত কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে গাড়িতে উঠলেন। আমি প্রশ্নবোধক চোখে তাকালাম। কিছু বললেন না তিনি। শেষে জিজ্ঞেসই করে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ধমকে উঠলেন, রাখেন আপনেগো ফর্মূলা। ওইখানে মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে তোড়জোড় চলছে আর আপনারা বলছেন নির্বাচন বর্জন করতে।

তাঁর কথায় তখন বুঝতে পারলাম না, আমাদের বক্তব্যটা তিনি ম্যাডামের কাছে তুলতে পেরেছিলেন কি না। আমরা সবাই চুপ করে রইলাম। একটু পর তিনি

স্বগত-উক্তি করলেন, আমি অবশ্য ম্যাডামকে বলে এসেছি, ম্যাডাম আপনি ২২ তারিখ পর্যন্ত যেতেই পারবেন না। পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে।

একথা শুনে মনে হলো তিনি হয়তো আমাদের বক্তব্যটা তুলে ধরেছিলেন। তার স্বভাবের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, কথা পুরোটা শেষ করতেন না। বাকিটা ইঙ্গিতে বুঝে নিতে হতো। আমাদের পুরো ঘটনার নীরব সাক্ষী ছিলেন শাহিন ও জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর সেটাই বলতে চাইছিলেন।

মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে তোড়জোর ভালোভাবেই চলছিল। ওয়ান ইলেভেনের আগের দিন আমি বিএনপির আরেক গুরুত্বপূর্ণ নেতার বাড়িতে গিয়েছিলাম দলের কাজে। কথায় কথায় সেই নেতা আমার কাছে জানতে চাইলেন, এবার তথ্যমন্ত্রী কাকে করা হলে ভালো হবে। আমি বিএনপির তথ্যের সঙ্গে জড়িত ছিলাম বলেই হয়তো ভদ্রতাসূচক জিজ্ঞাসা। সেখানে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্যও উপস্থিত ছিলেন। আমি বললাম, একটু চিন্তা করে জানাবো। তারপর বললাম, মন্ত্রিসভার চিন্তা করছেন, আমার তো মনে হয় মার্শাল ল হয়ে যাবে। তারা আমার কথা কানে তুললেন না। প্রায়-মার্শাল ল হওয়ার দিন-তিনেক পর তাদের সঙ্গে আবার দেখা হলে দু'জন চেপে ধরলেন আমাকে, সেদিন আপনি কি করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আপনি কি আগে থেকেই কিছু জানতেন? আমি জবাব দিলাম, না, জানতাম না। স্রেফ ইন্টুয়েশন থেকে বলছি। আমার সিক্স সেন্স প্রবল।'

একটি দল লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জিতেও আসলে কিভাবে হেরে যায়, বাংলাদেশে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ১৯৯৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন। এরপরও বিএনপি ২০০৭ সালে আবার আরেকটা একতরফা নির্বাচনের দিকে গেল। আর আওয়ামী লীগের সামনে দু'টো উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি মহা-একতরফা নির্বাচন করল। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া হলো না।

ওয়ান ইলেভেনের পরপরই ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হলো। কাউকে বাসা থেকে তুলে নেয়া হলো, কাউকে খবর দেওয়া হলো ডিজিএফআই অফিসে যোগাযোগের জন্য। গেলেই গ্রেফতার করে জেলে। অনেককে ফোন করা হতো গভীর রাতে। যেতে ইতস্তত করলে বলা হতো, আপনার অসুবিধা থাকলে আমরা বরং আর্মির গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি...। তখন হুড়মুড় করে চলে যেতেন সবাই। এতে জান কিছুটা ঝুঁকিতে পড়লেও মানটা বেঁচে যেত। মন্দের ভালো। এভাবে খবর দেওয়া হলো মোসাদ্দেক আলী ফালুকে যাওয়ার জন্য। তিনি যাওয়ার আগে দেখা হলো তাঁর সঙ্গে। এমরান সালেহ প্রিন্স কিছু একটা বলতে গেলে প্রায় ধমক দিয়ে তিনি বললেন, প্রিন্স বেশি বুঝতে যেও না। বেশি বুঝতে গেলে কি হয় দেখছো না? চুপ করে গেলেন প্রিন্স। ফালু সাহেব সবার সঙ্গে বিদায়ী করমর্দন করে হাত বাড়ালেন মান্নান ভুঁইয়ার দিকে। মান্নান ভুঁইয়া ম্লান কণ্ঠে বললেন, 'উইস ইউর গুলোাক'। সবাই হেসে উঠলেন। যদিও ব্যাপারটা ছিল করুণ। দেখা করার পর তাকেও যথারীতি জেলে পাঠানো হলো। শুনেছি তাঁর ওপর অনেক ধকল গেছে।

দুর্নীতির জন্য হোক বা অন্য যে কারণেই হোক বাংলাদেশের বহু রথী-মহারথীকে গ্রেফতার করা হয়। যারা জেলে ছিলেন, তাঁদের জন্য রাজনৈতিক ভাবে শাপে-বর হলো। পরবর্তীকালে তাঁরা চিহ্নিত হলো 'সংগ্রামী' বলে। যারা পালিয়ে গেলেন তাঁরাও

'বীরের মর্যাদা' পেলেন পরে। সমস্যায় পড়লেন তাঁরা, যাঁরা জেলে যাননি এবং পালাননি। যাদের জেলে নেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে দুর্নীতিবাজ বা অপরাধী ছিলেন না এমন নয়, তবে অনেক ঠুনকো অভিযোগেও জেলে যেতে হয়েছে অনেককে। কিন্তু একথা সত্য যে, মন্দের ভালো যারা তাদের বড় অংশ খপ্পরে পড়েন বন্দুক-তাড়িত সংস্কারের। একটি ক্ষুদ্র অংশ জেল ও সংস্কারের বাইরে থেকে সনাতনপন্থী বিএনপির পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদের অনেককেও এজন্য জেল খাটতে হয়েছে। অবশ্য তাঁরাও দাঁড়িয়ে ছিলেন ওয়ান ইলেভেন গং-য়ের দ্বিধাবিভক্ত একটি গ্রুপেরই ইশারা পেয়ে।

ওয়ান ইলেভেন ওয়ালারা যাদের সংস্কারের টার্গেট করেছিলেন তাদের ভয়ভীতি দেখানোর সব কৌশলই প্রয়োগ করেন। একদিন দেখা গেল মান্নান ভুঁইয়া যে ভবনে থাকেন সেটি সেনাবাহিনী ঘেরাও করে সেই ভবনের এক ফ্লাট থেকে তুচ্ছ এক রাজনীতিককে গ্রেফতার করেছে। অনেকেই অনুমান করেন, এটি ছিল মান্নান ভুঁইয়াকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য। গভীর রাতে মান্নান ভুঁইয়াকে তুলে নিয়ে বিশেষ বাহিনীর গাড়িতে ঘুরিয়ে আবার নামিয়ে দেওয়া হতো। এটা করা হয়েছে বস্তুত গাড়িতে বসে আলোচনার নাম করে, যদিও এসব আলোচনা ফোনেই করা যায়। তা ছাড়া, ফোনে যারা আড়ি পাতেন, ঐ-সব গাড়ি তো তাদেরই।

আমার ধারণা, এসব ঘটনায় মান্নান ভুঁইয়া ভয়ও পেয়েছিলেন। এমন অবস্থার মধ্যে একদিন সকালে তাঁর বাসায় গিয়ে দেখি খুব চিন্তিত মুখে বসে আছেন। কথা শুরুর পর তিনি বললেন, আমাকে কিছু লোক খুব বিপদে ফেলেছে। আমাদের শতাধিক এক্স-এমপিকে ওয়ান ইলেভেন ওয়ালারাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ফেরদৌস কোরাইশির পিডিএফ পার্টিতে যোগ দিতে। কিন্তু তাঁরা সবাই একই কথা বলে এসেছেন যে, ফেরদৌস কোরাইশীকে দিয়ে পার্টি হবে না, বরং মান্নান ভুঁইয়া ও আওয়ামী লীগের আবদুল জলিলকে সামনে রেখে কিছু করতে পারেন কি না দেখেন। ডিজিএফআই এখন সে লাইনে এগুচ্ছে।

ঘটনা সেভাবেই গড়াতে থাকে। মান্নান ভুঁইয়া কয়েকদিন ধরে তাঁর কাছের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। এ ধরনের আলোচনার সময় আমি সাধারণত চুপই থাকতাম।

ওয়ান ইলেভেন ওয়ালারা দুই নেত্রীকে মাইনাস করার জন্য বিএনপি ও আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকার পাশাপাশি দুইনেত্রীকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার জোর তৎপরতা শুরু করে। যখন এটা প্রতীয়মান হয়ে ওঠে যে, দুই নেত্রীকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হবে তখন মান্নান ভুঁইয়া সংস্কারের ব্যাপারে সিরিয়াস হন। সেই পর্বে তাঁর তুলে ধরা যুক্তি ছিল, ওয়ান ইলেভেন ওয়ালারা যদি বেগম খালেদা জিয়াকে রাজনীতি করতে না-ই দেয় বা বিদেশে পাঠিয়ে দেয় তা হলে বিএনপির নেতৃত্ব এমনিতেও তাঁর ওপর এসে পড়ে। সুতরাং অবস্থান নিতে দোষ কোথায়। অর্থাৎ মান্নান ভূঁইয়া তাঁর মৌলিক চিন্তাটাই শুরু করেন 'খালেদা জিয়া দেশে থাকবেন না' সেখান থেকে। তাঁর মৌলিক জায়গাটি বা ভিত্তিটি যে যে-কোনো সময় নড়ে যেতে পারে সেটা তিনি হিসেবের মধ্যে রাখেন নি। মান্নান ভূঁইয়ার তুলে ধরা প্রস্তাবের একটি বাক্য 'বিএনপির চেয়ারপার্সন পদে দুই টার্মের বেশি কেউ থাকতে

পারবে না'র সঙ্গে যোগ করা হয় 'ইতিমধ্যে যিনি দুই টার্ম ছিলেন তিনিও থাকতে পারবেন না' – শেষের অংশটি নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক বিতর্ক হয়। এই বাক্য অনুযায়ী খালেদা জিয়া এমনিতেই বাদ পড়ে যান। সংস্কার প্রস্তাব যখন চূড়ান্ত করা হয় তখন শেষের বাক্যটি ছিল না। কিন্তু পরের দিন তিনি এই বাক্যটি যোগ করতে বলেন। খটকা লাগায় আমি তাকে বলি, 'আপনি নিজেই বলছেন ম্যাডামকে ওয়ান ইলেভেন ওয়ালারা রাজনীতি করতে দেবে না, তাহলে এই বাক্যের দরকার কি?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, দরকার আছে, কারণ ওরা চাচ্ছে। ম্যাডামকে বাইরে পাঠাতে চাপ সৃষ্টির জন্য এই বাক্য ওরা দরকার মনে করছে।

'ওরা' কারা বুঝতে বাকি থাকার কথা নয়। ২০০৭ সালের জুনে এই বাক্যসহ-ই উপস্থিত নেতাদের সবাইকে একটি করে কপি দিয়ে এবং পড়ে শুনিয়ে মান্নান ভুঁইয়া সাংবাদিকদের সামনে পাঠ করেন। কথা ছিল পাঠের সময় সব নেতাও উপস্থিত থাকবেন ড্রইং রুমে। কিন্তু প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার এতো বেশি সংখ্যক সাংবাদিক সেদিন উপস্থিত থাকায় অর্ধেক লোকেরও দাঁড়াবার জায়গা ছিল না। বিশেষ করে টিভি ক্যামেরা স্থাপনের কোনো জায়গাই ছিল না। তাই সিদ্ধান্ত হলো, ভবনের নিচে গ্যারেজে মান্নান ভুঁইয়া সংস্কার প্রস্তাব পাঠ করবেন। অন্য নেতারা ড্রইং রুমেই থাকবেন, তবে সম্মেলনের আগেই অন্য নেতাদের ছবি তুলে নেয়া হবে। সে অনুযায়ী সাইফুর রহমানসহ বাকি সব নেতার ছবি তোলা হলে। মান্নান ভুঁইয়া তৈরি হলেন নিচ যাওয়ার জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে সব ধরনের ক্যামেরা এড়িয়ে চলতাম। সব সময় মান্নান ভুঁইয়া বা অন্য নেতাদের স্ক্রিপ্টটি ধরিয়ে দিয়ে পেছনে বা এক পাশে গিয়ে বসে থাকতাম। এ ক্ষেত্রে আমার লজিক ছিল, আমার কাজ দলের প্রচার বাড়ানো, নিজের প্রচার নয়। বরং নিজের প্রচার বেশি করতে গেলে নানাজনের ঈর্ষার শিকার হতে হয়। তার চেয়ে লো-প্রোফাইলে থেকে কাজ করার সুবিধে বেশি। কিন্তু সংস্কার প্রস্তাব ঘোষণার দিন এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। নিচে নামার সময় সিড়িতে প্রচণ্ড চাপে চিড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়ার অবস্থা। কোনো রকমে নিচে নেমে মান্নান ভুঁইয়া একটা চেয়ারে বসলেন। প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কিতে তাঁর ঘাড়ের ওপর যাতে কেউ এসে না পড়েন সে জন্য আড়াল দিয়ে রাখতে গিয়ে এগার বছরের মধ্যে বলতে গেলে এই প্রথম তাঁর কাছাকাছি আমিও ফ্রেমবন্দি হয়ে পড়ি। তিনি সংস্কার প্রস্তাব পাঠ করে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

এর আগে নেতাদের পাঠ করিয়ে শোনানোর সময় কোনো নেতাই আলোচিত বাক্যটির প্রতিবাদ করেননি। কিন্তু সংস্কার ব্যর্থ হবার লক্ষণ দেখা যাওয়ার পর কেউ কেউ ইনিয়ে-বিনিয়ে বলার চেষ্টা করেন যে, তিনি ঐ বাক্যটির পক্ষে ছিলেন না। বিএনপিতে নতুন করে ঠাঁই পাওয়ার জন্য তারা আরো অনেক কথাই বলতে থাকেন। এমন কি তারাও, অল্প কয়েক দিন আগেও যাদের কেউ কেউ সংস্কারের পক্ষে বিপ্লবী কথাবার্তা বলেছিলেন।

সংস্কার প্রস্তাব একক কারো লেখা বা সম্পাদনা নয়। বেশ কিছু সময় ধরে অনেক আলোচনার পর এটি চূড়ান্ত হয়। মান্নান ভুঁইয়া আরেকটু সময় নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সংস্কারের পক্ষে ওয়ান ইলেভেন ওয়ালাদের সঙ্গে অতিঘনিষ্ঠ কেউ কেউ মান্নান ভুঁইয়ার

ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেন। তাদের একজন এমনকি আমাকেও বলেন যে, মান্নান ভুঁইয়া আরো দেরি করলে তাকে পে-করতে হবে। অর্থাৎ, গ্রেফতার শুরু হয়ে যাবে। তাদের কারো নাম বলে এখন বিপদ ও বিতর্ক বাড়াতে চাই না। সেনাবাহিনী ও বিএনপির শীর্ষ মহলের সবই জানা ।

আলেচিত বাক্যটি নিয়ে প্রথম মান্নান ভুঁইয়ার কাছে এমন একজন প্রশ্ন তুলেছিলেন যার অবস্থান থেকে তা করার কথা নয়। তার নাম হাবিবুল আলম চৌধুরী ববি, ঢাকা মহানগর বিএনপির প্রচারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি। জবাবে মান্নান ভুঁইয়া ববিকেও একই যুক্তি দিয়েছিলেন।

আমার জানা ও জ্ঞানমতে, ওয়ান ইলেভেন-সংস্কার মূলত ব্যর্থ করে দেন বেগম খালেদা জিয়া। শেখ হাসিনা দেশ থেকে বের হয়েই গিয়েছিলেন। খালেদা জিয়াকেও বের করে দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। তিনি বের হয়ে গেলে শেখ হামিনাও আর দেশে ঢুকতে পারতেন না। খালেদা জিয়ার তৎকালীন বিজয়ের বেনিফিশিয়ারি হয়েছেন শেখ হাসিনা। খালেদা জিয়া টিকে যাচ্ছেন দেখে শেখ হাসিনা মরিয়া হয়ে দেশে ঢোকেন। না ঢুকতে পারলে তখনই শেখ হাসিনার রাজনীতির কবর হয়ে যেত। ওয়ান ইলেভেন ওয়ালারা শেখ হাসিনাকে দেশে ঢুকতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা কওে ব্যর্থ হন।

অন্যদিকে দেশে টিকে যাওয়ার জন্য বেগম খালেদা জিয়াকে দিতে হয়েছে চরম মূল্য। তাকে জেলে যেতে হয়েছে। তারেক রহমানের ওপর নেমে এসেছে ভয়ঙ্কর নির্যাতন ও নির্বাসন। আরাফাত রহমানও নিগৃহীত ও নির্বাসিত হন। পরিবারটি ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেছে। খালেদা জিয়ার নিকট-আত্মীয়দের অনেকেও নির্যাতন-হয়রানির শিকার হতে হয়েছেন। বিএনপির অসংখ্যক নেতাকর্মীকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। সে তুলনায় কিছুদিন জেলে থাকা ছাড়া শেখ হাসিনা বা তাঁর পরিবারকে কোনে বিপদে পড়তে হয়নি। এরপরও ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ মরার ওপর খাড়ার ঘা'র মতো বিএনপির ওপর ভয়ঙ্কর ভাবে চড়াও হয়ে দলটিকে নির্মূল করতে চাইছে। রাজনীতির এই নির্দয়তা খুবই মর্মান্তিক।

সংস্কার নিয়ে আলোচনা যখন তুঙ্গে, তখনো মান্নান ভুঁইয়ার অতি নিকটের কেউ কেউ তার সঙ্গে যোগ দেননি। ওদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে আমাকে ফোন করে কথাবার্তা বলতেন। তাদের সঙ্গে আমারও ঘনিষ্ঠতা আগে থেকে। তখন তারা মান্নান ভুঁইয়ার সঙ্গে একমত না হলেও ব্যক্তি মান্নান ভুঁইয়ার ওপর তাদের সম্মান-সহানুভূতি ছিল। তারা অনেক আক্ষেপ করতেন ফোনে। বেগম খালেদা জিয়াকে যখন দেশের বাইরে পাঠাবার আয়োজন শেষের দিকে, একদিন একা পেয়ে আমি মান্নান ভুঁইয়াকে বললাম, আপনার বহু প্রিয় মানুষ আপনার কাজ সমর্থন করছে না। আপনার ভূমিকা ইতিহাস কীভাবে দেখবে বলে আপনি মনে করেন। বিশেষ করে ম্যাডামের বিষয়ে আপনার এখনকার অবস্থান?

জবাবে অনেকক্ষণ চুপ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা সেদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন। জানি না এ কথা তিনি আরো কাউকে বলেছিলেন কী না। তিনি বলেছিলেন, সব কিছু আমার ছক্‌মতো ঘটলে ম্যাডামকে আমরা প্রেসিডেন্ট করে বিদেশ থেকে নিয়ে আসব। তার পরিবারও নিরাপদে থাকবে।

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, ওয়ান ইলেভেন ওয়ালারা এটা মানবেন কেন।

তিনি বললেন, সেনাবাহিনীকে বলব, এ ব্যাপারে জনগণের চাপ আছে। তা ছাড়া পরিস্থিতি তখন আমাদের অনুকূলে থাকবে। বিএনপির কিছু লোকের প্রতি আর্মির কারো কারো খেদ থাকলেও তারা বিএনপিকেই আওয়ামী লীগের চেয়ে বেশি সামনে রাখবে। সুতরাং আমরা তখন সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবো।

এ কথা তিনি বেগম খালেদা জিয়াকে বলতে পেরেছিলেন কী না জানতে পারিনি। তারেক রহমান গ্রেফতার হওয়ার পর তিনি ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কি কথা হয়েছিল প্রকাশ করেন নি। বেঁচে থাকলে হয়তো পরবর্তীকালে জানা যেত।

আবদুল মান্নান ভুঁইয়া যতদিন বিএনপির মহাসচিব ছিলেন তার দলীয় লেখা জোখার কাজ আমি চালিয়ে গেছি। খালেদা জিয়া জেলে যাওয়ার আগে বিএনপির মহাসচিব করে যান আরেক অসাধারণ মেধাবী ও দৃঢ়চিত্তের খন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে, যিনি ছিলেন আবদুল মান্নান ভুঁইয়ার ঘনিষ্ঠতমদের একজন। কাটা দিয়ে কাটা তোলার এই পরামর্শ যিনিই দিয়ে থাকুন না কেন এটি ছিল বিএনপির জন্য বিজ্ঞচিত কাজ। এক সময় নানা কারণে ও দ্বন্দ্বে খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের পদগুলো যখন যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল, তখন আবদুল মান্নান ভুঁইয়াই সেটা ঠেকিয়েছিলেন। আজকাল বিএনপির কেউ কেউ বামপন্থীদের যতই গালাগালি করুক না কেন, বিএনপিকে সামনে রাখা বা পাতে-তোলার মতো লোক বাম-ঘরানা ছাড়া এখনো তেমন নেই। এখনো সামনের কাতারে প্রাক্তন বামেরাই। এখনকার ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবও বাম-ঘরানার এবং মান্নান ভুইয়ার ঘনিষ্ঠতমদের একজন।

আমি দলে থাকতে বলেছি এবং আগে-পরে বার বার লিখেছি যে, বিএনপি সৃষ্টি হয়েছিল আওয়ামী লীগ বহির্ভূত মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে, মওলানা ভাসানীর লোকদের হাতে। বিএনপির গঠনতন্ত্র শুরুই হয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধ শব্দটি দিয়ে। রণাঙ্গনের বহু উজ্জ্বল মুক্তিযোদ্ধা এই দলে ছিলেন। অন্যদিকে, জিয়াউর রহমানকে সামনে রেখে মওলানা ভাসানীর লোকেরাই বিএনপিকে মানুষের ঘরে ঘরে নিয়ে গেছেন। এমন কি মওলানা ভাসানীর ন্যাপের প্রতীক ধানের শীষও তুলে দেওয়া হয়েছিল বিএনপির হাতে। এরাই বিএনপির মূলধারা। জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামী ছাড়া অন্যদলের কিছু রাজাকার ও স্বাধীনতা-বিরোধী ব্যক্তি বিএনপিতে এলেও এরা সব সময়ই ছিল বিচ্ছিন্ন শক্তি। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নরাই জোটের মিত্র জামায়াতে ইসলামী এবং তদজাতীয় কতিপয়ের সঙ্গে মিলে বিএনপিকে মূল জায়গা থেকে সরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে অনেকটা সফল হওয়ায় ওয়ান ইলেভেন-জাতীয় নানা সংকটে পড়তে হয়েছে বিএনপিকে। সে-সব বিতর্ক ভিন্ন।

খন্দকার দেলোয়ার মহাসচিব হওয়ার পর সংস্কারপন্থী অংশের বিএনপিতেও রদবদল ঘটিয়ে সাইফুর রহমানকে সভাপতি ও মেজর হাফিজকে মহাসচিব করা হয়। আমারও ফুরোয় মহাসচিবের হয়ে দলীয় লেখার কাজ। অবশ্য আবদুল মান্নান ভুঁইয়ার জীবনী অনুলিখনের কাজ অব্যাহত রাখি তার মৃত্যু পর্যন্ত। পাশে থাকি বন্ধু ও সুহৃদ হয়ে। আমার অনুলেখন করা মান্নান ভুঁইয়ার দুইটি গ্রন্থ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

অনেকে আমাকে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করে থাকেন, যে, আবদুল মান্নান ভুঁইয়া আসলে কী কী কারণে সংস্কারের সঙ্গে জড়িত হয়ে ছিলেন। আমার দেখা ও

জানার ওপর ভিত্তি করে আমার ধারণাটা তুলে ধরতে পারি। বিএনপি-জামায়াত সখ্যতার প্রশ্নে, রক্ষণশীলদের প্রধান্য বৃদ্ধির কারণে, ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসার পর দলে ও সরকারে একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় এবং বিশেষ বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থার প্রভাব প্রাধান্য পাওয়ায় মান্নান ভুঁইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন না একথা ঠিক। দলে গণতন্ত্রের ঘাটতি ও পরিবারতন্ত্রের ঝোঁক তার পছন্দের ছিল না। এমন কি ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত তিন বছরে নানা মতবিরোধের কারণে বার কয়েক পদত্যাগও করতে চেয়েছিলেন তিনি। বার-তিনেক তাঁর পদত্যাগপত্র আমাকে দিয়ে লিখিয়েও ছিলেন। এসব ক্ষেত্রে হাতের লেখা ব্যবহারের পরামর্শ ছিল আমার। কারণ কম্পিউটারে কম্পোজ করতে গেলেও ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। প্রতিবারই লেখা শেষ করে বলেছি, আপনার নির্দেশ মতো লিখলাম, তবে আমার অনুরোধ, এটি জমা দেওয়ার আগে আরো ভাবুন। অবশ্য আমার অনুরোধে জমা দিতে বিরত ছিলেন ব্যাপারটা এমনও নয়। নানাবিধ কারণে জমা দেওয়া হয়ে উঠেনি। প্রথমবার যখন লিখলাম, আমার 'অসাবধানতার কারণে' ডেইলি স্টারে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নূরুল কবীর সেটি ফাঁস করে দেন যে, মান্নান ভুঁইয়া পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন। রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর নানামুখী চাপে এমন অবস্থা সৃষ্টি হলো, পদত্যাগের কথা ভুলে গিয়ে মান্নান ভুঁইয়াকে রিপোর্টের প্রতিবাদ করতে হলো। সেটিও আমিই লিখলাম। ছাপা হওয়ার পর পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়। সেদিন আমার অনুরোধে নূরুল কবীরের চেষ্টায় মাহফুজ আনাম তথা ডেইলি স্টার একটা ফেবার আমাদের করেছিল। প্রতিবাদপত্র প্রকাশের পাশাপাশি ডেইলি স্টারের ঐতিহ্য অনুযায়ী 'আমাদের প্রতিবেদনের বক্তব্যের ওপর আমরা স্থির আছি'– শব্দটি যোগ করা হয়নি। ডেইলি স্টারের ইতিহাসে সেটাই ছিল প্রথম ছাড়।

ডেইলি স্টারের রিপোর্টে সূত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল 'মান্নান ভুঁইয়ার ঘনিষ্ঠ একজনের'। সেই 'ঘনিষ্ঠ একজন' আমি কি না, এটা মান্নান ভুঁইয়া আমার কাছে জানতে চাইলে জবাব না দিয়ে আমি চুপ করেছিলাম। তিনি যা বোঝার বুঝে নিয়েছিলেন। তবে অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও বড় কাজ করে ফেলতে পারে।

সেই পদত্যাগ-চিন্তার কারণ ছিল, বিএনপির উগ্রপন্থী অংশের নেতারা একটি কর্মসূচি পালনের সময় মাথায় কাফনের কাপড় পরার ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেলার পর মান্নান ভুঁইয়া এর প্রবল বিরোধিতা করেন। এ-নিয়ে অনেক বাদানুবাদ ও উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। দলে এমন আত্মঘাতী, হটকারী ও হাস্যকর চিন্তাও প্রশ্রয় পাওয়াতে তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন।

দ্বিতীয়বার তাঁর পদত্যাগপত্র লিখে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে গুলশনের বাসা থেকে সোজা চলে যাই সাদেক হোসেন খোকার গোপীবাগের বাসায়। গিয়ে দেখি সাদেক হোসেন খোকা, কৃষক দলের মুজিবুর রহমান, জিয়া শিশু-কিশোর সংগঠনের সেলিম সাহেব দুপুরের খাবার খাচ্ছেন। সম্ভবত আবদুস সালামও ছিলেন। আমিও একটি থালা টেনে নিয়ে খেতে খেতে ঘটনা বললাম। সেটা তারা ঠেকিয়ে ছিলেন নানা ভাবে। এ ধরনের পদত্যাগ ঠেকাতে মাহবুব আলম তারাসহ আরো কয়েকজনও ভূমিকা রাখেন।

যা-ই হোক, সংস্কার প্রস্তাবের ঘটনার জন্য উল্লেখিত ব্যাপারগুলো মুখ্য কারণ ছিল না। আমার ধারণা, মূল কারণ ওয়ান ইলেভেন ওয়ালাদের প্রতি ভীতি, কাছের লোকদের গ্রেফতার থেকে রক্ষা এবং দলীয় এমপিদের ফেরদৌস কোরেশীর কিংস পার্টিতে যোগদান প্রতিহত করার প্রচেষ্টা। সেই সঙ্গে দল ও সরকারের শীর্ষতম পদে যাওয়ার ইচ্ছাও কিছুটা কাজ করতে পারে। কারণ, তিনি মানবোত্তর বা দেবদুর্লভ কিছু ছিলেন না, ছিলেন দোষে-গুণেরই মানুষ। অনেকের চেয়ে উন্নত ও সৎ হলেও শেষ পর্যন্ত মানুষইতো। তবে তিনি যে ভয় পেয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের আবদুল জলিলকে ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করে স্বীকারোক্তি আদায়ের পর তিনি আরো ভীত হয়ে পড়েন। চিন্তা ভাবনায় তিনি বেসামরিক জীবনে সেনাবাহিনীর ভূমিকার বিপক্ষে হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকেও গিয়ে পড়তে হয়েছিল সেনাবাহিনীরই কবলে। এটাই তাঁর জীবনের বড় ট্রাজেডি। তার আরেক ট্রাজেডি হচ্ছে, তাঁর কোনো ভুলের জন্য ওয়ান-ইলেভেন আসেনি, অথচ তাকেই এর বড় শিকার হতে হয়েছে। এবং একই ভাবে রাজনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিএনপির মন্দের ভালো অংশ, সর্বোপরি বিএনপি নামক দলটি।

বিচারপতির বয়স বাড়াতে আইন করে যারা পাল্লায় গুড় লাগিয়েছেন (যে গুড় খেতে প্রথমে আসে পিঁপড়ে, সেই পিঁপড়েকে খেতে আসে মাছি, সেই মাছিকে খেতে আসে টিকটিকি, সেই টিকটিকিকে খেতে আসে বেঙ এবং সেই বেঙকে খেতে আসে সাপ) সেই গুড়ের বেপারিদের কোনো শাস্তি-তিরস্কার হলো না। তিরস্কৃত হলেন না তারা যারা ফয়েজি-মার্কা বিচারক দিয়ে এরশাদের মনোনয়ন বাতিল করিয়ে আগুনে ঘি ঢেলেছেন। যারা লুটপাট করে দুর্নাম কুড়িয়েছেন তাদের কিছুই বলা হলো না। যারা সেনাবাহিনীর খেদ ও বিরক্তি কুড়িয়েছেন তারা রইলেন সমালোচনার বাইরে। যারা বাংলা ভাই-জঙ্গী কারখানা বসালেন তাদের দেওয়া হলো বাহবা। যারা ইয়াজউদ্দিনকে দিয়ে একতরফা নির্বাচনের জন্য ম্যাডামকে প্ররোচিত করে অবরুদ্ধ রেখেছেন তারা হয়ে রইলেন বিএনপির 'ত্যাগী' নেতা-পরামর্শদাতা। এদের কারণে ওয়ান ইলেভেন এসে বন্দুকের নলের মুখে যাদের পরাভূত করা হলো তারা হয়ে গেলেন ভিলেন এবং; এমনকি লুটপাটের জলজ্যান্ত নজির স্থাপনের জন্য যারা জেলে গেলেন, ফিরে এসে তারাও হয়ে গেলেন হিরো। আবার ওয়ান ইলেভেনের রথে চড়ে তারাই এলন, যাদের বিএনপি সরকারই অনেককে জিঙিয়ে সেনাবাহিনীর শীর্ষপদগুলোতে বসিয়েছে। জিয়া পরিবারের ওপর অত্যাচারটা তারাই করেছেন। আর জোট-দলের চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোর কৌশলও মানুষ পছন্দ করেনি। এতসব বৈপরিত্য যে নৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করে, বিএনপি আজ সেই সঙ্কটেরই শিকার। বিএনপির আন্দোলনের ডাকে যে আজ মানুষ নামে না– এসবও এর বড় কারণ। যদিও আওয়ামী লীগের ওপর অসন্তুষ্ট মানুষ সুযোগ পেলে হয়তে ভোট দেবে, কিন্তু রক্ত নয়। কিন্তু এ ধরনের ভোট একটা দলকে থোড়াই রক্ষা করতে পারে। এমন নৈতিক ও রাজনৈতিক বৈপরিত্যের ঝাণ্ডা নিয়ে হাঁটা দলটিকে মানুষ সব সময় মাথায় তুলে রাখবে ভাবলে খুবই ভুল হবে।

ওয়ান ইলেভেনের বিষয়ে সোজা-সাপ্টা জবাব অনেকের কাছেই নেই। এটি সামরিক শাসন ছিল না, আবার সামরিক শাসনের চেয়ে কমও ছিল না। একটি নির্বাচিত সরকার যত অযোগ্য, দুর্নীতিবাজ ও স্বৈরতান্ত্রিকই হোক না কেন, সেটা অবশ্যই সামরিক শাসনের চেয়ে ভালো। প্রমাণ, বাংলাদেশের ৪৩ বছরের ইতিহাসের দুই রকমের শাসনামল। দুটি দলের বেসামরিক শাসনের সময়ই দেশের অগ্রগতি বেশি হয়েছে। সে অগ্রগতি অর্থনীতি এবং মননশীলতা দুই ক্ষেত্রেই। বিশেষ করে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সামরিক আমলের চেয়ে বেসামরিক আমলে দ্বিগুন হয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াও এ সময়েই জোরদার হয়েছে।

আবার বাংলাদেশে বেসামরিক শাসন কখনো কখনো এমন স্বৈরতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ করেছে যখন তাকে সামরিক শাসনের চেয়েও বেশি নিগ্রহমূলক দেখা গেছে। বেসামরিক আমলেই ঘটেছে অকাম্য রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডগুলো।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ কিছু কিছু দেশে হয়েছে স্বাগতিকও। ঘানার নক্রুমা, মিশরে নাসের, লিবিয়ায় গাদ্দাফীর ক্ষমতা দখলকে ইতিবাচক ভাবেই দেখা হয়। আবার পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, চিলি, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ নেতিবাচক। আবার কেউ কেউ সমর নায়কদের রাজনীতিতে আসার ঘোর সমালোচক। কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটন, রুজভেল্ট, চার্চিল, দ্য গল, প্রমুখ এক সময় সেনানায়কই ছিলেন।

বাংলাদেশের ওয়ান ইলেভেন প্রথমে ছিল স্বাগতিকই। কিন্তু তা অনেক বিভ্রান্তিরও জন্ম দিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে পরে অনেকেই কনফিউজড হলেও গোড়ায় ছিলেন সমর্থক।

একথা স্বীকার করতেই হবে, ওয়ান ইলেভেনের আগে দেশে নৈরাজ্য ছিল ভয়ঙ্কর। এই নৈরাজ্য বাংলাদেশের অস্তিত্ব ধরে টান দিয়েছিল। তাই জানুয়ারির ১১ তারিখে জরুরি অবস্থার নামে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের পর দেশে ৯৫ শতাংশ মানুষই তাকে স্বাগত জানিয়েছে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। দেশের প্রায় সব শীর্ষস্থানীয় প্রচার মাধ্যম সেনাবাহিনীর কার্যক্রমকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন জানিয়েছে। দু'একটি ছিল ব্যতিক্রম। ওয়ান ইলেভেন রাজনীতিকদের বাইরেও এমন কিছু লুটেরা-দুর্বৃত্তকে জেলে ঢুকিয়েছিল যার নজির অতীতে দেখা যায়নি। কিন্তু অতি দ্রুত তারা সংকটে পতিত হয়। এ ব্যাপারে আমি যতদূর দেখেছি, বুঝেছি ও পরবর্তীকালে শুনেছি সব মিলিয়ে আমার মূল্যায়নে ব্যর্থতার কারণগুলো হচ্ছে :

প্রথমত ওয়ান ইলেভেনের ঘটনার নায়কদের মধ্যে বিভক্তি এসে গিয়েছিল। নিজেরা নিজেদের উচ্চতর পদে প্রমোশন দিয়েছেন। এর আগে-পরের বিভক্তি তাতে আরো জোরদারই হয়। বেগম খালেদা জিয়া বিদেশে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েও যাননি সেনাবাহিনীর একটি অংশের আশ্বাসে। বিএনপির নতুন মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার, হান্নান শাহ প্রমুখ অবস্থান নিতে পেরেছিলেন সে কারণেই। বিএনপির মধ্যস্তরের কিছু নেতা প্রকাশ্যেই বলাবলি করতেন যে, ওয়ান ইলেভেন ওয়ালাদের কিছু উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ডিজিএফ আইয়ের একটি অংশ তাদের সাহায্য করছেন। সংস্কার কর্মসূচি

ব্যর্থ করার জন্যও যে সে অংশ কাজ করছিল তার অন্যতম প্রমাণ, সেনাবাহিনীর চাপে সাদেক হোসেন খোকা সংস্কারপন্থীদের পক্ষে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় দখলের পরদিনই সংস্কারপন্থীদের দ্বিতীয় শীর্ষ ব্যক্তি আশরাফ হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। এই অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় যে তিনি তার ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি মেয়াদের আগেই বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এই ঘটনা সংস্কারপন্থীদের কাছে ছিল বড় ম্যাসেজ। এর পর থেকেই তখন একদল মাথা নিচু করে বিএনপিতে ফিরতে শুরু করে। ম্যাডাম জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর অল্প কিছু সংখ্যক ছাড়া বাকি সবাই ফিরে যান বিএনপিতে। অবশ্য আশরাফ হোসেনকে গ্রেফতারের পর ওয়ান ইলেভেন ওয়ালাদের মূল অংশ মরিয়া চেষ্টা চালায় পরিস্থিতি অনুকূলে রাখার। কিন্তু এরমধ্যে পানি অনেকদূর গড়িয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত ওয়ান ইলেভেনের সময় গ্রাম-নগরে ব্যাপক ধরপাকড়ের সময় ওয়ান ইলেভেন ওয়ালারা এমন কোনো সীমা-রেখার কথা ঘোষণা করেননি, কাদের তারা গ্রেফতার করবেন, আর কাদের করবেন না। 'অন্ধকার ঘরে সাপ মানে সারা ঘরেই সাপ।' সারা ঘরেই বিরাজ করে ভীতি। এই ভীতি পেয়ে বসেছিল মানুষকে। যে লোক বড় দুর্নীতি করেছে সে যেমন ভয়ে ঘামতে থাকেন তেমনি যারা ছোটোখাটো দুর্নীতি-অনিয়ম করেছে তারাও ভয় পেতে থাকেন। এমন কি যে লোক ইনকাম ট্যাক্সে পাঁচশ টাকা কম দেখিয়েছেন বা কারো ঘরে দূরন্ত কোনো যুবক আছে তারাও ছিলেন তটস্থ। শুধু শহরে নয়, গ্রামে-গঞ্জেও ভাঙ্গা হয়েছে অসংখ্য দোকানপাট, সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করার নামে, তথাকথিত পরিচ্ছন্নতার নামে। গরিব মানুষকেও করা হয়েছে বেকার। এলাকায় এলাকায় গ্রাম্য বিচার সালিসীতেও হস্তক্ষেপ করেছেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা। বিশেষ করে চেয়ারম্যান মেম্বাররা ছিলেন ভয়ের ও অসম্মানের শিকার। কোথাও কোথাও জমিজমার দলিল নিয়েও মানুষকে ক্যাম্পে দেখা করতে বলা হয়েছে, প্রতিপক্ষের আর্জির প্রেক্ষিতে। সরকারি কর্মচারিদের ৯০ শতাংশই ছিলেন ভীত, তটস্থ। এই ভীতির স্বরূপও মারাত্মক। কারণ, সেনাশাসন কবলিত দেশে সেনাবাহিনীর আচরণ বা বিচার একেবারে আনপ্রেডিকটেবল। কোনো ঘটনায় পুলিশের হাতে ধরা পড়লে আন্দাজ করা যায় ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে ঠেকবে, পরিত্রাণের উপায় কি। এমন কি ডাকাতের হাতে পড়লেও পরিণাম আন্দাজ করা সম্ভব। কিন্তু সেনা সদস্যদের কথিত 'বিচার' একেবারেই অনুমানের বাইরে। কাউকে হয়তো শত শত লোকের সামনেই কান ধরে উঠবস করতে বলা হলো, কাউকে হয়তো নির্দেশ দেওয়া হয় পানিতে নেমে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য। সেনাবাহিনীর জুনিয়র অফিসারদের এই অ্যাডভেঞ্চার ভীতিকর হয়ে দাঁড়ায়। ওয়ান ইলেভেন ওয়ালারা হয়তো ভালো হবে মনে করেই এসব করেন, কিন্তু ফল দাঁড়ায় ভিন্ন।

তৃতীয়ত বেশ কিছু বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিকেও গ্রেফতার করে সেনাবাহিনী। তারা সিন্ডিকেট করে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেয়। প্রতিকারের চেষ্টায় বিডিআরকে দিয়ে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা হয়। এই অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া কাজে আসেনি এবং এর জের গড়ায় দরবার হলে ৫৭ জন সেনাকর্মকর্তার মৃত্যু পর্যন্ত।

চতুর্থত ওয়ান ইলেভেনের প্রথম অবস্থায় জেনারেল মইন প্রেসিডেন্ট হয়ে নিজেরা সাময়িক আইনের কায়দায় দেশ পরিচালনা করলে হয়তো পরিস্থিতি হতো ভিন্ন। মইন

তখন তা করতে না পারলেও হয়তো মনে মনে তার ইচ্ছা ছিল 'নেতা' হওয়ার। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন বিদ্যমান নেতাদের কাউকে কাউকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে এবং বাকিদের পচিয়ে এমন অবস্থা তৈরি করবেন, যখন নেতা হিসেবে তার বিকল্প থাকবে না। বেগম জিয়া ও শেখ হাসিনাকে বাইরে পাঠানোর পরিকল্পনা, মান্নান ভুঁইয়া, আবদুল জলিল, তোফায়েল, রাজ্জাক প্রমুখকে পচিয়ে ফেলার কৌশল দেখা গেছে। এমনি কি ড. ইউনূসকেও সম্ভবত পচানোর একটা উদ্যোগ নেয়া হয় তাকে দিয়ে নাগরিক শক্তি নামের রাজনৈতিক দল গঠনের মধ্য দিয়ে। তিনি যথা সময় টের পেয়ে সরে আসেন। ফেরদৌস কোরেশীকে দিয়ে কিংস পার্টি গঠনের ব্যর্থতাও যোগ হয় তালিকায়।

পরবর্তীকালে আরো জানা যায়, সংস্কারপন্থী সব শীর্ষ নেতাকে প্রধানমন্ত্রী করার টোপ দেওয়া হয়েছিল আলাদা আলাদা ভাবে। মান্নান ভুঁইয়া ও আবদুল জলিল থেকে শুরু করে সাবের হোসেন চৌধুরী পর্যন্ত সবাইকেই 'প্রধানমন্ত্রী' করার আশ্বাস প্রদান করা হয়। এই চালাকী কেন করা হয়েছিল তখন বোঝা না গেলেও পরবর্তী কালে স্পষ্ট হয় ওয়ান ইলেভেনের দিকপালদের হাল অবস্থা দেখে। ডিজিএফআইয়ের অফিসে বসে তখন মূলত দেশ চালাতেন ব্রিগেডিয়ার আমিন ও বারী। তাদের মেধা, দূরদর্শিতা ও কথাবার্তার ধরন দেখলেই যে-কেউ বলে দিতে পারবেন প্রয়াসটি কেন ব্যর্থ হয়েছে। একটি দেশ ও মানুষের ভাগ্য নিয়ে এহেন অ্যাডভেঞ্চারিজম ইতিহাসে বিরল।

তা ছাড়া ওয়ান ইলেভেনের পর পরই জেনারেল মইন আওয়ামী লীগ ও ভারত ঘেঁষা বক্তব্য দিতে থাকায় তাদের জনপ্রিয়তার পার্সেন্টেজ দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। তার অবস্থা হয় অনেকটা খালেদ মোশাররফের মতো – যদিও ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে গেছেন। কারণ, ক্যু-দেতা সফল হলে বিপ্লব, আর ব্যর্থ হলে হয় 'মিউটিনি, ষড়যন্ত্র। ভিক্টোরি হ্যাজ ম্যানি ফাদার্স, বাট ডিফিট ইজ অরফ্যান।

ওয়ার ইলেভেনের গংদের অনেককেই দেশ ছাড়তে হয়েছে। কেবল ভালো অবস্থায় আছেন সেনাবাহিনীতে রক্ষীবাহিনীর শেষ জেনারেল মাসুদউদ্দিন চৌধুরী। তিনি গাছের উপরেরটাও পেয়েছেন তলেরটাও পেয়েছেন।

ওয়ান ইলেভেনের নায়করা মঞ্চে এসেছিলেন কোনো রুটিন-ওয়ার্ক না করে। এ জন্য সিলেবাসও ঠিক করতে পারেননি। অনেকগুলো ফ্রন্ট তারা এক সাথে খুলে নাস্তানাবুদ হয়েছেন। দশ কেজির ব্যাগ হাতে বাজারে গিয়ে জিনিসপত্র কিনেছেন চল্লিশ কেজি। তাদের হটকারিতায় বাংলাদেশের বহু ভালো মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। হয়তো তাদের ইচ্ছা এমন ছিল না। বাংলাদেশের রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীরা কতোটা চতুর এ ব্যাপারেও তাদের ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। তবে তাদের আমলে মানুষ স্বস্তিতে না থাকলেও শান্তিতে ছিল সন্দেহ নেই। হরতাল-চাঁদাবাজী-মাস্তানি ছিল না। ঘুষ-দুর্নীতি-লুটপাট-চুরি-ডাকাতি কমেছিল উল্লেখযোগ্য হারে।

ওয়ান ইলেভেন ওয়ালাদের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি হচ্ছে, অল্প কিছুসংখ্যক ছাড়া দেশের প্রায় সব মানুষের সমর্থন এবং প্রায় সারা দুনিয়ার আশির্বাদ তাদের ওপর থাকা সত্ত্বেও তারা ব্যর্থ হয়েছেন।

তিন : একজন মানুষের কাল-মহাকাল

আবদুল মান্নান ভুঁইয়ার মৃত্যুর পঁচিশ বছর আগে তাঁর ঘরে সকালে-দুপুরে-রাতে কিংবা বৈকালিক নাশতায় যা খেয়েছি পরবর্তী দিনগুলোতেও ছিল একই রকম আয়োজন। দুপুরে বা রাতে সাধারণ চালের ভাত, ভাজি, মাছ কিংবা মাংস এবং ডাল। সকালে আটার রুটি, ভাজি, কোনো কোনোদিন ডিম। আপ্যায়নে ধারাবাহিকভাবে বিদ্যমান ছিল লাল চা ও টোস্ট বিস্কুট। এমপি বা মন্ত্রী হওয়ার সুবাদে বসতবাড়ির পরিধি ক্রমশ বড় হয়েছে কিন্তু খাওয়া-পরায় তিনি ক্রয়ক্ষমতা বাড়াননি, জীবনের শেষ পর্যন্ত। অথচ চাইলেই পারতেন। তেমন চাওয়া থেকে দূরে থাকতেন এবং আমাদেরও পরামর্শ দিতেন সহজ-সরল জীবন যাপনের। কিন্তু চিন্তা করতেন অনেক বড়।

আবদুল মান্নান ভুঁইয়া যখন বিপ্লবী রাজনীতি করতেন, সেই বিপ্লবও চেয়েছিলেন মানুষেরই জন্য, নিঃস্ব-ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য। বিপ্লব তাঁর নিজের জন্য দরকার ছিল না। পিতা-মাতাকে অকালে হারালেও খাওয়া-পরার অভাব ছিল না তাঁর। তিনি যখন ছাত্র ইউনিয়ন-ন্যাপ-ইউপিপি করতেন, সেই রাজনীতিও করতেন মানুষেরই মুক্তির জন্য। তিনি যখন বিএনপি করেন, সে রাজনীতিও ছিল তাঁর মানুষেরই জন্য। নিজের আখের কখনো গোছাতে চাননি। বিএনপিতে অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল, কিন্তু চেষ্টার কমতি ছিল না তাঁর। যেখানেই পেরেছেন কাজ করেছেন মানুষের জন্য, কল্যাণের পক্ষে, প্রগতির পক্ষে। না পারলেও চেষ্টা করেছেন। তা-ও না পারলে নিশ্চুপ থেকেছেন। কিন্তু দেশ ও জনগণের বিপক্ষে তিনি স্বইচ্ছায় বা সজ্ঞানে কখনো কিছু করেননি। তাই গোটা রাজনৈতিক জীবনে তিনি এক জায়াগায়ই দাঁড়িয়ে ছিলেন, যদি আমরা স্বীকার করি যে, রাজনীতি হচ্ছে মানুষের জন্য, কল্যাণের জন্য।

আবদুল মান্নান ভুঁইয়া যখন দ্বিতীয় দফায় মন্ত্রী হন, ২০০১ সালে, তাঁর স্ত্রী মরিয়ম বেগম তখনো অর্থ উপার্জনের জন্য অসংখ্য খাতা দেখেন, এমন কি মাদ্রাসা বোর্ডের খাতাও। এর আগে করতেন টিউশনিও। বাজার করতেন নিজ হাতে, যাতে সাশ্রয় হয় সংসারে। দুজনের মিষ্টি ঝগড়ার সময় ভাবি একদিন বলেই ফেলেন, 'দেখ, তোমার মুখের হাসিটি অম্লান রাখার জন্য আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়'। ঐ একদিনই। আর কোনোদিন কোনো অনুযোগ শুনিনি এই অসাধারণ, কাব্যপ্রেমিক, মানব-দরদী মহীয়সী এই নারীর মুখে। দু'জনকেই বোঝার জন্য একটি বাক্যই যথেষ্ট মনে হয়েছে। তিনি কলেজে ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন। সাহিত্যের আইডিয়ার জীবন যে মানুষের বাস্তব জীবনকে এমন ঘোরাচ্ছন্ন রাখতে পারে তা আমি মরিয়ম ভাবি ছাড়া আর কোথাও দেখিনি। আরো দেখিনি একই ছাদের নিচে দু'জন অনন্যসাধারণ মানুষকে দাম্পত্য জীবন এভাবে চালিয়ে যেতে। এমন সহজ-সরলভাবে। তাঁদের দুই পুত্র অসাধারণ মেধাবী বলে পাবলিক শিক্ষালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা নিতে পেরেছেন, স্বল্প খরচে। নতুবা তাদের শিক্ষার পেছনে বাড়তি ব্যয় করতে হলে কষ্ট হতো পরিবারটির। সৎ ও মানব দরদি মানুষের প্রতি পরম করুণাময়ের এ এক বিরল উপহার।

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বসে। ২৬ জুন মান্নান ভুঁইয়া বিএনপির মহাসচিব হন। আমি তখন ছোট আকারে একটি নিউজ এজেন্সি চালাই এবং আরামবাগে আমাদের প্রেস দেখাশোনা করি। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় তারও অনেক

আগে থেকে। তিনি আমার লেখার একনিষ্ঠ পাঠক ও সমালোচক। তাঁকে অভিনন্দন জানাতে গেলে স্বভাবসুলভ কণ্ঠে বললেন, 'আপনাকে আমাদের লেখাজোখার কাজে সাহায্য করতে হবে। আজ থেকেই বসে পড়ুন।'

আমি একটু ভাবনার মধ্যে পড়ে গেলাম। সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকলেও সরাসরি দল করার কথা আগে কখনো ভাবিনি। তিনি আবার বললেন, সব অবস্থানে থেকেই দেশের কাজ করা যায়। ডাক্তার হয়ে কিছু লোকের অসুখ সারানো যায়, দাতা হলে কিছু লোককে সাহায্য করা যায়। কিন্তু একটি ভালো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কোটি কোটি মানুষের উপকারে আসে। আবার একটি খারাপ সিদ্ধান্তও কোটি কোটি মানুষের ক্ষতি করে। দৃষ্টিভঙ্গিটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। সদিচ্ছা থাকলে ভালো কাজের সবচেয়ে বড় জায়গা হচ্ছে রাজনীতি। অনেকে রাজনীতিকদের সমালোচনা করলেও মানুষকে ঘুরে ফিরে রাজনীতির কাছেই আসতে হয়।

মান্নান ভাইকে কোনো কাজে সাহায্য করার আগ্রহ আমার সব সময়ই ছিল। কারণ, সব সময় আমি তাঁকে ভালো কাজ করতেই দেখে এসেছি। বসে পড়লাম তার কথা মতো। মুখ বুজে কাজ করতে থাকলাম। বলতে গেলে সার্বক্ষণিকভাবেই তার সঙ্গে বা তার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কয়েক মাস পর একদিন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, কাজ করতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো? আমি জবাবে বললাম, না, তা হচ্ছে না। কিন্তু এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন? তিনি বললেন, আপনি লেখক, স্বাধীন মানুষ । যাক আপনার যে আগ্রহ আছে তা দেখে ভালো লাগল'।

আমি এর মধ্যে নিজেকেও আশ্বস্ত করার জন্য মনে মনে যুক্তি দাঁড় করালাম যে, যদি নীতি-নির্ধারণীতে কোনোদিন একটি ভালো পরামর্শ দেওয়ারও সুযোগ পাই, আমার মতো মানুষের জন্য সেটাই হবে বড় ব্যাপার। তাছাড়া অনেক বড় বড় মানুষই বক্তৃতা-বিবৃতি তৈরি ও অনুলিখনের কাজ করে গেছেন। হেলমেট কোহলের বক্তৃতা-বিবৃতি এক সময় লিখতেন গুন্টার গ্রাস যিনি পরবর্তীকালে নোবেল প্রাইজও পেয়েছেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদকে লেখার কাজে সহায়তা করতেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি হুমায়ূন কবীর যিনি নেহরু মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রীও হয়েছিলেন। তাদের তুলনায় আমি তো বলতে গেলে কিছুই না। তা ছাড়া এ ঘটনার আগে কয়েকজনের অনুলিখনের কাজ আমি করেছি। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো' এবং কর্ণেল কাজী নূর উজ্জামানের 'মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতি'সহ কয়েকটি গ্রন্থ। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী আরো কয়েকটি গ্রন্থ লেখার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, যদিও সুযোগ পাননি। এর আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি শুরু করেছিলেন রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গভবনের দিনগুলো দিয়ে। কিছুদিন লেখার পর হঠাৎ মত পরিবর্তন করে বললেন যে, মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে তার জীবনের সেরা অধ্যায়, তাই সে-পর্বই আগে শেষ করবেন। এটি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যু তাকে কোলে টেনে নেয়ার আগে হয়তো অবচেতন মনে পাঠিয়ে ছিল সংকেত বার্তা।

বিএনপিতে যুক্ত হওয়ার আগে মান্নান ভুঁইয়ার কিছু লেখারও অনুলিখন করেছিলাম। সে থেকেই হয়তো আমার ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। যাহোক, বিএনপি অফিসে বসে কাজ শুরুর মাস সাতেক পর দলের প্যাডে লেখা এক চিঠিতে

জানালেন, বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া আমাকে দলে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছেন।

প্রবল আত্মবিশ্বাসী, আশাবাদী, সদা হাস্যময়, নীলকণ্ঠ আবদুল মান্নান ভুঁইয়াকে পঁচিশ বছরে সবচেয়ে বিষণ্ন দেখেছি দুই দিন। ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় এসে মন্ত্রিসভা গঠন করার পর তাঁকে দেখেছি কেমন যেন বিমর্ষ, অন্যমনস্ক। তাঁর বাসায় এক সময় সবাই চলে যাওয়ার পর দু'জন মুখোমুখি হই। অভিনন্দন জানিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করি। জবাবে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বলেন, শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা তুলে দিয়ে এলাম ওদের দুই গাড়িতে। কিছুক্ষণ পর আরো বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন, দেখবেন এই জামায়াত বিএনপির জন্য একদিন বড় লায়াবিলিটি হয়ে উঠবে। তারপর যেন ঘোরের মধ্যেই উঠে দাঁড়ালেন। চলে গেলেন বেড রুমে। ফিরে এলাম আমি। কিছু বলিনি। কারণ তার মনোস্তত্ব আমি কিছুটা বুঝতাম, বুঝতাম কখন প্রশ্ন করতে হয়, কখন উত্তর দিতে হয় কিংবা কখন নিশ্চুপ থাকতে হয়। এ নিয়ে পরবর্তীকালে আমাদের মধ্যে অনেক কথা হয়েছে। তখন আমিও অসহায়ের মতো তাকিয়ে দেখছিলাম, মধ্যপন্থী গণতান্ত্রিক দল বিএনপিকে কীভাবে রাজপথ থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কানাগলিতে; এবং সেখান থেকে কসাইখানার দিকে।

মন্ত্রিসভা গঠনের আগের দিন খুবই বোকার মতো একটা প্রস্তাব করেছিলাম মান্নান ভাইয়ের কাছে। খড়কুটো আঁকড়ানোর মতো ব্যাপার। বলেছিলাম, আর কিছু করতে না পারলে অন্তত জামায়াতের নেতাদের বলেন, যে, আপনারা তো ভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে রাজনীতি করেন, বিএনপির মন্ত্রিসভায় যোগ না দেওয়াইতো আপনাদের জন্য ভালো হবে।

আমার কথার উত্তর দিলেন কৌতুক করে, ওরা আমাদেরও আগে শেরোয়ানি-কোর্তা বানিয়ে বসে আছে।

দ্বিতীয়বার তাকে বিষণ্ন দেখলাম আরেকদিন। তখন আবদুল মান্নান ভুঁইয়া বাংলাদেশের দ্বিতীয় শক্তিমান ব্যক্তি । অথচ নিজের বেদনা প্রকাশ করলেন আমার মতো ক্ষমতাহীন অতিসাধারণ একজন মানুষের কাছে। বললেন, 'মনটা খারাপ, মোফাখ্খার ক্রসাফায়ারে নিহত হয়েছেন।

আমি পাল্টা অনুযোগ করতে গিয়েও থেমে গেলাম। বুঝলাম কোনো কারণে তিনি এখানেও অসহায়। মানুষের এই আনন্দ-বেদনার জীবনে বেদনা কখনো কখনো কতই না মর্মান্তিক হয়ে উঠে। সেদিন আমার বেদনা ছিল সাধারণ মানুষের সাধারণ বেদনা, আর তাঁর ছিল ট্র্যাজেডির গুরুভারবাহী বেদনা।

মান্নান ভাইয়ের ভবিষৎ ভাবনা আমার কাছে সমকালের সবচেয়ে প্রাজ্ঞ মনে হয়েছে। অনেক ঘটনা তা প্রমাণ করেছে। ২০০১ সালে নির্বাচনের অল্প কয়েক মাস আগে তিনি শিবপুরের জনসভায় বলেছিলেন, বিএনপি একা নির্বাচন করলে ২শ' এবং জোটগত ভাবে করলে আড়াই শ' আসন পাবে। জামায়াতের মতো জাপাও তখন বিএনপির সঙ্গে। হয়েছিল তা-ই। কেউ কেউ বলেন, জোট না থাকলে বিএনপি ক্ষমতায় আসতে পারত না। সঠিক মনে হয় না। ২০০৮ সালে জামায়াতের সঙ্গে জোট থাকার পরও আসন গেছে চল্লিশের নিচে। কেউ কেউ কারচুপির কথা বলবেন।

বাংলাদেশের মতো দেশে কারচুপিও নির্বাচনেরই অংশ। জনমত পক্ষে না থাকলে কারচুপি করা যায় না।

২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নির্বাচনের অনেক আগেই পরাজিত হয়ে গিয়েছিল। শুধু সেই পরাজয়ের কথা তারা নিজেরা বুঝতে পারেনি। পরিস্থিতি ছিল আওয়ামী লীগের বিপক্ষে এবং বিএনপির পক্ষে। আওয়ামী লীগ সরকারে গেলে সাধারণত নিজের ভারেই নিজে ভেঙ্গে পড়ে। একই ভাবে ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনের অনেক আগেই হেরে গিয়েছিল বিএনপি। ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে লাখ লাখ ভোটের ব্যবধানে জিতেও হেরে ছিল এই দল। ২০০৭ সালে বিএনপির একক নির্বাচনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং নির্বাচনের আগেই পরাজিত হয়েছে বিএনপি। বিএনপির ২০০১ সালের বিজয়ও ছিল অনেকটা এ রকমই। অথচ সেই নির্বাচনের বিজয়-গৌরব নিয়ে কত না কাহিনী-উপকাহিনী রচিত হয়ে চলেছে। এসব শুনলে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েকটি চরণ, 'রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধুমধাম / ভক্তরা লুটিয়ে পথে করিছে প্রণাম / পথ ভাবে আমি দেব / রথ ভাবে আমি / মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।'

বাংলাদেশের রাজনীতি ও নেতৃত্বের যে বিকৃত বিকাশ ঘটেছে তাতে শাসনক্ষমতা হয়ে পড়েছে ফুটবলের মতো; একদল লাথি মেরে সেই বল পাঠিয়ে দেয় অন্য দলের কোর্টে। এটাই আজকের বাংলাদেশের নিয়তি। এখানে কে কার সঙ্গে জোট করল তা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। নিজ দল ভুল করলে জোট তাকে রক্ষা করতে পারে না। মূল দলগুলোর রাজনীতি বা কৌশলই এখানে প্রধান।

২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে আবদুল মান্নান ভুঁইয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, বিএনপি আসন পাবে ৫০টি। বিএনপির মনোনয়ন ঘোষণার পর তিনি আগের কথা থেকে সরে এসে বললেন, বিএনপি ৩০টির বেশি আসন পাবে না। আমাদের কাছে এটা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে তখন। কিন্তু তার কথাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। বিএনপি ক্ষমতায় আসতে পারবে না বোঝা গেলেও এত কম আসন পাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী মাত্র দু'জনকে করতে দেখেছি; প্রথম জন আবদুল মান্নান ভুঁইয়া এবং দ্বিতীয়জন বিশিষ্ট আইনজীবী শাহ্ দীন মালিক। তিনি সংখ্যা উল্লেখ না করলেও এক লেখায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বিএনপি অতি অল্প আসন পাবে। অথচ বিএনপির এই ঘোরতর দুর্দিনেও কিছু নেতা ও সাংবাদিক জোর দিয়ে বলেছিলেন যে বিএনপি ক্ষমতায় এসে যাবে। কেউ কেউ বিজয়ের জরিপও প্রকাশ করেছেন। এরাই এখন আবার বিএনপির বড় কাণ্ডারী।

মান্নান ভুঁইয়া মহাসচিব হয়েছিলেন বিএনপির এর আগের ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন ও বিপর্যয়ের সময়ে। কারণ বিএনপি এর আগে কখনো কোনো গণতান্ত্রিক ও নির্বাচিত দলের শাসনে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেনি। ১৯৯৬ সালেই বিএনপি প্রথম মুখোমুখি হলো আওয়ামী লীগের মতো প্রবল পরাক্রান্ত সরকারি দলের। এর আগে এরশাদের স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনে বিএনপি প্রবলভাবে উপস্থিত থাকলেও যেহেতু এরশাদ ছিলেন অবৈধ শাসক এবং বিএনপি তথা ৭ দলের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ তথা ১৫ দলও আন্দোলনে শরিক ছিল, সেহেতু সে আন্দোলন ছিল বিএনপির জন্য তুলনামূলক ভাবে সহজ। বিএনপি জন্মের পর থেকে এরশাদের আগমন পর্যন্ত আগের সময়গুলোতে সব সময় ক্ষমতায়ই ছিল।

প্রবল-কঠোর আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তখন পর্যন্ত বিএনপির তেমনভাবে ছিল না। অন্যদিকে ১৯৯৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় একুশ বছর আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত ছিল বলে বিরোধী দলে থেকে রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে টিকে থাকার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিল। এ অভিজ্ঞতাও বিএনপির ছিল না। তাই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় চলে আসার পরও বিএনপির নেতাকর্মীদের কেউ কেউ বুঝতেই চাননি যে তারা এখন বিরোধী দলে। আওয়ামী লীগ এসব সহ্য করার দল নয়। তারা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিতে শুরু করল দ্রুত। প্রবল দমন-নিপীড়ন শুরু হয়ে গেল। এমন এক অবস্থায় মান্নান ভুঁইয়া মহাসচিব হলেন বিএনপির। তিনি বুঝতে পারলেন সাংঘর্ষিক অবস্থা থেকে বিএনপিকে বের করে আনতে হবে। সংঘর্ষের জন্য আওয়ামী লীগ যে উস্কানি দিচ্ছে তা এড়িয়ে যেতে হবে আপাতত। তিনি তখন খোলাখুলিই বলতেন যে, আওয়ামী লীগ তাদের প্রথম আমলে জাসদের যে পরিণতি করেছিল – মেরে ধরে-ঘরে তুলে ঘরে তুলে দেওয়া, এখন বিএনপিকেও তাই করতে চাচ্ছে। বিএনপিকে সেই পরিণতি থেকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু কাদের নিয়ে?

আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণ গ্রহণের পর বিএনপির অনেকেই ভাবতে লাগলেন পার্টি অফিসে আসা নিরাপদ কি না। কেউ কেউ দূর থেকে উঁকি দিয়ে সরে যেতে থাকেন। আবার কেউ কেউ সাহস করে এগিয়েও আসেন। প্রচারমাধ্যমগুলোও তখন বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে প্রবল সমালোচনামুখর। বিএনপি ক্ষমতায় থাকার সময় কেউ কেউ দুর্ব্যবহার করেছিলেন প্রচারমাধ্যমের সঙ্গে। শ্রদ্ধাভাজন সাংবাদিকদের কাউকে কাউকে জেলেও যেতে হয়েছে। সুতরাং চারদিকে তখন প্রবল বিএনপি বিরোধিতা।

এভাবে গেল অক্টোবর-নভেম্বর পর্যন্ত। তখন বিএনপি রাজপথে দাঁড়াতে পারছে না, সংসদেও সুবিধা করতে পারছে না। বক্তৃতা-বিবৃতিই তখন একমাত্র ভরসা। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে শুরু থেকেই আওয়ামী লীগের চেয়ে আমরা এগিয়ে ছিলাম। আওয়ামী লীগের কোনো অভিযোগ আমরা মাটিতে পড়তে দেইনি। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে বাড়তি একটি অভিযোগ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখেছি। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সব সময় ডিফেন্সে ছিল। প্রেস রিলিজের ভাষা, বাক্য-বানান সম্পর্কেও আমি খুব সচেতন ছিলাম বলে বিএনপি বিটের সাংবাদিকেরা বিষয়টি খুব পছন্দ করতেন।

এ সময় মান্নান ভুঁইয়া তার প্রজ্ঞার সবচেয়ে বড় স্বাক্ষর রাখলেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথম থেকে বিজয় দিবসের কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। তার হিসাব, আওয়ামী লীগ আর যা-ই করুক মুক্তিযুদ্ধের কোনো অনুষ্ঠানে হামলা করার হঠকারিতা করবে না।

ঘোষণায় বলা হলো, কর্মসূচি হবে বিএনপি অফিসের সামনে। চলবে স্বাধীনতা সম্পর্কিত আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথম দিন স্টেজের সামনে শ' পাঁচেক চেয়ার দেওয়া হলো। দেখা গেল চেয়ার ভরেও কয়েক হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমে চেয়ারের সংখ্যা বাড়ানো হলো। কিন্তু দর্শক বাড়তে থাকল জ্যামিতিক হারে। এক সময় চেয়ার তুলে দেওয়া হলো। কাকরাইল পর্যন্ত মানুষে মানুষে সয়লাব। এভাবে জমে উঠল মাঠ। এরপর আর বিএনপিকে পেছনে তাকাতে হয়নি।

আরেকটি দূরদর্শী কাজ করেছিলেন মান্নান ভুঁইয়া। আমাকে এই মর্মে ব্লাংক চেক দিয়ে রাখলেন যে, বিএনপি বা অঙ্গ দলের কোনো নেতাকর্মী যেখানেই হামলা-মামলার শিকার হোক না কেন, যেন মহাসচিবের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করা হয়। তার ধারণা মতে, এতে দুটো লাভ হবে, এক. আক্রান্ত নেতা বা কর্মীটি মনে করবে যে সে একা নয়, তার পেছনে তার দলও রয়েছে। দুই. মহাসচিবের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করা হলে আক্রমণকারী বা থানার ওসি-দারোগারা একটু সমঝে কাজ করবেন। তার অনুমান মিথ্যা হয়নি। এই ব্লাঙ্ক চেক কখনো কখনো আরো বড় ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেছি।

অনেক বিপদগ্রস্ত কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিকন মান্নান ভাইয়ের নীরব-নিভৃত সহায়তা পেয়েছেন। এমন একজন সুহৃদ একালে আর কোথায়?

বাংলাদেশের কলুষিত রাজনীতিতে স্বজনপ্রীতি যেখানে পদে পদে সেখানে মান্নান ভুঁইয়ার ছিল 'স্বজনভীতি'। কাছের লোকদের খুব একটা ঘেঁষতে দিতেন না। আমাদের খোলাখুলিই বলতেন, আমি ক্লিন থাকার চেষ্টা করি, আমি চাই আমার নিকট-জনেরাও ক্লিন থাকুক।

অতএব, এ ব্যাপারে কে দ্বি-মত করতে যায়। তবে কোনো কেনো ক্ষেত্রে তার অজান্তে যে তেমন কিছু ঘটেনি তা-ও নয়। যে পারে, সে ঢেউ গুনেও পারে।

বিএনপির ইতিহাসের দীর্ঘতম সময়ের, প্রায় একযুগের মহাসচিব হিসেবে অসংখ্য কমিটির অনুমোদন তিনি দিয়েছেন। কিন্তু সে-সব ক্ষেত্রে কখনো 'নিজের লোক' খুঁজতে দেখা যায়নি। ভাবমূর্তি ভালো এমন লোকদের সামনে আনার চেষ্টা করেছেন। তাই উপদলীয় কোন্দল কম হয়েছে তার সময়। সব গ্রুপকে সমন্বয়ের একটা চেষ্টা তার ছিল।

মানুষের জীবন থেমে গেলেও ইতিহাস থেমে থাকে না। ব্যক্তি যখন বলে 'আসি' আসলে সে চলে যায়। হিস্টোরি রিপিট ইটসেলফ। ইতিহাস যখন বলে আসি, তখন সে আক্ষরিক অর্থেই আসে - কারো অনুমতির তোয়াক্কা করে না। ইতিহাস স্তুতি বা নিন্দা কোনোটাই গ্রহণ করে না। সে শুধু সত্যকেই গ্রহণ করে। আর যেখানে সত্য নেই, আকার ইতিহাসের হলেও তা ইতিহাস নয়। আবদুল মান্নান ভুঁইয়া দল হিসেবে বিএনপি ও দেশের প্রশাসনের সংস্কারের জন্য দুটি সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। সংস্কার নিয়ে ইতি-নেতির চূড়ান্ত হিসাব অনেকে দাখিল করে ফেললেও ইতিহাসই একদিন নির্ণয় করবে তার ভূমিকার কথা, ভুল-শুদ্ধের কথা।

আত্মজীবনী লেখার কাজ শুরু করেছিলেন তিনি। আমি অনুলিখন করতাম। তিনিও নোট করতেন। মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত নোট করার সুযোগ পেয়েছেন। তারপর চলে গেলেন অন্য ভুবনে, যেখান থেকে কেউ ফেরে না।

এবার নিজের কথা একটু বলি। আমার যোগ্যতার জন্যই মান্নান ভাই আমাকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রেখেছেন বা কাজ করার সুযোগ দিয়েছিলেন তাই শুধু নয়। তিনি কখনো না বললেও আমি বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে জেনেছি এবং উপলব্ধি করেছি যে, আমার জীবন তিনি বিপন্ন ভাবতেন বলেই ছায়া দিয়ে রেখেছেন। 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' গ্রন্থের কয়েকজন গ্রন্থকার ও প্রকাশকের একজন আমি। নিজে লিখেছি বাহত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত জাসদ ও বামপন্থিদের ওপর তৎকালীন আওয়ামী

লীগ ও তার সরকারের হত্যাযজ্ঞ ও দমন নিপীড়ন নিয়ে 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূচনাপর্ব: ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ' গ্রন্থ। একজন লেখক হিসাবে আমি আমার প্রতিটি লেখার জন্যই গর্বিত এবং সবধরনের ঝুঁকি ও দায়ভার গ্রহণে প্রস্তুত। আমি মনে করি যে, একজন লেখকের সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা হচ্ছে তাঁর পাঠক ও বিবেকবান মানুষ। কিন্তু তবুও আমার জন্য মান্নান ভাইয়ের ভালোবাসাসিক্ত উৎকণ্ঠা লালনের ঋণ শোধ করা আমার ক্ষমতার বাইরে।

কাগজে কলমে বিএনপিতে আমার পদ ২০১০ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত দলের নতুন জাতীয় নির্বাহী কমিটি গঠন পর্যন্ত ছিল। বিএনপি আমাকে নীরবে চলে আসার সুযোগ দিয়েছে। এ সুযোগ কিছু বন্ধুর মাধ্যমে আমিই প্রার্থনা করেছিলাম। সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ওয়ান ইলেভেনের অনেক আগে থেকেই দলীয় রাজনীতিতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। বিশেষ করে নিজের লেখা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে মনোপীড়ায়ও ভুগছিলাম। বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দলে থেকে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ লেখা অসম্ভব। কারণ, রাজনীতিকরা দলের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় এমন কিছু লিখতে বা বলতে পারেন না। দলের স্বার্থে এক অর্থে তারা অর্ধ মানবে পরিণত হন। অর্ধেক দেখেন অর্ধেক দেখেন না। অর্ধেক শোনেন বাকিটা শোনেন না। মওদুদ আহমেদের মতো দলে থেকে দলের কর্মীদের অনুভূতিকে আঘাত করার ফলও ভালো হয় না। 'তামাকু ও ডুডু' এক সঙ্গে খাওয়া ঠিক নয়। বস্তুত হাত খুলে লেখার ইচ্ছা থেকেই দলীয় রাজনীতি থেকে আমার দূরে সরে যাওয়া।

বিএনপির কাছে যা পেয়েছি তাতেও আমি খুবই সন্তুষ্ট। ২০০১ সালে দল ক্ষমতায় আসার পর আমাকে পরিচালক করা হয় সোনারগাঁও লোক শিল্প জাদুঘরের। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যেত বলে পার্টির কাজে অসুবিধে হতো । এ জন্য আমাকে পরিচালক করে আনা হয় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের। সেখানে চুক্তির মেয়াদ শেষ পওয়ার আগেই ইস্তফা দিয়ে চলে যেতে হয় বাংলাভিশন অর্গেনাইজ করার কাজে। সে আরেক ইতিহাস। মান্নান ভাইয়ের ইচ্ছে ছিল জাতীয়তাবাদীদের একটি মিডিয়া হাউজ হবে, স্যাটেলাইট টিভির সঙ্গে থাকবে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও একটি সাহিত্য পত্রিকা। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন সব কিছুই ওলট-পালট করে দেয়। সে-সব কথা আগের লেখায় উল্লেখ করেছি বলে পুনরাবৃত্তি করলাম না।

আজ আমি আছি, মান্নান ভাই নেই। কিন্তু আমার স্মৃতিতে তিনি অম্লান থাকবেন। অম্লান থাকবেন মানুষের স্মৃতিতে। তার সব কর্ম-চিন্তাই আগামী দিনে অনেক গুরুত্ব নিয়ে হাজির হবে, অন্তত আমার এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

নিউ ইয়র্ক, ৫ ডিসেম্বর ২০১৪

অন্য বিচারগুলো কি রোজ হাশরের ময়দানের জন্য তোলা থাকবে

বাংলাদেশের ইতিহাসে যাদের স্থান নায়ক-মহানায়কের, আমরা তাদের অনেকের লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি অত্যন্ত অসম্মানজনক অবস্থায়। কারো কারো লাশ আমরা দেখেতে পেয়েছি সিঁড়িতে, খোলা মাঠে, সার্কিট হাউজের রক্তে ভাসমান কক্ষে, সিএমএইচে, সেনানিবাসের রাস্তায় কিংবা পিলখানার দরবার হলে। তাঁদের জীবদ্দশার শেষ মুহূর্তে তারা প্রাপ্য সম্মান পাননি। হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার পরও না। অথচ তাদের মৃত্যুতে বেজে ওঠার কথা বিউগলের করুণধ্বনি, অন্তিম সুর; অভিবাদন পাওয়ার কথা তাদের ফুলসজ্জিত কফিন। জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার কথা শোকাশ্রু। তা হয়নি। একি আমাদের অজ্ঞতা, অকৃতজ্ঞতা নাকি নিয়তি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে অকল্পনীয় রক্ত বিসর্জনের মধ্য দিয়ে। এত অল্প সময়ে এত রক্তপাত পৃথিবীর আর কোনো স্বাধীনতার যুদ্ধে বা বিপ্লবে ঘটেনি। স্বাধীনতার পর বিজয়ী জনগণের মধ্যে রক্তপাত প্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু রক্তের স্রোত চলছে অবিরাম। আমাদের ইংরেজি মাস শুরু হয় একজন বিপ্লবীর হত্যাকাণ্ডের স্মৃতির মধ্য দিয়ে। ২ জানুয়ারি হত্যা করা হয় বিপ্লবী নেতা সিরাজ সিকদারকে। আমাদের এমন কোনো মাস নেই, যে মাসে হত্যাকাণ্ডের শোকাবহ স্মৃতি রোমন্থন করতে হয় না। সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, কিংবদন্তীতুল্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, জেনারেল মঞ্জুর, মেজর হুদা, ক্যাপ্টেন হায়দারসহ আরো কত বীরের লাশ আমরা পড়ে থাকতে দেখেছি অসম্মানে-অবহেলায়। কথিত বিচারের নামে হলেও কর্নেল তাহেরের মৃত্যু এক ধরনের হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কি। সেনাবাহিনীতে বেশ কিছু ক্যু-এর সময় এবং এসবের রেশ ধরে আরো অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

স্বাধীনতার পর এ ধরনের অকাম্য ও দুর্ভাগ্যজনক হত্যাকাণ্ডের তালিকায় আরো আছেন বিপ্লবী কামেল বখত, ভাসানী ন্যাপের বীর মুক্তিযোদ্ধা ন্যাভাল সিরাজ, স্টুয়ার্ড মুজিব, জাসদের সিদ্দিক মাস্টার, অ্যাডভোকেট মোশাররফ, ছাত্র ইউনিয়নের মতিউল কাদির, প্রেমানন্দ দাস, ভেড়ামারার ফজিলাতুন্নেসা, আক্কেলপুরের রাবেয়া আক্তার বেলী, শ্রমিক নেতা তাজুল ইসলাম, আওয়ামী লীগ নেতা ময়েজউদ্দীন, ছাত্র নেতা সেলিম, দেলোয়ার, বসুনিয়া, জেহাদ, ডা. মিলন, নূর হোসেন এবং পরবর্তীকালে আহসানউল্লাহ মাস্টার, এ এস এম কিবরিয়া, আই ভি রহমানসহ অনেকে। শেখ হাসিনা অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও, এখনো দেখি রক্ত, গুজব আর ঘোলাপানিতে প্রায়ই ভাসে বাংলাদেশ। রক্তপাতের মানচিত্রে লাশের জোগানদার-চলনদারেরা এখনও ক্লান্তিহীন। লাশ জুগিয়ে চলছে সরকার ভায়া আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, রাজনীতিবিদ, ধর্মগুরু ও ধর্ম ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন কেন্দ্র। এ যেন লাশ নিয়ে প্রতিযোগিতার মহোৎসব। লাশই হয়ে পড়েছে ক্ষমতা দখল বা রক্ষার অব্যর্থ সিঁড়ি, বিকল্পহীন নিয়ামক। লাশের জন্য ছড়ানো হচ্ছে গুজব। ছড়াচ্ছেন তারাও, যাদের আলো ছড়ানোর কথা। রক্ত-অশ্রু-বারুদের যৌগ মিশ্রণে বাংলাদেশের নদ-নদীর সব পানিই যেন ঘোলা হয়ে উঠছে। সেই ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টায় লিপ্ত চতুর শিকারীরা। লাশ হয়ে পড়েছে তাদের আরাধ্য, যেমন আরাধ্য শকুন ও হায়েনার। জীবিকার অন্বেষণে এসে লাশ হয়ে ফিরছে মানুষ, লাশ হয়ে ফিরছে প্রতিবাদ জানাতে এসে, এমন কি ধর্মকথা শুনতে এসেও। লাশ পেয়ে কেউ ব্যথিত, কেউ উল্লসিত। জীবনের কি করুণ অপচয়। কোনো লাশের খবরই উল্লাসের নয়। অথচ বহু মানুষের একটি চোখ যেন গর্তে ঢুকে গেছে। বহু মানুষ যেন পরিণত হয়েছে অর্ধমানবে। তারা একটা দেখে তো আরেকটা দেখে না, কিছুটা শোনে তো বাকিটা শোনে না। আমরা জেনে আসছিলাম 'রাজনীতি হচ্ছে রক্তপাতহীন যুদ্ধ, আর যুদ্ধ হচ্ছে রাজনীতির বিকৃত রূপ।' যেন ব্যর্থ হতে চলেছে মহাপুরুষদের বাণীও।

'রাজনীতি মানুষের জন্য, মানুষকে হত্যা করে কিসের রাজনীতি?' – আপন মনে সৃষ্টি হওয়া এই আপ্তবাক্যে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রায় তিন দশক আগে আমি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়েছিলাম, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জনমত তৈরিতে কিঞ্চিত অবদান রাখার জন্য। একটানা লিখে যাওয়ার মাধ্যমে। প্রস্তুতি হিসেবে রক্তপাতের মানচিত্রে ভ্রমণ করেছি বহু মাইল। সেই লক্ষ্য নিয়েই আকরগ্রন্থ 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম। এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছি আগের এক লেখায়। তাই আর পুনরাবৃত্তি করলাম না। পরের প্রয়াসগুলোর কথা বলবো।

উল্লিখিত গ্রন্থ প্রকাশের পর অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেন স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে আওয়ামী লীগ বহির্ভূত মুক্তিযোদ্ধা ও বামপন্থীদের হত্যাকাণ্ডের ওপর লেখার জন্য। বিশেষ করে বিপ্লবী নেতা শান্তি সেন ও দেবেন শিকদার শুধু অনুরোধই করেননি, অনেকগুলো মর্মন্তুদ ঘটনার কথাও আমার কাছে উল্লেখ করেন। আমি দ্বিতীয় চিন্তা না করে কাজে নেমে পড়ার সিদ্ধান্ত নিই। তাদের কাছ থেকে অনেকের ঠিকানাও পেয়ে যাই। যদিও জানতাম, আওয়ামী লীগের মতো দলের বিরুদ্ধে যায় এমন কার্যকরী কিছু লেখা জীবন-জীবিকার জন্যই শুধু হুমকি নয়, এই দল-ঘরানার বিরোধিতা করে বা তাদের বাইরে গিয়ে লেখক হিসেবে দাঁড়ানোও অনিশ্চিত। কারণ, বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্যের সৃজনশীল জগৎ এরাই নিয়ন্ত্র করেন – তা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকুক আর না-ই থাকুক। (আর, পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বাংলাদেশের মস্কো-ঘরানাও আওয়ামী লীগের কব্জায় চলে আসার পর তাদের শক্তি আরো জোরদার হয়। অন্যদিকে বিএনপি ক্রমাগত জামায়াত-ঘেঁষা হয়ে ওঠার পর চীনপন্থীদের একটা বড় অংশ আওয়ামী লীগ বলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে উল্লিখিত শক্তিকে একচ্ছত্র করে তোলে। এরশাদ-পতনের আন্দোলন পর্যন্ত চীনপন্থীদের লেখা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক উদ্যোগে পরোক্ষভাবে হলেও বিএনপি

লাভবান হতো।) যাহোক, সমসাময়িক পরিস্থিতির আলোকেই ঝুঁকি নিয়ে লিখলাম হত্যাকাণ্ডের কাহিনী। 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূচনা পর্ব : ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ' গ্রন্থটি ছাপা হলো ১৯৮৮ সালে। আলোড়নও ওঠে যথারীতি। হুমকি-বাধা এলেও সেগুলো ছিল বিচ্ছিন্ন ও অনুল্লেখযোগ্য। তবে পরবর্তীকালে এ-ও দেখলাম, আমি বামপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিস্বরূপ বা তাদের রাজনীতির উপকারে আসার জন্য হত্যাকাণ্ডের তথ্য তুলে ধরলেও তারা সুযোগ কাজে লাগাতে পেরেছেন কমই। অনেকে বরং আওয়ামী লীগের এমপি-মন্ত্রীও হয়েছেন। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের অন্যান্য অংশ আমার গ্রন্থের তথ্য বেশি কাজে লাগাতে তৎপর। সে বিতর্ক ভিন্ন। বইয়ের কথায় আসি। ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এটি কাজে আসছে এটাই বড় কথা। পরবর্তীকালের বহু গবেষণা-গ্রন্থে আমার বইয়ের রেফারেন্স এসেছে, আসবে সন্দেহ নেই। কারণ এ ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে অল্পই। ২০০৭ পর্বের সংসদে বিএনপির অংশ নেয়া শেষ অধিবেশনে বেগম খালেদা জিয়া আমার গ্রন্থ থেকে অনেকদূর পাঠ করেছেন। এই বই অনেক নকলও হয়েছে। কেউ অনুমতি নিয়ে, কেউ না বলে মুদ্রণ করে নিচ্ছেন। বাজারে যে বস্তুর চাহিদ আছে কিন্তু সরবরাহ নেই, সেটাতো নকল হবেই। এ দোষ আমারও।

বলা হয়ে থাকে স্বাধীনতার পর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের রক্ষীবাহিনীসহ বিভিন্ন বাহিনীর হাতে জাসদের ১৫ হাজারসহ প্রায় ত্রিশ হাজার বামপন্থী ও মুক্তিযোদ্ধা হত্যাকাণ্ডের শিকার হোন। সংখ্যাটি অতিরঞ্জিত হলেও প্রকৃত সংখ্যা একেবারে কমও নয়। আমার গ্রন্থে একটি তালিকা দিয়েছি, যদিও এর বাইরে অনেক নাম রয়ে গেছে। আজ অনেকে এসব নিয়ে কাজ করছেন। তারা নিশ্চয়ই একদিন তালিকা সম্পূর্ণ করবেন।

জিয়াউর রহমানের আমলে সেনাবাহিনীতে বেশ কিয়েকটি অভ্যুত্থান হয়েছিল। আশির দশকের শেষ ভাগে মোজাম্মেল বাবু সম্পাদিত সাপ্তাহিক পূর্বাভাস-এ জিয়াউর রহমানের আমলের ক্যু-সমূহ নিয়ে ধারাবাহিক একটি অনুসন্ধানী লেখা শুরু করি। এটিও লিখতে অনেকে অনুপ্রাণিত করেন। কিন্তু কয়েক-পর্ব চালিয়ে লেখা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হই। কারণ, তখন বিভিন্ন ঘটনায় আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল যে, আমার একটি মাত্র মাথার ওপর ঝুঁকি অনেক বেশি নেয়া হয়ে গেছে। আর নেয়া উচিত হবে না। আমার ঝুঁকির কোটা শেষ। নতুনেরা অবশ্যই একাজে এগিয়ে আসবেন।

আজ অনেকেই কাজ করছেন। তারা আমার চেয়ে আরো বেশি সাহসী-ধৈর্যশীল হবেন এটাই কামনা করি। তারা যদি এই মর্মে জাতির 'কান ভারী' করতে পারেন যে, 'একটি হত্যাকাণ্ড আরেকটি হত্যাকাণ্ড ডেকে আনে, কিংবা একটি হত্যাকাণ্ড পূর্ববর্তী আরেকটি হত্যাকাণ্ডেরই জের', তা হলে সেটা হবে অনেক বড় কাজ। সেই বড় কাজটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড একেবারে নির্মূল করতে না পারলেও সংখ্যা অনেক হ্রাস করতে পারবে। আর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড প্রায় শূন্যের কোঠায় আনার বড় হাতিয়ার হচ্ছে উপযুক্ত বিচার। সে বিচার অতি জরুরি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সে বিচার হয় না। এমন কি বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরোধিতা করার মতো কিছু মানুষও দেখা যাচ্ছে। যারা হত্যাকাণ্ডের মতো অপরাধের বিচার চায় না বা বাধাগ্রস্ত করতে চায় তারা মানুষের মধ্যেই পড়ে না। তাই তাদের কথায় কান দেয়ারও প্রয়োজন পড়ে না।

বাংলাদেশের যাত্রাপথটাই রক্তস্নাত। সে কারণে আমাদের ন্যায্য বিকাশের গতি শম্বুক-শ্লথ। বিচারহীনতাই হত্যাকাণ্ডকে সম্ভাবিত করছে। বিচার কিছু হচ্ছে বটে, তবে সব হত্যাকাণ্ডের নয়। কিছু বিচার হচ্ছে, বাকিগুলোকে যেন তুলে রাখা হচ্ছে রোজ হাশরের ময়দানের জন্য। এটা জাতির আরেক দুর্ভাগ্য। পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা সুবিদিত সুবিচারক। কিন্তু তিনি তার বান্দাকেও নির্দেশ দিয়েছেন দুনিয়াতে হত্যাকাণ্ডের বিচার ও কঠোর শাস্তি প্রদানের জন্য।

বাংলাদেশে আরেকটা কৌতূহলজনক ব্যাপারও লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠছে। বিচার যেন এখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাওয়ার ব্যাপার নয়, জোর করে অর্জনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষমতায় না গেলে সেটা করা যাচ্ছে না। তবে বিচারের প্রয়োজনে হোক, প্রতিশোধপরায়নতার জন্য হোক বা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্যই হোক, এই বিচার আওয়ামী লীগ তার পছন্দ মতো করছে এবং বিএনপি ক্ষমতায় এলে তাদের পছন্দের বিচারগুলো করবে বলে ঘোষণা দিচ্ছে। এতে এক সময় হয়তো বাকি বিচারগুলোর আংশিক হলেও সুরাহা হবে। এটা হলে ব্যাপারটা মন্দের ভালো বৈকি। তবে মানুষ হিসেবে সব ব্যক্তিরই উচিত সব হত্যাকাণ্ডের বিচারের পক্ষে থাকা। কারণ, বাংলাদেশের কথিত গণতন্ত্রে ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব নেই, এমন কি মূল্যও তেমন নেই। ব্যক্তি এখানে ভোটার-বিশেষ মাত্র, যদিও ইদানীং আবার সে ভোটও ব্যক্তি দিতে পারে না। ব্যক্তিকে তাকিয়ে থাকতে হয় সংগঠনগুলোরই দিকে। মর্মবাণীর দিক থেকে গণতন্ত্রে ব্যক্তির যে অধিকার-সার্বভৌমত্ব তা প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত তাকিয়ে থাকতে-থাকতে চোখ রাঙা করার বিকল্প নেই।

নিউ ইয়র্ক, ২১ নভেম্বর ২০১৪

কানু ছাড়াও আছে গীত

কোনো জাতির ইতিহাসকে যখন মিথ্যাচার দিয়ে বিকৃত করা হয়, তখন সেই জাতির প্রাণশক্তিই বিকৃত হয়ে যায়। এর মধ্যে কায়েম করা হয়েছে 'ভাবমূর্তির পূজা' ইত্যাদি। এসবের দ্বারা প্রগতি ব্যাহত হয়, মানবতা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। —আবুল কাসেম ফজলুল হক

স্বাধীনতার যুদ্ধ, বিপ্লব বা গণঅভ্যুত্থান কখনো সংবিধান বা আইনকানুন মেনে হয় না। এগুলো ঘটেই প্রচলিত কাঠামো-কানুনের বিরুদ্ধে। সে-সব ঘটে সংগ্রামী জনতার অভিপ্রায় অনুযায়ী। তাই সে সময়কার ইতিহাসে কিছু ফাঁক-ফোকর থাকে। বিজয়ী মানুষেরা নয়া সংবিধান, রীতিনীতি তৈরি করে সেগুলো অ্যাডজাস্ট করে। আর সংগ্রামকালের ফাঁক-ফোকরের উৎসগুলো পরবর্তীকালে সব দল মিলে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দিয়ে লেপন করে দেয়। এই একটি বিষয়ে সবদেশেই জাতীয় ঐকমত্য থাকে। শ্রেষ্ঠ অর্জন-ঐতিহ্যের পায়ে কেউ কুড়াল মারে না। কিন্তু বাংলাদেশে হয়েছে উল্টো। ফাঁক-ফোকরগুলো বিকৃত করে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এসবকে কেন্দ্র করে একদল আরেক দলের ইজ্জত নিয়েও টানাটানি করছে। আরো বড় করে তোলা হচ্ছে ফাঁকগুলো। আর এসব করতে গিয়ে গোটা জাতিকে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে অরুচিকর বক্তব্যে-বিতর্কে। বিশেষ করে পরিবারতান্ত্রিক দু'টি দল-ঘরানার মধ্যে চলছে এই অশোভন বাহাস। আর এসবের অগ্রবাহিনী হিসেবে এখন ময়দানে নেমেছেন দুই দলের দুই 'ভবিষ্যত রাজপুত্র', যাদের কথাবার্তা ও হাবে-ভাবে সন্দেহ হচ্ছে, তাদের দল দু'টি কেন গঠিত হয়েছিল সেটা তারা জানেন কি-না। এমন কি এই সন্দেহ করলেও অত্যুক্তি হবে না, যে, বাংলাদেশটা কেন স্বাধীন হয়েছিল সেটাও তারা জানেন-বোঝেন কি না। এসব মৌলিক সন্দেহ শিকেয় রেখেই দু'জন প্রস্তুত হচ্ছেন নব্যপৌত্তলিকতায় আচ্ছন্ন বাংলাদেশের রাজনীতির মাধ্যমে সিংহাসনে বসার বা পীর-পৌরহিত্যে গদীনসিন হওয়ার। দুইজনের জো-হুকুম বাহিনীও ফেরুপালের মতো ময়দানে নেমে পড়েছে তাদের সমর্থনে। কেউ ক্যানভাসার হয়ে, কেউ বা কলমী-বরকন্দাজ হয়ে। বাংলাদেশের জনগণকে কারা কতোটা বেকুব বানাতে পারে, চলছে সেই প্রতিযোগিতার অশোভন চিৎকার।

এক পক্ষ বলছে 'বিএনপি রাজাকারের দল', আরেক পক্ষ বলছে 'আওয়ামী লীগ স্বৈরাচারের দল'।

এক পক্ষ বলছে 'শেখ মুজিব রাষ্ট্রদ্রোহী', আরেক পক্ষ বলছে 'জিয়াউর রহমান পাকিস্তানের চর'। তো, জনাবগণ, এরপর তাহলে আপনাদের বাকি থাকলো কী? ব্যাপারটা কি এমন নয়, পরস্পর পরস্পরের কাপড় ধরে টানাটানি করে এক সময় সবাই উলঙ্গ হয়ে যাওয়া?

এসব প্রলাপ বকার পেছনে তাদের 'যুক্তি' অনেক। আমি দু'টি মাত্র উদাহরণ দেব।

বিএনপির কেন্দ্র থেকে বলা হচ্ছে, শেখ মুজিব পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশে এসেছেন। কিন্তু বলার সময় তারা ভুলে গেছেন যে, ১. বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের জেলে ছিলেন, পাসপোর্ট-ভিসা তার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল ছিল না। ২. বিজয় অর্জনের মাত্র ২৫ দিন পর তিনি দেশে আসেন যখন বাংলাদেশি পাসপোর্ট দূরের কথা, পাসপোর্ট অফিসও নেয়া হয়নি। তাহলে তিনি কিভাবে আসতেন?

জাতীয় সরকার হলে ভালো হতো বটে, কিন্তু তাই বলে স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকারকে অবৈধও বলা যাবে না। পাক-ভারত স্বাধীনতালাভের পরদিনই সেখানে নির্বাচন হয়নি। পৃথিবীর কোনো দেশেই স্বাধীনতালাভ বা বিপ্লবের পরদিনই নির্বাচন হয়নি। দেশ চলেছে জনগণের অভিপ্রায়ের নেতৃত্বে। সে ভাবেই ভারতে নেহরু-প্যাটেল এবং পাকিস্তানে জিন্নাহ-লিয়াকত ক্ষমতায় বসেন। চীনে মাও-সেতুঙ, সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিন, কিংবা কিউবায় ফিদেল ক্যাস্ট্রো বিপ্লবের পর রাষ্ট্র প্রধান হবেন, এ জন্য কোনো ভোট বা ফতোয়া অপ্রয়োজনীয়। পরবর্তীকালে এ বিষয় কেউ চ্যালেঞ্জও করেনি বাংলাদেশের মতো। এসব ব্যাপার তর্কের অতীত।

আওয়ামী লীগ জিয়াউর রহমানকে খাটো করার জন্য সব সময় খোটা দেয় এই বলে যে, জিয়াউর রহমান সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করে ছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ অভিযোগের সময় ভুলে যায় যে, শহীদ জিয়া যখন সোয়াত থেকে অস্ত্র খালাস করছিলেন তখন বঙ্গবন্ধু অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে মুজিব-জিয়া দু'জনের সামনেই এর বিকল্প ছিল না। নিয়মতান্ত্রিক বাহিনীর সদস্য হিসেবে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ সেনাবাহিনীতে অবশ্য পালনীয়। তার দোষ হতো যদি তিনি স্বাধীনতা ঘোষণার পরও পাকিস্তানিদের নির্দেশ মানতেন। তা তিনি করেন নি, বরং সাহস নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণার আগে সেনাবাহিনীর অনেক বাঙালিকে ঢাকা থেকে অন্য জায়গায় বদলি করা হয় যা তারা তাৎক্ষণিকভাবে পালন করলেও স্বাধীনতা ঘোষণার পর রুখে দাঁড়ান। কেউ কেউ অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের কথা বলবেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর সদস্যদের পক্ষে সেটা আক্ষরিকভাবে পালন সম্ভব ছিল না। তখনকার পরিপ্রেক্ষিত মাথায় নিয়ে 'অভিযোগ' করতে হবে। অবশ্য আজকের অভিযোগকারীদের পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ থাকলে অভিযোগ দূরে থাকুক এসব সাধারণ আলোচনায়ও আসতো না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাংলাদেশ ও তার প্রয়াত নায়কদের। তাদের রেখে যাওয়া দলগুলো ক্রমশ দেউলিয়া হয়ে পড়ায় ক্ষমতার প্রাণ-ভোমরা হিসেবে প্রয়াত দুই নেতাকে এচ্ছত্রভাবে হাজির করতে গিয়ে দু' জনকেই গালিগালাজের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে চলেছে।

জিয়াউর রহমানের চেয়ে বঙ্গবন্ধু অনেক বড় নেতা এবং বঙ্গবন্ধুর অবস্থান অনেক বিস্তৃত সন্দেহ নেই। কিন্তু জিয়াউর রহমানের পাওনা সম্মানটুকু তাকে দিতে হবে। দুই নেতার প্রাপ্য সম্মান দিতে জনগণের তরফে কোনো আপত্তি নেই, সব আপত্তি দলকানাদের।

এক সময় বিএনপি ইনিয়ে-বিনিয়ে হলেও শেখ মুজিবের অবদানের কথা বলতো। কিন্তু আওয়ামী লীগ জিয়াউর রহমানকে লাগাতারভাবে অসম্মান করার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে তার অবদানের কথা স্বীকারই করতে চায় না। এখন আবার বলা হচ্ছে 'পাকিস্তানি চর'। এ কারণে বিএনপি মরিয়া হয়ে ওঠে শেখ মুজিবের অবদানকে তুড়িমেরে উড়িয়ে দিয়ে না-হেক অপবাদ দিয়ে চলেছে। আর এসব কারণেই বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চা ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। তাদের পছন্দ না হলে কিংবা কোনো তথ্যে স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটলে তৎক্ষণাৎ তারা ক্ষিপ্ততা প্রকাশ করেন রূঢ়ভাবে। মুক্তিযোদ্ধাদের তখন তারা খেতাব দেন রাজাকার বা পাকিস্তানি চর বলে। মুক্তিযোদ্ধা বা রাজাকারের এবং ভারতীয় দালালের সার্টিফিকেটের অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়ে তারা বসে আছেন। ভিন্ন দলে অবস্থান বা ভিন্ন মতের কারণে সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারা তো বটেই, বহু সেক্টর-উপসেক্টর কমান্ডারও এসব অপবাদ লাভ করছেন। এ কাজটি তারাই বেশি করেন, যারা স্বাধীনতাযুদ্ধের ত্রিসীমানায়ও ছিলেন না। দলেন নামে, রাজনীতির নামে তারা যাদের সামনে রেখে করে কেটে খাচ্ছেন তাদের গায়ে ইতিহাসের আঁচর লাগলে হৈ হৈ করে উঠেন। চরিত্র হনন করেন লেখকেরও। কু-তর্ক-যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসেন উচ্ছিষ্ট ভোগী এবং ভোগ-প্রত্যাশী কলমী বরকন্দাজরাও। এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। তবে সাম্প্রতিক দুটি ঘটনার জের-রেশ এখনো চলছে। জনাব মওদুদ ও খন্দকার তোপের মুখে আছেন অপ্রিয় সত্য বলতে গিয়ে। তবে এটাও ঠিক, এসব লেখার আগে তারা তাদের স্ব স্ব দল থেকে পদত্যাগ করলে ভালো করতেন। 'তামাকুও খাব, ডুডুও খাব', তা হজমের খুবই প্রতিকূল।

এসব ঘটনার মাঝখানে তাজউদ্দিন আহমদের কন্যা শারমিন আহমদের গ্রন্থ সাড়া তুলেছে নতুন করে। গ্রন্থে অনেক নয়া তথ্যের পাশাপাশি একটি ন্যায্য দাবি প্রবল হয়ে উঠেছে যে, ইতিহাসে তাজউদ্দিন আহমদের মূল্যায়ন প্রয়োজন। এ দাবি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। আরো অনেকের মতো তাজউদ্দিন আহমদের জন্য যথাযোগ্য স্থান করে দিতে হবে। তিনিও ছিলেন আমাদের ক্রান্তিকালের বড় কাণ্ডারি। ছোট একটা গলি তার নামে আছে বটে কিন্তু তিনিতো পাওনা রাজপথ।

আমাদের কথিত রাজনীতিকদের মনে রাখা উচিত ইতিহাস বৈষ্ণব পদাবলী নয়। একমাত্র বৈষ্ণব পদাবলীতেই 'কানু বিনে গীত নাই।' সব গীত কৃষ্ণের জন্য। সব ভালো কাজ একা তাদের নেতারাই করেছেন এমন নয়। আবার একজন রাজনৈতিক নেতা, তা তিনি যত বড় নেতাই হোন না কেন, তিনি দোষে-গুণে মানুষ; দেবতা নন, কোনোভাবেই সমালোচনার উর্দ্ধে নন। কেউ সমালোচনা করলে তার অর্জন ধুলিসাৎ ও চরিত্র হনন করা, শার্ট ছিঁড়ে দেওয়া বা তার বিরুদ্ধে মামলা করা নেহায়েত ইতরতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের রাজনীতিকদের চামড়া গণ্ডারের চামড়া, তাদের লজ্জাবোধ অতি অল্প। সকাল বিকেল প্রতিপক্ষদের যে ভাষায় আক্রমণ করা হয় সে ভাষায়

একজন লেখককে, বিশেষ করে বীর মুক্তিযোদ্ধাকে আক্রমণ করা খুবই অরুচিকর। পৃথিবীর বহু দেশে হেঁটে যাওয়ার সময় মুক্তিযোদ্ধাদের আর কিছু না হোক, তাদের দিকে ছুঁড়ে দেয়া হয় ফুল, ছুঁড়ে দেয়া হয় সম্মানের চাহনী। একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। তাদের বলীয়ান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। শহীদেরা তাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করে দিয়ে রচনা করে গেছেন স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যত। 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে, কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রুজলে।' সেটা ইতিহাসে কেন ঠাঁই পাবে না।

নিউ ইয়র্ক, ১২ নভেম্বর ২০১৪

বাংলাদেশের জন্ম-শত্রু প্রতিরোধ আন্দোলনের অনুক্ত কথা

বাংলাদেশে জামায়াত-শিবির বিরোধী আন্দোলনের সূচনাপর্ব থেকে সাংবাদিকতা ও সাংগঠনিক সূত্রে সক্রিয়তার কারণে আমার অনেক ঘটনা খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। পরবর্তীকালে নতুন প্রজন্ম শামিল হয়েছে আন্দোলনে – লেখনী ও সাংগঠনিক সক্রিয়তা নিয়ে। তাদের লেখা আমি মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করি। আমি যা বলতে বা লিখতে চাই সেটা কেউ না কেউ বলছেন বা লিখছেন বলে পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত ছিলাম বহুদিন।

তবে ইদানীং অতীত আন্দোলনের ঘটনাগুলো বহুলভাবে আসছে। বিশেষ করে ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও গোলাম মোর্তোজা সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকায় শাহরিয়ার কবিরের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার এবং ফেসবুকে কিছু বন্ধুর নিবন্ধ, স্ট্যাটাস ও বিতর্ক পড়ে মনে হয়েছে আমারও কিছু লেখা দরকার। কারণ কিছু কিছু ঘটনা আড়ালে থেকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তথ্যগত কিছু ভুলও দেখা যায়। ইতিহাসের প্রয়োজনে এগুলো লিপিবদ্ধ থাকা উচিত।

পৃথিবীতে বাংলাদেশের জনগণকে একটা নজিরবিহীন দুর্ভাগ্য বহন করতে হচ্ছে। বলীয়ান আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জয়লাভ করেও পরাজিত-বিশ্বাসঘাতক-শত্রুদের দম্ভ সহ্য করতে হয় তাদের। এদের বিরুদ্ধে বিরামহীন নতুন সংগ্রাম করতে হয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারও নিলামে ওঠে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য। পক্ষে-বিপক্ষে – দুই কাতারেই। দলীয় স্বার্থের কারণে সেই পরাজিতদের সঙ্গে প্রকাশ্য বা গোপন সমঝোতা করতে হয়। স্বাধীন দেশের পতাকাও ওড়ে বাংলাদেশের জন্ম-শত্রুদের গাড়িতে-বাড়িতে।

অবশ্য লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রথম থেকেই আন্দোলনের উস্কানিগুলো এসেছে জামায়াতের পক্ষ থেকে, বিশেষ করে গোলাম আযমের পক্ষ থেকে। গোলাম আযম শুধু যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তা নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরও তার ঘৃণ্য চক্রান্ত অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিতে মুসলিম দেশগুলোকে প্রভাবিত করার কাজে লিপ্ত থাকেন, 'পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধারের' বৃথা-অপচেষ্টাও করেন অনেক দিন ধরে। সেই গোলাম আযম অসুস্থ মাকে দেখতে আসার কথা বলে ১৯৭৮ সালে পাকিস্তানি পাসপোর্টে ৬ মাসের ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে এসে আর ফিরে যাননি। বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও আইনের প্রতি এটা ছিল তার প্রথম বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন। মানুষের মনে এ নিয়ে ক্ষোভ ছিল। তারপর তিনি প্রকাশ্যে দম্ভের

সঙ্গে বললেন, একাত্তরে বাংলাদেশের কনসেপ্ট সঠিক ছিল না। ১৯৮১ সালের ২৮ মার্চ জামায়াতের শীর্ষ নেতারা বললেন, একাত্তরে তারা ভুল করেন নি। বিএনপি সরকার চুপ করে রইল। চরম এসব উস্কানীর পর মুক্তিযোদ্ধারা নেমে এলেন আন্দোলনে। আওয়ামী লীগ তখন দুর্বল অবস্থানে। পঁচাত্তরের আঘাত তারা কাটিয়ে উঠেতে পারেননি তখনো। নানা চাপে ভীত-সন্ত্রস্ত।

১৯৮১ সালের প্রথম ভাগে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হলেন মুক্তিযুদ্ধকালীন ৭ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্ণেল কাজী নূর-উজ্জামান। মহাসচিব নঈম জাহাঙ্গীর। আন্দোলনের সূচনা হলো তাঁদের হাতে। আমিও জড়িয়ে যাই নানা ভাবে। সরকার হালিম চৌধুরী ও মাহফুজুর রহমানদের দিয়ে পাল্টা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ করতে ব্যর্থ হয়ে কর্নেল জামানদের বাগে আনার চেষ্টা করতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ডাকে সারা দেশে জামায়াত শিবির বিরোধী আন্দোলন আস্তে আস্তে জোরদার হতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা সারাদেশে জামায়াত-শিবিরের সমাবেশ নিষিদ্ধ করে। দেশের বিভিন্ন জেলায় সংসদের ডাকা হরতাল সফলভাবে পালিত হতে থাকে, যেখানে আওয়ামী লীগের মতো বিরাট দল হরতাল ডেকেও সফলতা লাভ করতে পারেনি। মুক্তিযোদ্ধাদের ডাকা হরতালের সাফল্যের পেছনে প্রধান কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে কয়েকটি, এক. মুক্তিযোদ্ধা সংসদের একটি নির্দলীয় চরিত্র ছিল যার কারণে সবদলের, এমনকি সরকারি দলের সমর্থক মুক্তিযোদ্ধারাও আন্দোলনে শামিল ছিলেন। দ্বিতীয়ত, দেশের প্রধান ক্যান্টনমেন্টগুলোর জিওসি ও শীর্ষ ভাগে ছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। জেলার ডিসি-এসপিরা এই বিষয়টাও হিসেবের মধ্যে রাখতেন। চট্রগামে ছিলেন মেজর জেনারেল মঞ্জুর। যশোরে ছিলেন মেজর জেনারেল মীর শওকত আলী। তিনি স্থানীয় ডিসিকে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, কোনো মুক্তিযোদ্ধার গায়ে যেন হাত না পড়ে। তৃতীয়ত, ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ না থাকলেও প্রশাসনে প্রাধান্য ছিল মুক্তযোদ্ধাদেরই। সর্বোপরি আন্দোলনটি ছিল জনগণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতেই সাপ্তাহিক বিচিত্রাতে প্রদায়ক হিসাবে লেখা শুরু করি। ১৯৮০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার বিচিত্রায় আমার প্রথম প্রচ্ছদ কাহিনী প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল 'দুই দশকের স্লোগান : প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা'। শাহরিয়ার কবির ও জগলুল আলম আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আমি বিশেষ ভাবে ঋণী শাহরিয়ার কবিরের কাছে। তিনি আমাকে হাতে ধরে শিখিয়েছেন। এরপর বিচিত্রায় খাস জমি ও মহাজনী-সুদ প্রথাসহ বেশ কিছু লেখা ছাপা হয় আমার।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যখন আন্দোলন করতে থাকে তখন আন্দোলনের মুখপত্র ছিল সাপ্তাহিক নয়া পদধ্বনি। প্রকাশক ও সম্পাদক কাজী নূর-উজ্জামান। বিচিত্রার বাইরেও শাহরিয়ার কবিরই মূলত এটা দেখাশোনা করতেন। ১৯৮১ সালের শুরুতে শাহরিয়ার কবিরের পরামর্শে আমি সাপ্তাহিক নয়া পদধ্বনিতে নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে জয়েন করি। পত্রিকার প্রেসেরও দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল আমার। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের বক্তৃতা বিবৃতি শাহরিয়ার কবির লিখতেন। তিনি বিচিত্রা ও আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায়

আমার ওপর দায়িত্ব পড়ে সে-সব লেখার। তখন বয়স কম, আবেগ বেশি। আবেগ মথিত ভাষায়ই সেসব লিখতাম। শুধু লিখেই পাঠানো হতো না, সন্ধ্যায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদে আরো আসতেন নাসিরউদ্দিন ইউসুফ, নঈম জাহাঙ্গীর, সাদেক আহমেদ খান, ইসমাইল হোসেন বেঙ্গল, আরশাদ আলী মঙ্গল, গিয়াসউদ্দিন আহমদ প্রমুখ। তাঁদের পাঠ করে শুনিয়ে পত্রিকায় পাঠাতাম। পত্রিকাগুলো খুব গুরুত্ব দিত। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচার সেসময় অনেকটা গৌণ হয়ে পড়ে।

নয়া পদধ্বনিতে সে সময় লিখতেন আহমদ শরীফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বদরুদ্দীন উমর, বিনোদ দাশ গুপ্ত, ড. সাঈদ-উর রহমান, শাহরিয়ার কবির, আব্দুল মতিন খান, আবরার চৌধুরী, আনু মুহাম্মদ প্রমুখ। আমিও লিখতাম। সাযযাদি কাদির বেনামে লিখতেন। তিনি তখন বিচিত্রায়। অবশ্য নয়া পদধ্বনি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের মুখপত্র হয়ে পড়ায় এবং পরবর্তীকালে নাগরিক কমিটির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জেনারেল ওসমানীকে সমর্থন করায় লেখক বদরুদ্দীন উমর ও আনু মুহাম্মদরা আলাদা হয়ে যান। নয়া পদধ্বনি ও লেখক শিবিরের অফিস ছিল এক সঙ্গে। দপ্তর সম্পাদক আবরার চৌধুরী বিদেশে যাওয়ায় কিছু দিন আমি সে দায়িত্ব পালন করেছি। অবশ্য আহমদ শরীফরা আলাদা লেখক শিবির আর করেননি। তারা মনে করতেন, এখানে ব্রাকেট করতে গেলে ব্যাপারটা হাস্যকর হবে। আহমদ শরীফের পরিমিতিবোধ ছিল অসাধারণ। পরে শাহরিয়ার কবির ও মুনতাসির মামুন অগ্রণী হয়ে গঠন করেন লেখক ইউনিয়ন।

১৯৮১ সালের এপ্রিলের গোড়ার দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের আন্দোলন যখন তুঙ্গে, সাপ্তাহিক নয়া পদধ্বনির একটি কার্টুনে দেখানো হলো জিয়াউর রহমান গোলাম আযমের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছেন। এই কার্টুন দেখে জিয়াউর রহমান খুবই অসন্তুষ্ট হন। এক অনুষ্ঠানে জিয়াউর রহমান কর্ণেল জামানকে সামনে পেয়ে বলেন, আপনি এ ধরনের কার্টুন ছাপিয়ে ঠিক করেন নি। গোলাম আযমের সঙ্গে আমার কোনো সখ্যতা নেই। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা।

অনুষ্ঠান থেকে ফিরে নয়া পদধ্বনি অফিসে কর্ণেল জামান আমাদের এ তথ্য জানান। নয়া পদধ্বনিতে কার্টুন আঁকতেন বাদল। তার পুরোনাম মনে নেই। বাসদ করতেন, খুবই প্রতিভাবান। তার অনেক কার্টুন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিশেষ করে শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে নিয়ে আসার ওপর একটি কার্টুন খুব আলোচিত হয়েছিল। ১৭ মে দেশে এসে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের ভাঙ্গন ঠেকান।

১৯৮১ সালের মে মাসে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধের দাবিতে সারা দেশে হরতাল ডাকে। এ হরতাল যে সফল হবে তেমন ইঙ্গিত জিয়াউর রহমান পান গোয়েন্দাদের কাছে। হরতাল প্রত্যাহারের চেষ্টায় তিনি কথা বলেন কর্ণেল জামানের সঙ্গে। যে কোনো মূল্যে জিয়া হরতাল প্রতিহতের পক্ষে ছিলেন। কারণ, আওয়ামী লীগ অনেক চেষ্টা করেও তখন কোনো হরতাল সফল করতে পারেনি। হরতালের সময় জিয়াউর রহমান নিজে বাজারে গিয়ে দোকানদারদের অনুরোধ করতেন দোকান খোলা রাখতে। মুক্তিযোদ্ধাদের হরতাল সফল হলে তাঁর একাধিপত্য ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা করেন তিনি। হরতাল প্রত্যাহারের চেষ্টার অংশ হিসেবে জেনারেল

মাজেদুল হককে প্রধান করে একটি কমিটি করেন তিনি, যে কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয় জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা ও পরামর্শ প্রদান করার। কর্ণেল জামান আমাদের বলেছেন, জিয়াউর রহমান জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধের পথ খুঁজছেন। কারণ তাঁর নিজের দলের স্বার্থেই সেটা দরকার। বিএনপিতেও অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা। এরা এক সময় বেঁকে বসতে পারেন।

আশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ হরতাল স্থগিত রাখে। এর মধ্যে ৩০ মে চট্টগ্রামে নিহত হন জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তখন থেকে দুটি বিষয়কে অনেকে সংযুক্ত করেন; ১. ১৭ মে শেখ হাসিনা দেশের ফেরার ১৩ দিনের মাথায় জিয়াউর রহমানের মৃত্যু। ২. জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধের জন্য কমিটি গঠন। বিশেষ করে কর্ণেল জামান দ্বিতীয়টি জোর দিয়ে বিশ্বাস করতেন। অনেকে জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পেছনে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর হাত থাকার কথা বলেন। তখন কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে আসার পর এ ঘটনা ঘটে। প্রচারিত আছে, কংগ্রেসের এর আগের আমলেও জিয়াউর রহমানকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছিল 'র'-এর মাধ্যমে। মোরারজী দেশাই ক্ষমতায় এসে এ প্রক্রিয়া বন্ধ করেন। কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় আসার পর তা বাস্তবায়িত হয়। এসব নিয়ে তখন তুমুল আলোচনা চলছিল। কোন বিষয়টি ঠিক তা হলপ করে বলা না গেলেও এটা পরিষ্কার যে, জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড ছিল পরিকল্পিত। মঞ্জুরের হত্যাকাণ্ডও। কেউ দূর থেকে নাটাই পরিচালনা করেছে সন্দেহ নেই।

বিএনপির অনেকের এখনো ধারণা যে, একাশি সালে জামায়াত-শিবির বিরোধী আন্দোলনের কারণে জিয়াউর রহমানের মৃত্যু হয়েছে। এটা আমার কাছে সত্য মনে হয় না। কারণ, পরিস্থিতি জিয়াউর রহমান সামলে নিয়ে ছিলেন। গোটা পরিস্থিতি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসার আগেই তাঁকে হত্যা করা হয়। জিয়া হত্যাকাণ্ডের কথিত নায়ক জেনারেল মঞ্জুরও হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। বিচিত্রা সম্পাদক শাহাদাত চৌধুরী ঘরোয়া আলোচনায় প্রায়ই বলতেন, জিয়া ও মঞ্জুরকে একই গোষ্ঠি হত্যা করেছে। উদাহরণ দিতেন এভাবে যে, দুইটি বোতল পরস্পরের সঙ্গে আঘাত করে যেভাবে ভাঙ্গা হয়, জিয়া ও মঞ্জুরকে সেভাবেই হত্যা করা হয়েছে।

যারা ঘটনার আদ্যপান্ত জানতেন তাঁদের সবার সন্দেহের তীরই গেছে এরশাদের দিকে। এ ব্যাপারে প্রথম প্রকাশ্য ভূমিকা গ্রহণ করে নয়া পদধ্বনি। হত্যাকাণ্ডের পরের সপ্তাহে আমরা লিড করি, 'জিয়া ও মঞ্জুরকে কারা হত্যা করেছে?' সেখানেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উল্লেখ করা হয় চক্রান্তেরই কথা। কর্ণেল জামানকে খুব শাসানো হয় এ জন্য। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা বার বার জানতে চায় নিবন্ধের লেখকের নাম। জামান সাহেব নাম বলেননি এবং সব দায় নিজের ঘাড়ে তুলে নেন। লেখাটি যাঁর ছিল তিনি এখন বেঁচে নেই বলে নাম উল্লেখ করলাম না। তাঁর উত্তরসূরীরা নিরাপদ বোধ করলে এবং আগ্রহ দেখালে ভবিষ্যতে প্রকাশ করবো। আমি নিজেও তখন ভয়ে ভয়ে অফিস করতাম। সেনাবাহিনী বলে কথা।

তখন সেনাবাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তান প্রত্যাগতদের মধ্যে। ফ্রিডম ফাইটার্স ভার্সেস রি-প্যাট্রিয়ট। মুক্তিযোদ্ধাদের এক বছর সিনিয়রিটি দেয়া

রিপ্যাট্রিয়টরা ভালোভাবে নেননি। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ছিলেন পাকিস্তান প্রত্যাগতদের অঘোষিত নেতা। তিনি একাত্তরে একবার বাংলাদেশে এসেছিলেন কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেননি। বরং পাকিস্তানের বিতর্কিত আর্মি ট্রাইবুনালের একজন ছিলেন বলে প্রচারিত আছে। আমার পর্যবেক্ষণ, জিয়াউর রহমান সম্ভবত সেনাবাহিনীতে ব্যালেন্স আনার জন্য এরশাদকে সেনাবাহিনী প্রধান করেছিলেন। আর বেসামরিক জীবনে আওয়ামী লীগের মতো প্রবল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে মোকাবেলার জন্য বাছবিচার না করে জামায়াত-নেজাম ছাড়া অন্যান্য ডানপন্থী দলগুলো থেকে লোকজনকে বিএনপিতে আসার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। বেসামরিক জীবনে এই ব্যালেন্সের ফলও তাঁর জন্য শুভ হয়নি। বিশেষ করে শাহ আজিজ ও আবদুল আলিমকে মন্ত্রী করা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশকে অপমান করা। মওলানা মান্নান মন্ত্রী হন জিয়ার মৃত্যুর পর, প্রেসিডেন্ট সাত্তারের আমলে। দলে না নিলেও এদের ভোট ধানের শীষে যেতো, কারণ এদের বিকল্প ছিল না। একাত্তরের কুখ্যাত ভূমিকার জন্য এরা নিজেরাই ছিল দৌড়ের ওপর– লায়াবিলিটি হয়ে।

অন্যদিকে কর্ণেল তাহেরকে ফাঁসি দেয়ার দায়ও জিয়াউর রহমানকে বইতে হবে। পরবর্তী কালে খালেদা জিয়াও একই ভুল করেছেন, জামায়াতের যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে জড়িতদের মন্ত্রী করে। আবদুল মান্নান ভুঁইয়া প্রতিহতের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বিমর্ষ ছিলেন।

অন্যদিকে, প্রচার কম হলেও একই ধরনের ভুলের দায় বহন করতে হবে আওয়ামী লীগকেও; একাত্তরে পকিস্তানীদের পক্ষাবলম্বনকারী ফায়জুল হক ও নূরু মাওলানাকে মন্ত্রী করে কিংবা একাত্তরে 'ব্রাহ্মণ ক্ষমা কর' কথিকার লেখক শামসুল হুদা চৌধুরী ও জাস্টিস নূরুল ইসলামদের মতো বিতর্কিতদের নমিনেশন দিয়ে। ইতিহাস কাউকেই ছেড়ে কথা কয় না। স্তাবক ও নিন্দুকদের কোনো কিছুই ইতিহাস গ্রহণ করে না। ইতিহাসের কাছে এগুলোও অবশ্যই বড় ঘটনা হয়ে আসবে একদিন।

জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর সেনাবিদ্রোহের অভিযোগে দ্রুত ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শাল করে ১২ জন মুক্তিযোদ্ধার ফাঁসি ঘোষণা করা হয়। এই কোর্টের প্রধান ছিলেন জেনারেল আবদুর রহমান যাকে জামায়াত প্রভাবিত বলে সবাই জানতো।

জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ৪০ দিন শোক পালনসহ কিছুদিন নীরব থাকে। কিন্তু ১২ জন মুক্তিযোদ্ধার ফাঁসির খবরে আবার আন্দোলনে নামে, দণ্ডপ্রাপ্তদের বেসামরিক আদালতে বিচারের দাবিতে। এসময় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সঙ্গে যোগ দেয় আওয়ামী লীগ প্রভাবিত মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ ও জাসদ প্রভাবিত মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম পরিষদ। এই দুই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ছিলেন যথাক্রমে অবসর প্রাপ্ত কর্নেল শওকত আলী ও অবসর প্রাপ্ত মেজর জিয়াউদ্দিন। তিন প্রতিষ্ঠান সমবেত ভাবে আন্দোলন শুরু করে। তিন প্রতিষ্ঠানের ঐক্য নিয়ে এসময় নূর-উজ্জামান ও শাহরিয়ার কবিরের মধ্যে কিছুট মতভিন্নতা দেখা দিলেও পরে মিটমাট হয়। রায় ঘোষণার পর পদধ্বনি লিড করে 'সেনাবাহিনীতে বিক্ষোভ।' শাহরিয়ার কবির ছদ্মনামে এটি লেখেন। সাথে সাথে মামলা হয়ে যায়। এরও দায় কাঁধে তুলে নেন নূর-উজ্জামান

সাহেব। এরশাদের তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ। ক্ষমতার তীব্র লালসা আপাত গোপন করে এরশাদ পথের বাকি কাঁটা সরাতে ব্যস্ত তখন।

সময়টি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের জন্যও হতাশজনক ছিল। দেশের প্রেসিডেন্ট ও সেনাবাহিনী প্রধান সংসদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা থাকার রেওয়াজ। এরশাদ চেষ্টা করতে থাকেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদে তাঁর বশংবদদের বসাতে। মুক্তিযোদ্ধাদের তিন সংগঠন একত্রে জনসভা করার জন্য দ্বারস্থ হয় আওয়ামী লীগের। তখন জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা আসাদুজ্জামান খান। তাঁর বাসার বৈঠকে যোগ দেন মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ ছাড়াও আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ ও আসম আব্দুর রব। অন্যদের নাম মনে নেই। কর্ণেল জামান আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান। অর্থ ও লোক জোগানোর ভার নেন তোফায়েল আহমদ ও আসম আব্দুর রব।

সভায় অনেক ধরনের কথাই হয়। তবে আসাদুজ্জামন খান মুক্তিযোদ্ধাদের আন্দোলনের ব্যাপারে কেমন যেন নিস্পৃহ ছিলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বলেই বসেন, মুক্তিযোদ্ধাদের এই আন্দোলন কোনো জাতীয় ইস্যু নয়। জাতীয় সংসদে তেমন কিছু বলার নেই। এ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা নেতৃবৃন্দ তুমুল প্রতিবাদ করেন।

ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শাল ১২ জন মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডের রায় ঘোষণার পর তিন সংগঠন তাৎক্ষণিক ভাবেও এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এক বিবৃতিতে। এই বিবৃতিটিও আমি লিখি জামান সাহেবের বাসায় বসে। তিন নেতার ব্রিফ মতোই আমি লিখি। সেই বিবৃতিতে একটি বাক্য ছিল এ রকম 'ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শালের চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা বিদ্বেষী।' এটা জেনারেল আবদুর রহমানকে লক্ষ্য করে লেখা। আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে মামলা। ১৯৮২ সালের ২৩ মার্চ এরশাদ ক্ষমতা দখলের প্রথম রাতেই সেই বিবৃতির সূত্র ধরে গ্রেফতার করেন কাজী নূর-উজ্জামান ও কর্নেল শওকত আলীকে। মেজর জিয়াউদ্দিন পালিয়ে যান তাঁর আস্তানা সুন্দরবনে।

বিশেষ করে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে এভাবে লেখা সাহস হোক বা হঠকারিতা হোক, আমাদের তখন করতে হয়েছে। পরবর্তী জীবনে আমি বহু গুরুত্বপূর্ণ মানুষের অসংখ্য বক্তৃতা-বিবৃতি লিখেছি। লেখার সময় মাথায় রেখেছি যে, এক সময় আমার লেখা বিবৃতির জন্য তিনজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের জেল হয়েছিল। এখন বুঝতে পারি, বিচারক যত বিতর্কিতই হোক তার বিরুদ্ধে এভাবে লেখা খুবই বিপজ্জনক। সেদিন সাংবাদিকসুলভ খটকা আমার লেগেছিল। বাক্যটা ঘুরিয়ে লিখলে হয়তো ঝুঁকি একটু কমতো, কিন্তু তাতে ইতিহাস সৃষ্টি হতো না। তিন মুক্তিযোদ্ধা নেতা অবশ্য আরো কড়া বিবৃতির পক্ষে ছিলেন। এ জন্য মতের ভিন্নতা সত্ত্বেও এই তিন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে মনে মনে খুবই সম্মান করি। জামান সাহেব সেটা জানতেন। বাকি দু' জন আমাকে চিনতেই পারবেন না হয়তো। তাতে কিছু যায়-আসে না।

আগেই বলেছি মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে কুক্ষিগত করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন এরশাদ। ১৯৮১ সালের সম্ভবত ২২ সেপ্টেম্বর ১২ জন মুক্তিযোদ্ধার ফাঁসি হয়ে যায়। জামান সাহেবরা উচ্চ আদালতে রিট করার চেষ্টা করেছিলেন, আদালত আমলে নেয়নি। এরপর এল প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। বিএনপির প্রার্থী বিচারপতি সাত্তারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ড.কামাল হোসেন এবং নাগরিক কমিটির প্রার্থী জেনারেল ওসমানী।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সমর্থন দেয় জেনারেল ওসমানীকে। এরশাদ এই সুযোগ নেন। তিনি সংসদের নতজানু অন্য নেতাদের ডেকে 'আমাদের মার্কা লাঙল-মশাল বা নৌকা নয়, আমাদের মার্কা রাইফেল' ইত্যাদি বলে কর্নেল জামানদের বের করে নিজের পছন্দের লোক বসান। (কি আশ্চর্য, কয়েক বছর পর এরশাদ তাঁর জাতীয় পার্টির প্রতীক হিসাবে লাঙ্গলই পছন্দ করেন)। তাঁর ক্ষমতা দখলের ব্লু-প্রিন্ট সেদিনই মূলত প্রকাশ হয়ে পড়ে।

জামায়াত শিবিরের ভবিষ্যতে উত্থান নিয়ে কর্নেল জামানের মতো উদ্বিগ্ন হতে আর কাউকে দেখিনি। গোড়ায় অনেকেই অবহেলা করেছেন। জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর ড. আহমদ শরীফের বাসায় একটি গ্রুপ বসেছিল পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য। সভায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, লেখক শিবিরের একাংশ, বাম রাজনীতির কেউ কেউ ছিলেন। মোহাম্মদ তোয়াহা সেই সভায়ও বললেন জামায়াত-শিবির নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। জিজ্ঞাসা করলেন সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের সংখ্যা কেমন। জামান সাহেব জানালেন প্রতি চার জনের একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং বাকি তিনজন পাকিস্তান প্রত্যাগত। জবাব শুনে হতাশ হন অনেকে।

এরশাদের নেতৃত্বে এর মধ্যে নিজেদের যথেষ্ট সংহত করেন পাকিস্তান-প্রত্যাগতরা। জিয়া-মঞ্জুর হত্যার ঘটনা চট্টগ্রামে ঘটলেও অন্যান্য সেনানিবাসের অনেক কমান্ড থেকে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের সরিয়ে দেয়া হয়। মীর শওকতের সঙ্গে ঘটনার কোনো সংস্রব না থকলেও তাঁকে যশোর কেন্টনম্যান্ট থেকে সরিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয় রাষ্ট্রদূত করে। বিচারপতি সাত্তার এক কোটিরও বেশি ভোটে বিজয়ী হওয়ার পর ছয়মাস যেতে না যেতেই অত্যন্ত ঠুনকো যুক্তি দেখিয়ে এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। আন্দোলন করা মুক্তিযোদ্ধারা এরপর জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে সঙ্গে এরশাদ এবং বিএনপিরও বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে দলমত নির্বিশেষের মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবময় দিনের আপাত-অবসান ঘটে। তারা এরপর নিজেদের রাজনৈতিক দলে থেকে দলকানাসুলভ আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।

ঘটনাপরম্পরায় আজ মনে হয় যে, পঁচাত্তরে দোরাদূনে ট্রেনিং পাওয়া এরশাদ আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের আগে হাইফেন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছেন। যে কারণে ভারতের ইচ্ছার বাইরে যাওয়া তাঁর পক্ষে কখনোই সম্ভব হয়নি। তাঁর মতো ধূর্ত লোক বাংলাদেশের রাজনীতিতে আগেও ছিল না এখনো নেই।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময়, জামায়াত সব সময় অনুসরণ করেছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৫ দলের কর্মসূচি। আওয়ামী লীগ নেতা সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মান্নান বিচিত্রার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এমন কথাও বলেছেন যে, 'জামায়াত এখন গণতান্ত্রিক শক্তি'। জামায়াত রাজনীতি করার অনুমোদন পেয়েছে জিয়াউর রহমানের কাছে। আর নতুন অধ্যায়ের বিকাশ পর্বে প্রশ্রয় পেয়েছে আওয়ামী লীগের। সন্দেহ নেই আওয়ামী লীগই স্বাধীনতার পর ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে একটি দল রেখে বাকি সব দলই নিষিদ্ধ করায় ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের গৌরব-তাৎপর্য সবই ব্যর্থ হয়। তারা রাজনৈতিক লাভালাভ প্রথম বিবেচনা করেছে সব সময়।

১৯৮১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও বামপন্থীদের একাংশ সমর্থন দেয় জেনারেল ওসমানীকে। ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যজনক মনে হওয়ায় অনেকের কাছে আমার খটকার কথা প্রকাশ করি। গুরুত্বপূর্ণ একজন আমাকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, 'ওসমানীকে জেতার জন্য নয়, আমরা দাঁড় করিয়েছি বাকশাল লবিতে ক্রাইসিস তৈরির জন্য, যাতে ৭৮-এর মতো আওয়ামী লীগ ওসমানীকে প্রার্থী করতে না পারে।' এ যেন নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা। বাংলাদেশে কেন বিপ্লব হয়নি তখন আমি আস্তে আস্তে বুঝতে শুরু করি।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নয়া পদধ্বনি ওসমানীকে ঢালাও সমর্থন দিয়েছে। নির্বাচনের আগে বেশি কপি ছাপার জন্য ডাক্তার জাফর উল্লাহ চৌধুরী ও সাদেক খান বেশ কিছু নিউজপ্রিন্ট সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। নির্বাচনের পর অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যায় পত্রিকা। জামান সাহেব একাই অর্থ দিয়ে চালাচ্ছিলেন। তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। প্রেসটি কিনে নেন শাহরিয়ার কবির। আমি দৈনিক সংবাদে যোগ দেই একাশির শেষ ভাগে। এরশাদ ক্ষমতা দখলের ছয় মাস পর জামান সাহেব জেল থেকে বের হয়ে রাজনৈতিক কলাম লেখা শুরু করেন। অনুলিখন করতাম আমি। তাঁর রচনাবলীর অনেকটাই আমার অনুলিখন।

এরশাদের সামরিক শাসন কিছুট নমনীয় হয়ে আসার পর সবাই আবার একত্রিত হতে থাকেন, বিশেষ করে শিক্ষক, সাংবাদিক ও লেখকরা। ইতিমধ্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের ১৫ খণ্ড বের হয়ে গেছে। ড.আহমদ শরীফ, কাজী নূর-উজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বিনোদ দাশ গুপ্ত, মুনতাসির মামুন, শাহরিয়ার কবির, কাজী মুকুল, ড. সাঈদ উর-রহামন প্রমুখ নিয়মিত বসতেন। এ সময় আলোচনায় উঠে আসে যে, যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের ১৫ খণ্ডে রাজাকার-আলবদরদের বর্তমান অবস্থান বা তালিকা নেই, আমাদের এই কাজটি করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের ওপর গবেষণামূলক কাজের জন্য ১৯৮৩ সালে গঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধে চেতনা বিকাশ কেন্দ্র। আমাকে করা হয় প্রকাশনা সম্পাদক।

মোস্তাফা জব্বারের নিপুণ পত্রিকা অফিসে অনুষ্ঠিত একটি সভার কথা আমার মোটামুটি মনে আছে। আমি তখন নিপুণের চিফ রিপোর্টার। পত্রিকাটি তখন খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সারা বাংলাদেশ ঘুরেছি তখন। আমি রিপোর্ট লিখতাম, ছবি তুলতেন নাসির আলী মামুন। বিচিত্রার পরই ছিল নিপুণের অবস্থান। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ও জামায়াত শিবির বিরোধিতায় বিচিত্রার পর নিপুণ ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। সেই কারণে মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের কিছু বৈঠক নিপুণের অফিসেই হয়েছিল। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মোস্তাফা জব্বার খুবই উৎসাহী ছিলেন চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের কর্মকাণ্ডে। চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, ঘাতক দালালদের তালিকা করার। ড. আহমদ শরীফ থেকে শুরু করে সবাইকে বিভিন্ন কাজের ভার দেয়া হয়। কিছু তথ্য সংগহের ভার দেয়া হয় আমাকে ও সাংবাদিক আফসান চৌধুরীকে। আফসান চৌধুরী সে সভায় উপস্থিত ছিলেন কি না স্মরণ নেই। যা হোক এ অবস্থায় একটি কাকতালীয় ঘটনা ঘটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শফিক আহমদ এরশাদের মন্ত্রিসভায় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থানে একাত্তরের ঘাতক দালাল কারা অবস্থান করছে

তার ওপর একটি প্রচ্ছদ কাহিনী নিয়ে আসেন বিচিত্রায়। শাহরিয়ার কবির তাকে দিয়ে আরো কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়ে প্রচ্ছদ আকারে ছাপেন। এটি আরো বিস্তৃত আকারে বই হিসেবে আসে ১৯৮৭ সালের বাংলা একাডেমির বইমেলায়। বই নিয়ে হুলস্থুল পড়ে যায়। লাইন দিয়ে মানুষ বই কিনতে থাকেন। বইয়ের তথ্য আরো অনেক বাড়িয়ে কয়েক মাসের ব্যবধানে ১৫ হাজার কপি ছাপা হয়। এরপরও বাজারের চাহিদা মাফিক ছাপতে না পারায় হাজার হাজার কপি নকল বের হয়। এ ব্যাপারে সাপ্তাহিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শাহরিয়ায় কবির বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন বলে পুনরুক্তি করলাম না। গ্রন্থের তথ্য ও মুদ্রণ সম্পর্কে আমার সাধ্যমতো আমি করেছি। তবে প্রথম সংস্করণে বড় ভূমিকা ছিল শফিক আহমেদের। একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায় গ্রন্থের কয়েক পর্বের প্রচ্ছদ ছাপায় মোস্তফা জব্বার ও তারকালোকের স্বত্ত্বাধিকারী লেখক-সাংবাদিক আরেফিন বাদল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। গ্রন্থের ইনার ছাপা হতো শাহরিয়ার কবিরের ডানা প্রিন্টার্স এ। ডানা তখনও অফসেট হয়নি। শফিক আহমেদ পরে ঘাতক দালালদের ওপর আরো বই লিখেছেন। পরবর্তী সংস্করণগুলোর জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজে আরো যোগ দেন সাংবাদিক মোস্তাক হোসেন। তিনিও নিজ নামে এ ধরনের গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

প্রথম সংস্করণ ব্যাপক আলোড়ন তুললেও তাতে সম্পাদক মন্ডলী ও লেখক ও তথ্যসংগ্রাহকদের নাম না থাকায় বিভিন্ন বিতর্ক ওঠে। তাই আরো বড় করে দ্রুত দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা হয়। যোগ হয় অনেক নতুন তথ্য। দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদক মণ্ডলীর ৪ জনের নাম ছাপা হয়। এঁরা হলেন ড.আহমদ শরীফ, কাজী নূর-উজ্জামান, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও শাহরিয়ার কবির। নামগুলো নিয়েছি গ্রন্থের ইংরেজি ভার্সন 'জোনোসাইড সেভেন্টি ওয়ান : অ্যান অ্যাকাউন্ট অব দ্য কিলার অ্যান্ড কলাবরেটর্স' থেকে– বাংলা দ্বিতীয় সংস্করণটা হাতের কাছে নেই বলে। ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন কাজী নূর-উজ্জামানের ভ্রাতৃবধূ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. নিয়াজ জামান। প্রচ্ছদ এঁকেছেন কামরুল হাসানের ড্রয়িং-এর উপর ভিত্তি করে মাশুক হেলাল। ইনার ছাপা হয়েছিল আমার নিজের প্রেস বর্ণ বিন্যাস-এ। ইংরেজি ভার্সন মূলত সম্পাদনা করেছেন বিনোদ দাশ গুপ্ত। পাণ্ডুলিপি নিয়ে আমাকে বহুবার যেতে হয়েছে বাংলাদেশ টাইমস অফিসে। তথ্য সংগ্রহ ও মুদ্রণ সবই করতে হয়েছে নীরবে গোপনে। মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র জামায়াত-শিবির বিরোধী আরো কয়েকটি গ্রন্থও প্রকাশ করেছে। এর বাইরে ছিল লুৎফর রহমান লিটনের 'ছড়ায় ছড়ায় মুক্তিযুদ্ধ।'

মুক্তিযুদ্ধে চেতনা বিকাশ কেন্দ্রেরই ব্যানারে সাপ্তাহিক নয়া পদধ্বনি আবার বের হয়েছিল ১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে। সমবায় ভিত্তিতে। সবাইর মালিকানা থাকবে এমন কথা হয়েছিল। এতে আগের টিমের বাইরেও নিয়মিত লিখতেন কামাল লোহানী, সৈয়দ আবুল মকসুদ, মামুনুর রশিদ, ডা. সাইফ-উদ দাহার, নাজীম উদ্দীন মোস্তান, এনাম আবেদিন, ইকবাল এনামসহ নতুন প্রজন্মের অনেকে। ফজলুল বারী লেখার বাইরেও দেখাশোনা করতেন। ৩৩ নম্বর সংখ্যায় ফজলুল বারী 'কে এই জিনাত মোশার্‌রফ' শিরোনামের প্রচ্ছদ কাহিনী লেখায় এরশাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপে বন্ধ হয়ে যায় আবার। কোনো ভাবে আর মাস কয়েক টিকিয়ে রাখতে পারলে এরশাদের

পতনের পর এই পত্রিকার সম্ভাবনা ছিল উজ্জ্বল। কিন্তু আমরা তা পারিনি। সে আরেক কাহিনী।

২

জামায়াত-শিবির বিরোধী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বও শুরু হয়েছিল জামায়াতে ইসলামীর উদ্ধানিতে। জামায়াত ১৯৯১ সালের ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত অধ্যাপক গোলাম আযমকে দলের আমির নির্বাচন করে। গোলাম আযম তখন পাকিস্তানি নাগরিক। এই পদক্ষেপ ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী জনগণকে শুধু অপমানই নয়, বাংলাদেশের সংবিধানেরও সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। কারণ, কোনো বিদেশি নাগরিকের বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান ব্যক্তি দূরে থাকুক, কর্মী হওয়ারও সুযোগ নেই। আমি তখন দৈনিক দিনকালের সহকারী সম্পাদক। ২৯ তারিখে কাজী নূর-উজ্জামান সভা আহ্বান করলেন তাঁর বাসায়। গিয়ে দেখি অনেক মানুষ। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, নয়া পদধ্বনি এবং ৮০-৮১ সালের মুক্তিযোদ্ধা সংসদের জামায়াত-শিবির বিরোধী আন্দোলনে জড়িত অনেকেই উপস্থিত। কথা উঠল প্রতিবাদ-প্রতিরোধে নামার জন্য বড় সংগঠন করার। এক এক জন সংগঠনের নাম প্রস্তাব করতে থাকেন। নির্মূল কমিটি ঠিক কে প্রস্তাব করেন মনে পড়ে না। তবে নামটি লুফে নেন কাজী নূর-উজ্জামান। তাঁকে জোর সমর্থন দেন নাট্যকার মামুনুর রশীদ। নামটি আমার কাছে কড়া মনে হয়েছিল। বিশেষ করে 'ওয়াইপ-আউট' অর্থে এটি ব্যবহৃত হওয়ায় আমি আপত্তি তুলি। কাজী নূর-উজ্জামান ও শাহরিয়ার কবির আমাকে প্রস্তাব দিতে বলেন। আমি প্রস্তাব করলাম ঘাতক দালাল প্রতিরোধ কমিটি। আমার প্রস্তাব গ্রহণ না করলেও নোট অব ডিসেন্ট হিসেবে থাকে, গঠন করা হয় আমাকে সহ ১০১ সদস্যের নির্মূল কমিটি। এই আন্দোলনের শুরুর দিকে বিএনপি এবং ছাত্রদলের অনেকেও সমর্থন করেছেন। কিন্তু মার্চে গণআদালত গঠনের পর বিএনপির লোকেরা সরে আসেন। আমি রাখ-ঢাক না করেই নির্মূল কমিটি করেছি। সৈয়দ জাফর তখন দিনকালের সম্পাদক। তিনি বাধা দেননি। পরে সানাউল্লাহ নূরী ও আখতারুল আলম সম্পাদক হয়ে এসে আমাকে এ প্রসঙ্গে কাবু রাখতে চেয়েছেন। আমি তাঁদের বলেছি, এ কারণে চাকরি চলে গেলে আমার আপত্তি নেই। সানাউল্লাহ নূরী একাত্তরে পাকিস্তানের পক্ষে বিবৃতি দেয়া ৫৫ জনের একজন। আখতারুল আলমও পশ্চাৎপদ চিন্তার। পরবর্তীকালে আমি যখন সক্রিয়ভাবে বিএনপি করি তখনো কেউ কেউ শীর্ষ মহলে এ নিয়ে আমার সম্পর্কে অভিযোগ করেছে। তারা পাত্তা পায়নি। কারণ আবুদল মান্নান ভুঁইয়া। তিনি আমাকে অনেক কিছু থেকেই রক্ষা করেছেন। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণ করে। ২৬ জুন বিএনপির মহাসচিব হন আবদুল মান্নান ভুঁইয়া। সেদিনই বিকেলে আমাকে ডেকে বিএনপি অফিসে বসতে বললেন লেখাসংক্রান্ত কাজের জন্য। ২০০১ সলে জামায়াতের চিহ্নিত ঘাতকরা মন্ত্রী হওয়ায় আমি নিজেও মানসিক ভাবে বিচ্ছিন্নতা বোধ করতে থাকি বিএনপির সঙ্গে। সে ইতিহাস আরেক অধ্যায়ে বলবো।

নির্মূল কমিটি গঠনের দিন দুর্ধর্ষ এক মুক্তিযোদ্ধাকে প্রশ্ন করেছিলাম, আন্দোলন আপনাদের হাতে থাকবে তো? নাকি আওয়ামী লীগের হাতে তুলে দিবেন? তিনি বলেছিলেন, আরে না , কি যে বলেন। দেখেন না কি করি।

তিনি এখন বিএনপিতে। আমি বিএনপিতে নেই প্রায় সাত বছর। তাঁর বন্ধুরা কেউ আওয়ামী লীগে, কেউ বা অন্যদলে। দলমত নির্বিশেষে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এখন আর তেমন কোনো নেতা নেই। তাই নতুন প্রজন্মকে চলতে হবে নিজেদেরই জ্বালানো মশালের আলোয়। মতপথ যাই হোক, ঐক্য তো একটা জায়গায় আছে– সেটা একাত্তর। মুক্তিযুদ্ধকেই প্রেরণার তালপুকুর করে তাদের হাঁটতে হবে ভবিষ্যতের দিকে।

পুনশ্চ: চার বছর ধরে আমি নিউ ইয়র্কে। তাই সন-তারিখসহ কিছু ব্যাপারে স্মৃতি শক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। কারো কাছে ভুল ধরা পড়ার পর আমাকে অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

নিউ ইয়র্ক, ৩১ অক্টোবর ২০১৪

হায় প্যালেস্টাইন

'এটা কোনো যুদ্ধ নয়, স্রেফ খুন।' বলেছেন বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল নোয়াম চমস্কি। ধর্মে ইহুদি চমস্কি আরো বলেছেন, 'ইসরাইল তার অত্যাধুনিক জেটবিমান ও নৌবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জনবহুল শরণার্থী শিবির, স্কুল, অ্যাপার্টমেন্ট, মসজিদ ও বস্তির জনসাধারণের ওপর– যাদের সামরিক শক্তি নেই, নৌ ও বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই, ভারী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নেই, যাদের নেই কেন্দ্রীয় কোনো কমান্ড কন্ট্রোল। অথচ এটাকে বলা হচ্ছে যুদ্ধ।'

বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং ইসরাইলে তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন গাজায় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে।

ইহুদি ডারউইন, ফ্রয়েড, মার্কস, আইনস্টাইন প্রমুখ আজ বেঁচে থাকলে তাঁরাও নিশ্চয় লজ্জিত হতেন আজকের ইসরাইলের এই পাশবিকতায়। করতেন প্রতিবাদ। কারণ, ইহুদি এবং জায়নবাদের লিপ্সা-নিষ্ঠুরতা এক নয়।

যে কমিউনিস্ট-নাছারাদের গাল না দিলে কারো কারো পেটের ভাত হজম হয় না, সে দেশের পুতিন মৃদুকণ্ঠে হলেও একটি ধমক দিয়েছেন ইসরাইলকে।

আরব উদ্বাস্তু-শরণার্থীদের মর্মবেদনার চিত্র খ্রিস্টান এডয়ার্ড সাঈদের চেয়ে ভালো করে কেউ আঁকতে পেরেছেন? জীবিতকালে তিনিও ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল। কিংবা আজকের রবার্ট ফ্লিক ই বা কম করছেন?

কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম গুরুবৃন্দসহ 'উম্মা'র তেমন কোনো রা নেই। আজ প্যালেস্টাইনের পাশে না আরব, না ইরান, না তুরান; কেউ নেই– বিপদগ্রস্ত সিরিয়া ও লেবানন ছাড়া। মিশর-জর্ডান অনেক আগেই 'শান্তি' চুক্তি করে রেখেছে ইসরাইলের সঙ্গে। এ শান্তি কবরের শান্তি। অন্যান্য দেশের কেউ কেউ ইনিয়ে-বিনিয়ে অর্থহীন কিছু কথা বলে চলেছেন।

বিশ্ব-দিকপালদের আজকের নীরবতাও মানব সভ্যতার বড় লজ্জা।

ধর্মের কথা দিয়ে এ জন্য শুরু করলাম, জবরদস্তি করে প্যালেস্টাইন ভেঙে ইসরাইল নামক যে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেটি ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের জন্যই করা হয়েছে। এখনও সেখানে অন্যদেশ থেকে কোনো ইহুদি গেলে বিরাট অংকের অর্থ দেয়া হয়। আর ইহুদি না হলে নিজের বাড়ি-ঘরেও কেউ থাকতে পারে না।

দেশ ভিন্ন হলেও যুক্তরাষ্ট্র বছরে ইসরাইলের প্রতিটি ইহুদির জন্য খরচ করে ১৪শ' ডলার, সৈনিক হলে এ সংখ্যা ১০ হাজারে পৌঁছে– যদিও যুক্তরাষ্ট্রের নিজেরই রয়েছে ১৫ ট্রিলিয়ন ডলারের ঋণের বোঝা।

আমরা যখন আন্না ফ্রাঙ্কের ডায়রি পড়ি বা তার ওপর নির্মিত ছবি দেখি, বেদনায় ভারাক্রান্ত হই আন্নার জন্য। অল্প বয়সী এই মেয়েটির বিক্ষিপ্ত হাতের লেখা ডায়রিটি গোটা মানব সভ্যতাকে আলোড়িত করে। অকালে ঝরে গেছে আন্না, কারণ সে ছিল ইহুদি। নরপশু হিটলারের হিংস্র থাবায় হারিয়ে যাওয়া ৬০ লাখ ইহুদির মধ্যে আন্না একজন।

আমরা যখন স্পিলবার্গের 'সিন্ডলার লিস্ট' ছবিটি দেখি, দেখতে পাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরনে আলাদা সিল মেরে ইহুদিদের মানুষ থেকে ডিজিটে পরিণত করে কিভাবে পশু-পাখির মতো হত্যা করা হয়েছে। হত্যা করা হয়েছে হলোকাস্টে, অসউইচে। ট্রেন-ভর্তি মানুষ ঠেলে দেয়া হয়েছে খাদে-সমুদ্রে।

আমরা যখন রোমান পোলানস্কির 'পিয়ানিস্ট' ছবি দেখি, এক ইহুদি শিল্পীর ওপর অবর্ণণীয় নির্যাতনের মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে শিহরিত হই। হিটলারকে অভিসম্পাত দেই এখনো।

কিংবা আমরা যদি পিছিয়ে যাই দুই হাজারেরও বছর আগে, হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর লেখা ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস 'মাই গ্লোরিয়াস ব্রাদার্স'-এর কালে, আমরা দেখি প্যাগান রোমানদের নিষ্ঠুরতার বলি হয়ে কি ভাবে এক ইহুদি রাব্বির পাঁচ বীরপুত্র বলীয়ান আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন; ষষ্ঠপুত্র আত্মসমর্পণ করে কিভাবে নীলকণ্ঠী হয়ে বর্ণনা করেছেন মর্মন্তুদ সেই ইতিহাস।

কিন্তু মুসলমানরা ইহুদিদের তেমন কিছু করেনি, বরং বার বার আশ্রয় দিয়েছে, রক্ষা করেছে। আর ইসরাইলের ইহুদিবাদীরা এখন সেখানে প্যালেস্টাইনীদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে হিটলারের ভূমিকায়।

বর্তমান বিশ্ব যুদ্ধাপরাধী দেখেছে, যুদ্ধাপরাধী রাজনৈতিক সংগঠন দেখেছে। এখন একটি রাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধী হয়ে ওঠাও তাকে দেখতে হচ্ছে। ইসরাইল নিজেই নিজেকে প্রমাণ করে চলেছে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে।

শক্তিমান বীর হতে পারে, আবার দস্যুও হতে পারে। ইসরাইল দস্যু হয়েছে। হলোকাস্ট-অসউইচের কোপ থেকে বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট ইহুদিদের সামনে শান্তির পথও ছিল, কিন্তু তা তারা মাড়ায়নি। ইসরাইলের ভেতরে অল্প সংখ্যায় হলেও শান্তি কামী মানুষ রয়েছে, রয়েছে মানবাধিকার কর্মী, বামপন্থী ও মানবতাবাদীরা। কিন্তু তারা ব্যতিক্রম মাত্র। ইসরাইলের মূলধারা আজ শান্তির ঘাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে খড়্গ হাতে।

তাদের রাষ্ট্র ছিল না। এখনো তারা সংবিধানের প্রয়োজন অনুভব করে না। প্রবাদ আছে, 'গাছের আছে শেকড়, আর ইহুদির আছে পা।' তাদের ধর্মগুরুরা বলে গেছেন, মহাপাপের কারণে দেশচ্যুত হয়েছে তারা এবং পাপ স্খলন হলে রাষ্ট্র হবে।

কিন্তু ইসরাইল নামের সভ্যতার বিষফোঁড়া 'রাষ্ট্রটি' কি পাপ স্খলনের ফসল? হলোকাস্ট-অসউইচ বিভীষিকার আরেক নাম। সেখানে ইসরাইলীরা যুক্ত করেছে আরেক বিভীষিকাময় শব্দ 'নাকবা'। ১৯৪৮ সালের ১৪ মে জন্ম নেয়া রাষ্ট্রটি হলোকাস্ট-অসউইচের অনুকরণে গণহত্যা চালিয়ে গ্রাম-নগর থেকে মানুষকে উচ্ছেদ করে 'নাকবা' নামক আরেক বিভীষিকার জন্ম দেয়। জন্ম মুহূর্তের রাষ্ট্রটি যা করে তা

হিটলারের চেয়ে কম নয়। পরবর্তী ৬৬ বছরের ইতিহাস ধারাবাহিক রক্তপাত, নিষ্ঠুরতা, উচ্ছেদ ও দম্ভেরই ইতিহাস। গাজায় এখন রক্ত ঝরছে নারী-শিশুসহ শত শত নারী-পুরুষের। এ কি 'পাপ স্খলনের লক্ষণ? এ কি আরো বড় পাপ নয়?

ইসরাইল সৃষ্টি করেছে ইউরোপ, মূলত ব্রিটেন। একে আধিপত্যবাদী আগ্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে গড়েছে বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র। তিন বিলিয়ন ডলার দিচ্ছে প্রতি বছর। আজ খোদ আমেরিকায় দাবি উঠেছে সন্ত্রাসী ইসরাইলকে সাহায্য না করার। দাবি উঠছে পৃথিবীর দেশে দেশে। এমন কি ইসরাইলের ভেতরেও, যারা ইসরাইলকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায় না। তাদের সংখ্যা অতি অল্প, আগেই বলেছি।

২

ইহুদিরা বিতাড়িত হয়েছিল রোমানদের দ্বারা এবং নির্যাতিত হয়েছে খ্রিস্টানদের দ্বারা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইউরোপীয়দের প্রিয় খেলা ছিল ইহুদিদের হত্যা করা। মধ্য ও আধুনিক যুগে বহুবার ব্রিটেন থেকে ইহুদিদের বিতাড়ন করা হয়েছে। বিতাড়ন করা হয়েছে ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকেও।

১০৯৯ সালে খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা জেরুজালেম দখল করে নেয়। তারা নগরীর সব অ-খ্রিস্টানকে হত্যা করে। অথচ এর আগে ৪০০ বছর জেরুজালেম মুসলমানদের দখলে থাকা সত্ত্বেও খ্রিস্টানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। পরবর্তীকালে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন তুর্কী বীর সালাদিন।

ইউরোপ-আমেরিকায় ইহুদিদের সঙ্গে সহাবস্থান অসহনীয় ছিল খ্রিস্টানদের। তাদের কাছে ইহুদিদের প্রতীক হয়ে উঠেছিল শেক্সপিয়রের 'সুদখোর শাইলক'। কিন্তু মুসলমানদের সঙ্গে সৌহার্দ্য ছিল ইহুদিদের। মুসলমানরা ইহুদিদের জুলুম করেছে ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল। ইহুদিদের জুলুম-নির্যাতন করেছে প্যাগান ও খ্রিস্টানরা। মুসলমানদের সঙ্গে বহুকাল ধরে ধর্মযুদ্ধ কিংবা ক্ষমতার লড়াই হয়েছে খ্রিস্টানদের, ইহুদিদের নয়।

মুসলমান শাসনাধীন স্পেনে ছিল ইহুদিদের স্বর্ণযুগ। অনেক মন্ত্রী, কবি ও বিজ্ঞানী ছিলেন ইহুদি। তারা মুসলমানদের সঙ্গে মিলে গ্রীক দর্শনের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অনুবাদ করেন। সেটা ছিল ইসলামেরও স্বর্ণযুগ। কিন্তু এক সময় অবসান ঘটে দুই ধর্মাবলম্বীদের স্বর্ণযুগের।

ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা মুসলমানদের হাত থেকে স্পেন দখলের পর স্পেনের মুসলিম ও ইহুদিদের তিনটি অপশন দিয়েছিল- ক. খ্রিস্টান হও, খ. দেশ ছাড়ো, গ. মর। মুসলমানরা স্পেন ত্যাগের সময় ইহুদিদেরও সাথে করে নিয়ে যায়। অনেক মুসলিম দেশে আশ্রয় দেয়া হয় তাদের। যারা দেশ ত্যাগ করেনি ও ধর্মান্তরে রাজি হয়নি তাদের ইনকুইজিশন কিংবা আগুনে পুড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

'প্রতিটি ন্যায়নিষ্ঠ ইহুদি, যিনি তাঁর নিজের জনগোষ্ঠীর ইতিহাস জানেন, তিনি ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে পারবেন না। কারণ ইসলামই ইহুদিদের ৫০টি জেনারেশনকে রক্ষা করেছে, যখন গোটা খ্রিস্টান দুনিয়া ইহুদিদের নির্যাতন করেছে বারবার, তলোয়ারের জোরে ধর্ম ত্যাগেও বাধ্য করেছে।'

(দ্রষ্টব্য: জায়নবাদ, যায়যায়দিন, ৬ আগস্ট, ২০০৬।)

১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার জেমস বাসকোর ইহুদিবাদীদের উদ্দেশ্যে লেখা এক পত্রে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে একটি ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯১৮ সালে ব্রিটেনের সহায়তায় ইহুদি গুপ্ত বাহিনী হানাগা গড়ে ওঠে। সেই ঘোষণার পর ইউরোপ থেকে প্যালেস্টাইনে আগমন শুরু হয়।

World Zaonist Organism (WZO)-এর প্রধান লক্ষ্য ছিল প্যালেস্টাইনের তৎকালীন শাসক অটোমান সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের কাছে অনুমতি আদায়। কাজ না হওয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ইহুদিদের জেরুজালেমে পাঠাতে থাকে।

গত শতাব্দীর ৩০ ও ৪০-এর দশকে ইউরোপ, বিশেষ করে জার্মানি, রাশিয়া, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশে ইহুদি নিধন ও বিতাড়ন শুরু হলে যুক্তরাষ্ট্রও চিন্তা করতে থাকে ইহুদিদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্রের। আইনস্টাইনসহ বহু মেধাবি ইহুদি পালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন।

কেউ কেউ ছিলেন প্যালেস্টাইন ছাড়া অন্য জায়গায় বসতির পক্ষে, বিশেষ করে উর্বর আর্জেন্টিনায়। কেউ কেনিয়ায় বসতির পক্ষে ছিলেন। তখনকার পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ইহুদিদের বাস ছিল যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৪২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিদের মধ্যে এক জরিপে দেখা গেছে শতকরা ৮০ শতাংশ প্যালেস্টাইনে রাষ্ট্র করার পক্ষে ছিলেন।

ক্রিশ্চিয়ান ইউরোপ ও নর্থ আমেরিকা কৌশলে নিজেদের ইহুদিমুক্ত করেছে মুসলমানদের ভূখণ্ডে চাপিয়ে দিয়ে। এতে বেশ কয়েকটি লক্ষ্য হাসিল করে তারা :

১. মুসলিম-ইহুদি সৌহার্দ বিনষ্ট করে মুসলিম বিরোধী শক্তির পাল্লা ভারী করা।

২. মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদের ওপর ইউরোপ-আমেরিকার নজরদারি অব্যাহত রাখা। কারণ তারা মনে করে তেল মধ্যপ্রাচ্যের হলেও প্রযুক্তির কারণে সেগুলো ইউরোপ-আমেরিকারও 'ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি'।

৩. ইহুদিদের ইউরোপ-আমেরিকা থেকে দূরে রাখা।

৪. জেরুজালেমে অটোমানদের শাসন অবসান করা। তুরস্ককে শিক্ষা দেয়া।

৫. ইউরোপ-আমেরিকার নীতি-নির্ধারণী ও জ্ঞান-প্রযুক্তিতে ইহুদিদের প্রাধান্য থাকায় ইহুদিদের 'প্রমিস ল্যান্ড' ৩২ শ' বছর পরে হলেও পুনরুদ্ধার করা।

৬. মধ্যপ্রাচ্যে রাজতন্ত্র ও স্বৈরতান্ত্রিক শক্তিকে ক্ষমতায় থাকতে সাহায্য করা।

১৯৪৭ সালের ১৪ মে জন্মের পর দিন থেকে ইসরাইল প্যালেস্টাইনসহ আরো আরব ভূমি দখলের যে অভিযান চালিয়ে আসছে তা এখনো অব্যাহত।

১৯২৩ সাল নাগাদ প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫ হাজার। ১৯৩১ সালে দাঁড়ায় ১ লাখ ৮০ হাজার। ১৯৪৮ সালে দাঁড়ায় ৬ লাখে।

এর আগের বছর ১৯৪৭ সালের ১৪ মে প্যালেস্টাইন দ্বিখণ্ডিত করে জাতিসংঘের ১৮১ নাম্বার প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে ইসরাইল রাষ্ট্র গঠন করা হয়। তখন ইসরাইলে ইহুদির সংখ্যা ৫৫ শতাংশ এবং প্যালেস্টাইনিদের সংখ্যা ৪৫ শতাংশ। বর্তমান জনসংখ্যা ৮০ লাখ। এর মধ্যে ৮২ শতাংশ ইহুদি, ১৪ শতাংশ মুসলমান, ২ শতাংশ খ্রিস্টান ও ২ শতাংশ দ্রুজ।

মেধার কারণে ইহুদিরা অনেক সময়ই পৃথিবীর প্রভাবশালীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। দর্শন ও বিজ্ঞানে তাদের নানা তত্ত্ব সভ্যতার অনেক পরিবর্তনে সাহায্য করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ব্রিটেনে দুইবার প্রধানমন্ত্রী হয় একজন ইহুদি (১৮৬৮-১৮৮০) বেঞ্জামিন ডিজরেলি। ব্রিটিশ ধনকুবের রথচাইল্ডও ছিলেন ইহুদি। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন হেনরি কিসিঞ্জার। দুনিয়ার বহু বড় বড় মিডিয়া ও ব্যবসা ইহুদিদের। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণীতেও রয়েছে তাদের গভীর প্রভাব। যদিও এখন সারা আমেরিকায় তাদের প্রভাব হ্রাস পেয়েছে আগের চেয়ে– অনেক চেষ্টা করেও তারা ওবামার বিজয় ঠেকাতে পারেনি।

আরব-ইসরাইল দ্বন্দ্বে আমেকির ভূমিকা বাংলাদেশের জন্মকালীন সময়ের সঙ্গে তুল্য। তখন আমেরিকার সরকার পাকিস্তানের পক্ষে থাকলেও বিবেকবান মানুষ ছিল বাংলাদেশের পক্ষে। এখন আমেরিকার সরকার ইসরাইলের পক্ষে থাকলেও বিবেকবান মানুষেরা প্যালেস্টাইনের পক্ষে।

প্যালেস্টাইনীদের ওপর ইহুদিবাদী জুলুমের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চিত্র অল্পই রচিত হয়েছে। ষাটের দশকের শেষের দিকে পাকিস্তানের এসটি জায়েদি 'জারকা' নামের একটি ছবি করে বিপুল জনপ্রিয়তা পান। তিনি 'আলফাতাহ' নামের আরেকটি ছবি করার ঘোষণা দিয়েও ইহুদিবাদীদের হুমকিতে পিছিয়ে আসেন।

মানুষের ইতিহাসে সংগ্রাম-জুলুম-বিশ্বাসঘাতকতা পাশাপাশি চলে। কিন্তু বিজয় হয় সংগ্রামেরই। প্যালেস্টাইনের বীর জনগণের বিজয় অনিবার্য।

নিউ ইয়র্ক, জুলাই ২০১৪

মাদ্রাসা শিক্ষা : দায়-দরদ বনাম ধিক্কার-বিদ্রুপের কথা

'আওয়ামী লীগের যারা বুদ্ধিজীবী তাদের অনেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমান সমাজের গ্রহণযোগ্য ভাষায় কথা বলতে জানেন না। – আহমদ ছফা

বাঙালি মুসলমানদের মূলধারার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিম, বিশেষ করে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের প্রতি গভীর সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছেন, তাদের অন্যতম একজন মণীষীর নাম আহমদ ছফা। তাঁর 'বাঙালি মুসলমানের মন' প্রবন্ধ গ্রন্থ শুধু নয়, অন্যান্য রচনায় বা গ্রন্থেও রয়েছে এর ছাপ। 'মাদ্রাসা শিক্ষার কথা', 'মাদ্রাসা ছাত্রদের ভবিষ্যত কি,' কিংবা 'আত্মহনন চিন্তার বিচিত্র প্রক্রিয়া', প্রভৃতি নিবন্ধে আমরা সাক্ষাৎ পাই সেই সহানুভূতির। এখানে 'আত্মহনন চিন্তার বিচিত্র প্রক্রিয়া' নিবন্ধনটির কিয়দংশ তুলে ধরতে চাই।

আহমদ ছফা লিখেছেন,"বোধহয় নব্বই সালের দিকে হবে। ঢাকাতে মাওলানা সাহেবরা একটি মিছিল বের করেছিলেন। ওটাকে খণ্ড মিছিল বলা যাবে না। ওলামায়ে কেরামেরা তো অংশ নিয়ে ছিলেনই। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল আরো প্রায় হাজার দেড়েক মাদ্রাসার ছাত্র। সকলেই এক হিন্দু ভদ্রলোকের ফাঁসি দাবি করছিল। মিছিলটা দেখে আমার খুব কৌতূহল জন্ম নিয়েছিল। সেই বায়তুল মোকারমের কাছ থেকে পেছন-পেছন অনুসরণ করে প্রেসক্লাব অবধি এসেছিলাম। কেন এসেছিলাম তার একটি কারণ আছে। সাধারণত মাওলানা সাহেবরা যখন কারো ফাঁসির দাবি করেন আপনি নির্ঘাত জেনে যাবেন ওই ব্যক্তিটি হবে মুসলমান। ...কিন্তু ওই মিছিলটিকে, খুবই অবাক হয়ে দেখলাম তারা একজন হিন্দু ভদ্রলোককে ফাঁসিতে লটকাবার কথা বলছেন। এই হিন্দু সন্তানের এত কি সৌভাগ্য যে মাওলানা সাহেবরা তাকে ফাঁসিতে দেয়ার দাবিতে মাঠে নামতে পারেন? সে জন্য মিছিলটার পেছন পেছন আমি প্রেস ক্লাব অবধি আসছিলাম। প্রেস ক্লাব এসে আমি শত্রুহীন একজন মাদ্রাসা ছাত্রের সঙ্গে আলাপ করি। তার সঙ্গে আমার যে বাতচিৎ হয়েছিল সেটা এখানে বয়ান করি। আমি খুব বিনয় সহকারে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হযরত, আপনারা কোন হিন্দুর ফাঁসি চাইছেন? এবং কেন? উনি খুব চেতে গিয়ে বললেন, আপনি এখনো খবর পাননি। আমি অপরাধ স্বীকার করে বললাম, না এখনো খবরটা পাইনি। তিনি জানালেন, এক হারামজাদা হিন্দু আমাদের নবী (সা.)-এর নামে খারাপ কথা লিখেছে। তার জন্য ফাঁসি না চেয়ে কি জেল চাইব? আমি বললাম, ...মেহেরবানী করে নামটা বলুন। তালেবে এলেমটি

থেমে থেমে বললেন, 'নগেন্দর নাথ, নগেন্দ্রনাথই হওয়া উচিত। তালেবে এলেম রফলাটি উচ্চারণ করতে পারেননি বলেই নগেন্দর নাথ হয়ে গেছে। আমি 'নগেন্দর নাথ' বলে কোনো হিন্দু লেখকের নাম শুনিনি। আমি হাঁটতে হাঁটতে পাবলিক লাইব্রেরিতে চলে এসেছিলাম। লাইব্রেরিয়ান ছিলেন আমার বন্ধু। কথায় কথায় ফাঁসির প্রসঙ্গটি আমি উত্থাপন করি। লাইব্রেরিয়ান সাহেব আমাকে জানালেন, আপনি জানেন না নগেন্দ্রনাথ বসু অনেকদিন আগে এনসাইক্লোপেডিয়া ইসলাম সম্পর্কে অথবা ইসলামের এনসাইক্লোপেয়িা এই শিরোনামে একটি কেতাব লিখেছিলেন। ঐ ভদ্রলোক ১৮৮৪ সালে ইন্তেকাল করেছেন। হালে ঐ কেতাবটি কলকাতায় নতুন করে ছাপা হয়েছে এবং তা মাওলানা সাহেবদের কারো চোখে পড়েছে। তাই এই মিছিল, তাই এত আওয়াজ, তাই এই নিঃশর্ত ফাঁসির দাবি। মানুষটা, বেঁচে আছে কিনা সেটা ভেবে দেখার কথাও কারো মনে এল না।' *(আহমদ ছফা রচনাবলী-৮, প্রকাশক, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, সম্পাদনা : নূরুল আনোয়ার। পৃষ্ঠা-১৪০)।*

দ্বিতীয় ঘটনাটি ২০১৩ সালের ৩ এপ্রিলের। হেফাজতে ইসলামের সমাবেশ শেষে বা যোগ দিতে কয়েকজন মাদ্রাসা ছাত্র শাহবাগ জাগরণ মঞ্চের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় ইমরান এইচ সরকার ও তার কয়েকজন বন্ধু তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে কুশল বিনিময়ের পর জানতে চাইলেন সেই ছাত্ররা কার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। ছাত্ররা জানালেন তারা ব্লগারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। তাদের কাছে যখন জানতে চাওয়া হলো ব্লগ কি তারা জানেন কিনা। ছাত্ররা অকপটে স্বীকার করলেন যে, না তারা ব্লগ সম্পর্কে কিছু জানেন না। দেখা গেল তারা ইমরান সরকারকে চেনেনও না, নামও শোনেননি। *(প্রথম আলো, ৩ এপ্রিল ২০১৩, অনলাইন সংস্করণ)।*

এ ধরনের উদাহরণ অসংখ্য আছে। এমন কি যারা তাদেরকে আন্দোলনে আসার আহ্বান জানিয়ে আসছেন তাদেরও অনেকের ধারণা ব্লগার মানেই নাস্তিক। ব্লগার আর নাস্তিক্য তাদের কাছে একাকার। অথচ অসংখ্য ইসলামী ব্লগ ও ব্লগার বিদ্যমান। ব্লগ রয়েছে ইসলামী পণ্ডিত ডা. জাকের নায়েকেরও। বাংলাদেশে ৪৮টি ব্লগে ব্লগারের সংখ্যা আড়াইলাখ। ফেসবুক ব্যবহারকারী ৩২ লাখের মতো। দেশের তিন কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। ব্লগারদের মধ্যে ধর্ম অবমাননাকারী ৮৪ জনের কথা বলা হলেও এ পর্যন্ত জনাদশেকের ব্যাপারেও নিশ্চিত তথ্য জানা যায়নি। যে চারজন গ্রেফতার হয়েছেন তাদের সম্পর্কে খোঁজ খবরসহ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

পরের উদাহরণগুলো অতি-সম্প্রতির। হেফাজতে ইসলামের আন্দোলন ও সাম্প্রতিক রক্তপাতের ঘটনা সম্পর্কে দৈনিক কালের কণ্ঠ ৭ মে লিখেছে : 'ফরিদপুরের একটি কওমি মাদ্রাসার ছাত্র আব্দুর রহিম। মতিঝিলে হেফাজতে ইসলামের কর্মসূচিতে এসে মাথায় আঘাত পেয়েছে সে। গত সোমবার সকালে পুলিশের সহযোগিতায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয় সে। এরপর এক নার্সের মোবাইল ফোনে গ্রামের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। সোমবার রাতে ঢাকা পৌঁছান দিনমজুর বাবা আক্কাস আলী। কিছুটা সুস্থ হওয়ায় ছেলেকে নিয়ে মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার সময় কালের কণ্ঠ প্রতিবেদকের

সঙ্গে কথা হয় আক্কাস আলীর। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'গরিব বলে ছেলেকে মাদ্রাসায় পড়তে দিয়েছি। মনে করেছি, সেখানে লেখাপড়া করে বড় মাওলানা হবে। কিন্তু হুজুরদের কাছে ছেলেকে তো বিক্রি করে দেইনি।' তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে আরো বলেন, 'আমাদের না জানাইয়া ঢাকায় নিয়ে আসল, কিন্তু বিপদের মধ্যে তাদের ফেলে দিয়ে উনারা চলে গেছেন, এমন কাজ কেউ করতে পারে?' বাবার কথা শুনে ছেলে আব্দুর রহিমও কাঁদতে থাকেন।

'ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে এসে ছেলে আকিবুর রহমানের খোঁজ করছেন কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার ভ্যানচালক মাইনুল ইসলাম। মাদ্রাসার শিক্ষকরা হেফাজতের কর্মসূচিতে তাঁর ছেলেসহ মাদ্রাসার সব শিক্ষার্থীকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। অনেকেই বাড়ি চলে গেলেও তাঁর ছেলেকে খুঁজে পাচ্ছেন না। মাইনুল ইসলাম বলেন, 'আমাদের না জানিয়ে মাদ্রাসার শিক্ষকরা ছেলেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। কিন্তু এখনো ছেলে বাড়ি ফিরে যায়নি। পত্রপত্রিকা আর টেলিভিশনে দেখছি, মতিঝিলে অনেক বড় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ইসলামিয়া হাসপাতালে গিয়েও পাইনি, ঢাকা মেডিক্যালেও নাকি এই নামে কোনো রোগী ভর্তি হয় নাই। ভাই, এখন কোথায় গিয়ে আমার ছেলেকে খুঁজে পাব?' এ কথা বলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

'হাসপাতালের জরুরি বিভাগ থেকে ১০৩ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে দেখা যায়, ১১ নম্বর বেডে শুয়ে আছে কিশোর রাশিদুল ইসলাম (১৪)। সিরাজগঞ্জের কাজিপুর থানার চরকান্তনগর গ্রামের মো. হাসান মুন্সির ছোট ছেলে সে। মতিঝিলে পুলিশের রাবার বুলেটে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তার কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত অসাড় হয়ে যায়। গত রবিবার সে অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিল মতিঝিলে রাস্তার পাশে। এর পরও শিক্ষক ও সহপাঠীরা তাকে ফেলেই নিজ জান নিয়ে চলে যায়। রাশিদুলের বড় ভাই মোতালেব হোসেন বলেন, সোমবার ভোরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নুরুল উল্লাহ নামের এক হেফাজতকর্মী মতিঝিল থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ছেলেটিকে প্রথমে নিয়ে যায় ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে। সেখান থেকে পঙ্গু হাসপাতালে এবং সর্বশেষ রাত ৮টায় এনে ভর্তি করানো হয় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। মঙ্গলবার সকালে জ্ঞান ফিরে এলেও নড়াচড়া করতে পারছিল না রাশিদুল। ছোট ভাইয়ের এমন করুণ অবস্থা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না মোতালেব। তিনি বলেন, 'পরিবারের সবার ছোট রাশিদুল। ওকে মাওলানা বানাতেই মাদ্রাসায় ভর্তি করানো হয়। কিন্তু মাদ্রাসার শিক্ষকদের কথায় এখন আমার ভাইয়ের জীবন নিয়েই টানাটানি।' রাশিদুলের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলে সে বলে, 'কোনো কথা বলা যাবে না, হুজুর মানা করে দিছে।'

'কল্যাণপুর বাসস্ট্যান্ডে খাজা মার্কেটের নিচতলায় হানিফ কাউন্টারের সামনে ছেলে আয়নাল হোসেনকে নিয়ে বসে আছেন বাবা মো. আলাউদ্দিন; যাবেন বগুড়ায়। আলাউদ্দিন বলেন, 'আমি ঢাকার উত্তরার একটি পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানে লাইনম্যান সুপারভাইজার হিসেবে চাকরি করি। ছেলে বগুড়ার স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় পড়ে। সেদিন আমাদের না জানিয়ে মাদ্রাসার শিক্ষকরা হেফাজতের কর্মসূচিতে ঢাকায় নিয়ে আসে। সোমবার রাতে আতঙ্কিত হয়ে একটি বিল্ডিংয়ে কোনোমতে জান নিয়ে পালিয়ে

বাঁচে। সকালে আমাকে মোবাইল ফোনে ঘটনা বললে সেখান থেকে নিয়ে আসি।' আলাউদ্দিন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, 'মাদ্রাসায় দিয়েছিলাম লেখাপড়া করে আল্লাওয়ালা হবে, মাওলানা হবে। কিন্তু সেই মাদ্রাসায় হুজুররা ছোট ছোট বাচ্চাকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। ভাই, কত মানুষ মারা গেছে, যদি আমার ছেলের কিছু হইত।' এ সময় ছেলে আয়নাল হোসেন বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'বাবা, আমি আর মাদ্রাসায় পড়ব না, তুমি আমাকে স্কুলে ভর্তি কইরা দিও।' এরপর ছেলেকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিয়ে আলাউদ্দিন বলেন, 'তোমার আর মাদ্রাসায় যাইতে হবে না। স্কুলেই ভর্তি করে দিব।'

'অনুসন্ধানে জানা গেছে, পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবির সম্মিলিত বাহিনী মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতের অবস্থানে অভিযান চালানোর পর হেফাজতের নেতা ও শিক্ষকরা মাদ্রাসার আহত শিক্ষার্থীদের পাশে ছিলেন না। অভিযানের আগে কিংবা পরপরই হাজার হাজার কর্মীকে ফেলে তাঁরা দ্রুত অবস্থানস্থল ত্যাগ করেন। এমনকি বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে আসা 'বড় হুজুর'রাও (মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক) সঙ্গে নিয়ে আসা হাজার হাজার শিশু-কিশোরকে অরক্ষিত রেখে মতিঝিল এলাকা ছেড়ে যান। অনেক মাদ্রাসাছাত্রই জানায়, আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) বিরুদ্ধে যারা মাঠে নামছে, তাদের বিরুদ্ধে ওয়াজ হবে- এমন কথা বলেই শিক্ষকরা তাদের ঢাকায় নিয়ে আসেন।'

যে ক'টি ঘটনার উল্লেখ করা হলো তাতে মাদ্রাসা ছাত্র বা তাদের অভিভাবকদের অজ্ঞতা নিয়ে কেউ কেউ ব্যঙ্গ করতে পারেন, ধিক্কারও জানাতে পরেন কেউ কেউ। কিন্তু শুধু ব্যঙ্গ-ধিক্কারই কি তাদের প্রাপ্য! আর কিছু নয়? এই অজ্ঞতাও পশ্চাদপদতাজনিত পরিণামের দায়-ভার আর কারো ছিল না, বা এখনো নেই? আর চাইলেই কি এদের তুড়ি মেড়ে উড়িয়ে দেওয়া যাবে!

বাংলাদেশে আলীয়া ও কওমী ঘরানার মাদ্রাসাগুলোর মোট ছাত্রসংখ্যার বস্তুনিষ্ঠ পরিসংখ্যান নেই। আহমদ ছফা লিখেছেন ১০ লাখেরও বেশি হবে। অন্যদিকে ফজলুল হক আমিনী জীবদ্দশায় একবার বলেছিলেন শুধুমাত্র কওমী মাদ্রাসায়ই ৫০ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। এই সংখ্যাও অতিরঞ্জিত সন্দেহ নেই। তবে দুই ধরনের মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ লাখের মতো হতে পারে বলে অনেকের অনুমান। বস্তুনিষ্ঠ পরিসংখ্যানের প্রধান অন্তরায় কওমী মাদ্রাসাগুলো। তারা সরকারের সাহায্য নেয় না, নিবন্ধিত নয়। তাদের রুটিন-সিলেবাসও আলাদা। কওমী-ওয়াহাবী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতারা যে সিলেবাস তৈরি করেছিলেন এখন তা-ই অনুসৃত হয়। তৈরির সময় উদ্যোক্তার আবার অনুসরণ করেছিলেন আওরঙ্গজেবের আমলের সিলেবাস।

সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে দেওবন্ধ ঘরানার কওমী-ওয়াহাবীরা সুদীর্ঘকাল ধরে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন করেছেন। তাদের এক অংশ ভারত-বিভাগ চাননি। এদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠা করা হয় আলীয়া মাদ্রাসা। সে কারণে কওমীরা আলীয়া মাদ্রাসাকে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সন্দেহ-তিরস্কার করে আসছে। আলীয়া মাদ্রাসা সরকারের সাহায্য নেয়, ইংরেজি, গণিত পড়ায়, এখান থেকে ডিগ্রি নিয়ে ছাত্রদের অনেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি হন। এদের অনেকেই জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবিরের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু কওমী মাদ্রাসার ছাত্ররা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন না। তাদের মাদ্রাসাগুলোতে পত্রিকা-রেডিও-টিভিও

নেই। এরা স্বদেশে পরবাসীর মতো বাস করেন, সম্পূর্ণ বাস্তব-বিচ্ছিন্ন হয়ে। সিলেবাস যত প্রাচীন, তাদের কাছে সেটা তত কুলীন। এরা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। যদিও লালবাগ, কামরাঙ্গির চর প্রভৃতি কওমী মাদ্রাসার হুজুরদের কেউ-কেউ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। মরহুম হাফেজী হুজুর, মাওলানা আজিজুল হক, ফজলুল হক আমিনী প্রমুখ সরাসরি রাজনীতি করেছেন। তবে কওমী মাদ্রাসার আর দু'টি বড় স্তম্ভ হাটহাজারী ও পটিয়া মাদ্রাসার সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতার জোরালো ভূমিকা এর আগে এভাবে দেখা যায়নি। এখন তারা জড়িয়ে পড়েছেন রাজনীতিতে। অবশ্য খেলোয়াড় হিসেবে নাকি ক্রীড়নক হিসেব তা এখনো পরিষ্কার নয়। এদের অতিক্ষুদ্র অংশ জামায়াতের সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করা হয়। যদিও এরা প্রবলভাবে মওদুদীর ভাবাদর্শ-বিরোধী।

আলীয়া ওয়ালারা জাগতিক-পারলৌকিক সব ধরনের সুযোগ নিচ্ছেন রাষ্ট্রের কাছ থেকে। তাদের ধূর্ততম অংশ জামায়াত-শিবির রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদারিত্ব পেয়েছে এবং আরো বড় পরিসরে অংশিদারিত্ব চাচ্ছে। এরাই আবার জামায়াতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চাকরি এবং ইসলামী ব্যাংকের মূলধন বা কর্জে হাসানা হাসিল করে চলেছেন নিত্যদিন। রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদায়িত্ব পেয়ে পেশাজীবী সংগঠনগুলোতেও ব্যাপকহারে প্রাধান্য বিস্তার করেছেন তারা। তাই যুদ্ধাবপারাধীদের বাঁচাবার গরজ এদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। এদের রুটি রুজি জড়িত এখানে। কিন্তু কওমী ওয়ালাদের চিত্র ভিন্ন। সাধারণ ভাবে এরা নিজেদের ধর্মীয় দল হিসেবে তুলে ধরেন। হেফাজতে ইসলামের জন্ম ২০১০ সালে। নারীনীতিকে কেন্দ্র করে। তারা এখন যে ১৩ দফা তুলে ধরেছেন, এটি নতুন কিছু নয়। এসব দাবি তারা প্রায়শই তুলে থাকেন, কোনো রাজনৈতিক দল হিসেবে নয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে। কিন্তু এবার, অনেকটা তালগোল পাকিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে টাকার খেলারও।

কাঁচপুর থেকে যাত্রাবাড়ি পর্যন্ত মাত্র আট মাইলে ২৬টি কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ হাজারেরও বেশি। ঢাকার লালবাগ, কামরাঙ্গির চরসহ অন্যান্য মাদ্রাসায়ও শিক্ষার্থী অসংখ্য। এদের রাজনৈতিক ভাবে কেউ ব্যবহারের সুযোগ পেলে যে ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে পারে তা আমরা দেখতে শুরু করেছি।

হাটহাজারি, পটিয়া, লালবাগ, কামরাঙ্গির চর এবং ঢাকার আলীয়া মাদ্রাসা প্রভৃতির বাইরে, বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে-পাড়ায় মহল্লায় হাজার হাজার মাদ্রাসা রয়েছে। তাতে কারা পড়ে? পড়ে একেবারে গরিবের সন্তানেরা। আর গরিব এতিম হলে তো কথাই নেই। মাদ্রাসা ছাড়া তার উপায় নেই। এদের অভিভাবকরা শুধু যে সওয়াব হাসিলের জন্য সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠান তা নয়, পাঠান অসহায় হয়ে। স্কুলে পাঠাতে পারেন না তারা। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই বেতন না লাগলেও পেটে তো কিছু দিয়ে যেতে হয়। বহু মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের পেটের অন্নও জোগানো হয়। জামায়াত-শিবির কর্মীদের জন্য জোগায় জীবিকা, আর কওমীরা জোগায় অন্ন। গরিব অভিভাবকরা জানেন না তার সন্তানরা আলীয়া ঘরানায়, নাকি কওমী ঘরানায় পড়ছেন। তাদের জানার কথাও নয়। দরিদ্রের সন্তান খেয়ে-পরার পরও কিছু বিদ্যা অর্জন করতে পারছে এটাই তাদের বড় সান্তনা। আর শহরগুলোতে মাদ্রাসা অনেক গরিব পরিবারের কাছে শস্তার ডে-কেয়ার

ব্যবস্থাও। ছোট সন্তানদের মাদ্রাসায় রেখে মা-বাবারা কাজে যান। আমাদের এনজিও-বিলাসীদের দৃষ্টি এরা আকর্ষণ করতে পারেন না।

কিছু স্বচ্ছল পরিবারের সন্তানও মাদ্রাসায় পড়েন। দেখা যায় কোনো পরিবারের অভিভাবক অন্তত একজন সদস্যকে হলেও পাঠান মাদ্রাসায়, আল্লাহর রাস্তায়। এক্ষেত্রে বেছে নেওয়া হয় পরিবারের সবচেয়ে অমেধাবী সদস্যাটিকে। তবে স্বচ্ছল পরিবার থেকে মাদ্রাসায় পড়ানো সদস্যদের সংখ্যা খুব কম।

আরেক শ্রেণীর মানুষও সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠান, যারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, মাদ্রাসা শিক্ষাই উত্তম। এদের সংখ্যাও নগন্য। এদের একাংশ মাদ্রাসা-শিক্ষকদের সন্তান। মাদ্রাসার চতুর প্রতিষ্ঠাতা বা শিক্ষকরা সন্তানদের কখনো মাদ্রাসায় পড়ান না।

কিন্তু এখানে মূল্য প্রশ্নটি হলো, যারা সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠান বা যারা মাদ্রাসায় পড়তে যান তাদের কী জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা নেই? আলোকিত হওয়ার স্বপ্ন নেই? আকাঙ্ক্ষা কি নেই শিক্ষার সঙ্গে জীবিকার সমন্বয়ের? অবশ্যই আছে, কিন্তু তারা জানেন না সেটি কোন পথে হবে, কার দ্বারা হবে। যোগেন্দ্রনাথের ফাঁসি চেয়ে যারা স্লোগান দিলেন, মিছিলে নেতৃত্ব দিলেন, তাদের কেউ-ই জানতেন না, শতাধিক বছর আগে লোকটির মৃত্যু হয়েছে। ইমরান সরকার ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে যে সব মাদ্রাসা ছাত্রের কথা হয়েছে, তারা জানেন না, ব্লগ কি। অথচ প্রাণপাত করছেন ব্লগারদের বিরুদ্ধে। নরসিংদীর এক মাদ্রসার নিহত ছাত্রটির পরিবারও জানেন না, হেফাজত-১৩ দফা কি। এসব অজ্ঞতার দায় কার? শত্রুবলি আর প্রতিপক্ষ বলি, শত্রু-প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হলে বা তাদের প্রতিরোধে শহীদ পর্যন্ত হওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হলে, তার আগে কি প্রতিপক্ষ বা শত্রু সম্পর্কে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে সবাইকে অবগত করা উচিত নয়? এটা না করা হলে এই অজ্ঞতা ও ধূর্ততা কি ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনতে পারে তা আমরা অতীতেও দেখেছি, এখনো দেখছি। এই অজ্ঞতার শরীকানা তারা ভোগ করতে বাধ্য করছেন গোটা জাতিকে, গোটা দেশকে। এটাই প্রধান সমস্যা। এই অজ্ঞতার কারণেই বিভিন্ন জিগির তুলে ফায়দা নিচ্ছে ধূর্তরা। বিক্রি হয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের ত্যাগ। তাই আজ প্রধানভাবে নজর দিতে হবে সত্যকে উপলব্ধির প্রয়োজনীয় শিক্ষার দিকে। কওমীরা মূলধারায় আসতে চান না বলে একটি প্রচলিত প্রচার রয়েছে। ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস থেকেও এ সম্পর্কিত একটি প্রচেষ্টায় কথা আমরা জানতে পারি উইকিলিস-এর মাধ্যমে। কওমীওয়ালাদের সবাই কিংবা কোনো অংশ যদি তাদের সিলেবাস পরিবর্তন করতে না চান ভালো কথা, এমন উদাহরণ খ্রিস্ট ধর্মেও রয়েছে– ক্যাথালিক ও প্রটেস্টান্টরা কোথাও কোথাও আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালায়। কিন্তু বাংলাদেশে মূলধারায় আনার কোনো উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা কয়েকবার হলেও সেগুলো ছিল অসম্পূর্ণ। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু কওমীদের প্রতিনিধিত্ব সেখানে রাখা হয়নি। তাদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব রেখে আধুনিকায়নের চেষ্টা করা হলে সবাই না হোক, একটি বড় অংশ যে ইতিবাচক সাড়া দেবে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ কওমী মাদ্রাসার গড়ে ওঠার পেছনে কেন্দ্রীয়

কওমীদের গভীর কোনো পরিকল্পনা বা সমন্বয় নেই। গ্রামে-গঞ্জে এগুলো গড়ে উঠছে নানা স্বার্থ ও হিসেব থেকে।

বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত কওমী মাদ্রাসা বৃদ্ধির পেছনে তাদের জীবিকার আপাত নিশ্চয়তাসহ বহুবিধ বিষয় কাজ করে। কওমী শিক্ষার্থীদের জীবিকা সীমাবদ্ধ। মাদ্রাসার শিক্ষক, মক্তবের হুজুর, স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক, মুয়াজ্জিন, ইমাম, মৃতের সৎকার, ফাতেহা পাঠ, ওয়াজ-মাহফিল, দোয়া পাঠ, পশু কোরবানী প্রভৃতির বাইরে তাদের জীবিকা তেমন নেই। আলীয়া মাদ্রাসা হলে উলা-টাইটেল পড়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় একাংশ। কওমীদের সে সুযোগ নেই। তাই শিক্ষাজীবন শেষ হলেই তারা নিজের গ্রামে-পাড়ায়-মহল্লায় আরেকটি মাদ্রাসা করার উদ্যোগ নেন। কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তির মা-বাবার নামে মাদ্রাসা করার প্ররোচনা দেন তারা। কাউকে না কাউকে পেয়েও যান, বিশেষ করে সেই-সব ধনাঢ্য ব্যক্তিদের, যাদের উপার্জন বিতর্কিত এবং সঙ্গত কারণেই যারা পরকাল নিয়ে উদ্বিগ্ন। অনেক সমাজসেবকও মাদ্রাসা করাকেই প্রধান্য দেন।

আবার বাংলাদেশের আমলাদের একাংশের মধ্যেও নিজ এলাকায় মাদ্রাসা করার প্রবল ঝোঁক দেখা যায়। কারণ, সুনামের এটি সহজ উপায়। নানা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ভালো বলে যেসব কাজে লাগিয়ে মাদ্রাসা স্থাপন করে এক ধরনের চাঁদাবাজি বা ভিক্ষাবৃত্তি চালিয়ে তারা মাদ্রাসার সংখ্যাবৃদ্ধি করেন। এসব বিষয়গুলোকেও নজরে আনা দরকার যাতে যত্রতত্র অপ্রয়োজনীয় মাদ্রাসা না বাড়ে, অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের জন্য যতটা প্রয়োজন তার বাইরে নয়।

কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাছে কাছে এটা পরিষ্কার করা দরকার যে, সিলেবাসে প্রয়োজনীয় আধুনিকতা আনা হলে তাদের জীবিকার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে, পরজীবীর দুর্নাম ঘুচে যাবে। এতে একটি অংশ রাজী হলে এর সুফল দেখে অন্যরাও আলোকিত হতে এগিয়ে আসবে। যেখানে আলোর অভাব সেখানে আরো আলোই দরকার, ব্যঙ্গ-ধিক্কার নয়। দরিদ্র ঘরের কওমী শিক্ষার্থীদের জন্য সম্প্রতি আরো একটি ভালো জীবিকার ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়েছে। দরিদ্র বলে তারা অর্থ দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করতে যেতে পারেন না। অথচ তারা আরবী ভাষায় দক্ষ। এদের সরকারের বর্তমান উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত করে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলে উত্তম মানব সম্পদে পরিণত হবেন। আগে আমরা চেষ্টা করে দেখিনি। আহমদ ছফার ভাষায় 'কেউ তাদের দরজায় করাঘাত করে না।'

ওদের পেছনে রেখে সামনে যাওয়া সম্ভব কি? এর জবাব রবীন্দ্রনাথে পাব; 'যারে তুমি নিচে ফেল/ সে তোমারে বাধিবে যে নিচে /পশ্চাতে ঠেলিছ যারে সে/ তোমারে পশ্চাতে টানিছে।'

বাংলাদেশ যদি দরদ দিয়ে ওদের দেখে, যদি ওদের আসল অসহায়ত্বকে উপলব্ধি করে, যদি কোনোদিন বাংলাদেশ গড়ে ওঠে কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে, সেদিন ওরাও মাথা তুলে বাঁচতে পারবেন – সাচ্চা মুসলমানের গৌরব অক্ষুণ্ন রেখেও। তাদের রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহারের পথ বন্ধ হবে। সর্বোপরি বহুকালের, বহুজনের, বহু প্রপঞ্চের দায়-দেনাও তারা পরিশোধ করতে পারবেন।

৩

যেসব কারণে বাংলাদেশে নক্সালদের রাজনীতি ব্যর্থ হয়েছে, অভিন্ন কারণে জামায়াতে ইসলামী বা সে ধরনের দলের রাজনীতি বাংলাদেশে ব্যর্থ হতে বাধ্য। কোনো উগ্র ঝোঁকসম্পন্ন রাজনীতিই বাংলাদেশে সফল হওয়ার সুযোগ নেই। বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ সেই ধাঁচেরই। কারণ, বাংলাদেশের মানুষ প্রয়োজনে কঠোর-কঠিন হলেও তারা অন্তর্গতভাবে শান্তিবাদী, সমন্বয়বাদী। যারা তাদেরকে ভালোবাসার নামে অতীতে আহ্বান জানিয়েছেন বালাদেশের মানুষ তাদের আহ্বানেই সাড়া দিয়েছেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে অহিংস বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান থেকে যখন বিতাড়িত-প্রায়, তখন সমতট গৌড়-পুন্ড্র-বঙ্গে ঠাঁই পেয়েছে সমাদরের সঙ্গে। সেনদের আমলকে বিচ্ছিন্ন ধরা চলে। এদেশে ইসলামও এসেছিল শান্তি ও সাম্যের বার্তা নিয়ে। শান্তি-সাম্যের প্লাবনে ভেসেছে এই ভূমি। চৈতন্যদের সফল হয়েছিলেন ভালোবাসারই আহ্বান জানিয়েই। শেরেবাংলা-ভাসানী-মুজিব-জিয়ার কর্মপদ্ধতি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে সেখানে ভালোবাসা এবং সমন্বয়েরই নির্যাস পাওয়া যাবে। মানুষকে তাঁরা আহ্বান করেছেন ভালোবাসারই নামে। সফলও হয়েছেন। কারণ, বাংলাদেশের মানুষকে তারা অনুভব করতে পেরেছিলেন। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ, কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। ধর্ম ব্যবসায়ীদেরও তারা সুনজরে দেখেন না। তারা ওয়াজ শুনে কাঁদেন, আবার দোতারার গান বা পালা শুনেও কাঁদেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত একই পাঞ্জাবী পরে জুমার নামাজ আদায় করে, আবার সেটি পরেই যায় সঙ্গীতানুষ্ঠান বা পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে। সাধারণ মানুষ চিরকালই অসাম্প্রদায়িক। বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত পরিবারের নারীরা শহরে যেভাবে গার্মেন্টস প্রভৃতিতে কাজ করেন, গ্রামে কাজ করেন মাটি কাটারও। গো-সম্পদ তারা নিজেরা পালন করেন। এরাই কোথাও বেড়াতে গেলে ব্যবহার করেন বোরখাও। তাদের আচরিক জীবন বাস্তবের কঠিন মাটিতে প্রোথিত। মোল্লা-পুরুতদের রক্ত চক্ষুকে ওরা থোড়াই কেয়ার করেন। জামায়াত-হেফাজতিদের কর্মসূচি তাই এদেশে পরিপূর্ণভাবে কায়েম সম্ভব নয়। মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এখনো নিজেরাই পরজীবী। মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশ থেকে অর্থ আসে গুটিকয়েক মাদ্রাসায় মাত্র, বাকিগুলো চলে স্থানীয়দের দান-অনুদানে। পরজীবীরা কখনো মূলধারার নেতৃত্বে আসতে পারেন না। কারণ আসতে গেলে তাদের রগে টান পড়বে।

মাদ্রাসা কখনো শাহবাগীদের প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বীও নয়। শাহবাগ আন্দোলন-চেতনায় যারা জড়িত ভবিষ্যতে তারা হবেন প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, শিল্পী, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী প্রভৃতি। মাদ্রাসা শিক্ষিতদের জীবিকা কি হতে পারে আগেই উল্লেখ করেছি। তবে জামায়াত-শিবিরের ধূর্ততম অংশ আধুনিক উচ্চ শিক্ষা নিয়ে আধুনিক জীবিকায় ভাগ বসালেও তাদের সংখ্যা অতি সামান্য। জামায়াতের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে এরা মাসোহারা, অনুদান ও কর্জে হাসানা নিয়ে আখের গড়েন। তাদের কর্জে হাসানা এমন এক ঋণ যা শোধ না করতে পারলেও তেমন অসুবিধা হয় না।

জামায়াতে ইসলামী একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিত হলেও বৃহৎ অর্থে এটি একটি এনজিও। চাকরি ও ঋণ দিয়ে তারা অধিকাংশ কর্মীকে বেঁধে রেখেছে। ইসলামী ব্যাংকের ব্যবসাপাতি, ইসলামী হাসপাতালের যন্ত্রপাতি বা কোচিং সেন্টারের

গাইড বইয়ের মতো ইসলামও তাদের কাছে রাজনৈতিক হাতিয়ার বই কিছু নয়। সে কারণে ক্ষমতার জন্য কথিত সেকুলার আওয়ামী লীগের পদাঙ্ক অনুসরণে যেমন তাদের আপত্তি নেই, তেমনি আপত্তি নেই কথিত জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে গাঁটছাড়া বাঁধায়। আবার চিরবৈরী কওমী-ওয়াহাবীদের সঙ্গ পেতে বা তাদের ব্যবহার করতেও আপত্তি দেখা যাচ্ছে না। এক কালের বহু কমিউনিস্ট-বামকে খাম সরবরাহেও তাদের দ্বিধা নেই। একটি রাজনৈতিক দল এনজিও হয়ে পড়লে তার সামনে বহু সীমাবদ্ধতা উপস্থিত হয় এবং ক্রমনিঃস্বায়নের দিকে যেতে থাকে। বাংলাদেশে জামায়াতের ঘাঁড়ে আছে আরো অনেক বড় বোঝা, যুদ্ধাপরাধীদের বোঝা। এ বোঝা অতিশয় ভারী যা ঝড়-জলোচ্ছ্বাসেও নাড়াতে পারবে না। সবচেয়ে বড় কথা, যে দলের কর্মীদের উত্তেজিত করতে চাঁদে মুখ দেখতে পাওয়ার গুজব ছড়াতে হয় কিংবা কাবা শরীফের গিলাফ নিয়ে জালিয়াতি করতে হয় সে দল পানি ঘোলা থাকা পর্যন্তই সজীব থাকতে পারে, সব সময় নয়।

দু'টি ছোট ঘটনা উল্লেখ করতে চাই, প্রাসঙ্গিক বলে। গত শতকের আশি'র দশকের শেষভাগে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ছাত্র শিবিরের রাজনীতি সেখানে তখনো প্রকাশ্য হয়নি। একদিন আমার পরিচিত একজন অন্য এক গরিব ছাত্রের বর্ণনা আমার কাছে তুলে ধরলো। ঘটনাটি এরকম : তার ডিপার্টমেন্টের কিছু ছাত্র হঠাৎ একদিন গরিব ছাত্রটিকে পিকনিকে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালো। আর্থিক কারণে প্রত্যাখ্যান করায় সেই ছাত্ররা বিনা চাঁদায়ই জোর করে তাকে নিয়ে গেল। সেখানে দেখা গেল আরো অনেক গরিব ছাত্রকে একইভাবে আনা হয়েছে। উদ্যোক্তারা কোনো রকম রাজনৈতিক আলাপ করা থেকে বিরত থাকলেও খাবার সময় ঘটলো অদ্ভুত ঘটনা। দেখা গেল প্লেটে আগেই পোলাও সাজানো রয়েছে, ওপরে রোস্ট ও কাবাব। খাবার শেষ হওয়ার পর দেখা গেল, প্লেটের তলায় লেখা 'সৌজন্যে, ইসলামী ছাত্র শিবির।' ব্যাপারটা যাদের পছন্দ হয়নি, তাদেরও কিছু করার ছিল না। কারণ এর মধ্যে 'নুন' খাওয়া হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এ রকম। ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে নির্দলীয় বলে পরিচিত একটি পরিবারের এক গৃহিণীর সঙ্গে দুপুরের দিকে দেখা করতে এলেন এক ভদ্র মহিলা। এসে সালাম দিয়ে 'মুসাফা' করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। গৃহিণীও হাত বাড়ালেন সৌজন্য রক্ষায়। কিন্তু আগত মহিলা গৃহিণীর হাত চেপে ধরে বারবার জামায়াতের প্রার্থীর পক্ষে ভোট চাইতে লাগলেন। গৃহিণী বিব্রত। এ অবস্থায় হাত ছাড়ার পর দেখা গেল আগত মহিলার হাতে ছোট একটি কোরআন শরীফ, যা মুসাফা বা হ্যান্ডশেকের আগে দেখা যায়নি। সেই মহিলা বার বার বলতে লাগলেন, আপনি কোরআন ছুঁয়ে আমার কথা শুনেছেন। সম্মতি দিয়েছেন, ভোট না দিলে কিন্তু আল্লাহ নারাজ হবেন। সেই পরিবারটি নির্দলীয় হলেও জামায়াত-বিরোধী ছিল। কিন্তু মনের খটকায় সেই গৃহিণী জামায়াত প্রার্থীকেই ভোট দেন।

দু'টি ধ্রুপদী উদাহরণই অনেক কিছুই তুলে ধরে। এভাবেই একদিকে ইহ ও পরকালব্যাপী প্রলোভন, অন্যদিকে ধূর্ততাকে ধর্মের নামে সর্বোতভাবে ব্যবহার করে কচ্ছপের মতো ধীরে ধীরে এগিয়েছে জামায়াত। কিন্তু এসব অসাধুতা কখনো দীর্ঘস্থায়ী

প্রভাব ফেলে না। বাংলাদেশেও ফেলেনি। জামায়াতী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোই দলের মূল নিয়ামক। এ ধরণের 'নিয়ামক' অন্যকোনো দলে নেই। এ কারণে কখনো অর্থনেতিক রগে টান পড়লে অনেক চমকদার ঘটনাও ঘটবে। এ ছাড়াও দলের ভেতরের 'হ্যাভ ও হ্যাভনটদের' ক্ষোভ এক সময় বিক্ষোভে রূপান্তরিত হয়ে সঙ্কট তৈরি করবে।

বাংলাদেশই পৃথিবীতে একমাত্র দেশ যেখানে ইসলামের বিভিন্ন ফেৎনায় বিভক্ত চিরবৈরী কিছু-দলগ্রুপ সাময়িকভাবে একিত্রত হয়েছে। তারা খুবই জাগতিক লোভে একত্রিত হয়েছে। ইসলাম এখানে তাদের সবারই হাতিয়ার মাত্র, মতাদর্শ বা সংগ্রাম নয়। কওমী-দেওবন্দীদের প্রতিপক্ষ হচ্ছে, আলীয়া ঘারানা ও আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত, আহলে হাদিস, আহমদিয়া, শিয়া প্রভৃতি। আহলে সুন্নাতের প্রতিপক্ষ হচ্ছে দেওবন্দী, তাবলিগ, আহমদিয়া, আহলে হাদিস, শিয়া প্রভৃতি। মওদুদীর উত্থানের পর দেওয়াবন্দীরা পিছু হটলেও হাল ছাড়েননি। পাকিস্তান-আফগানিস্তানে দেওবন্দী-ওয়াহাবীদের অংশই তালেবান হয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত। বাংলাদেশে দেওবন্দী ওয়াহাবীদের কওমী গ্রুপের ফসল হচ্ছে হেফাজতে ইসলাম যারা ঐতিহাসিকভাবে জামায়াত-বিরোধী। আরেক জামায়াত-বিরোধী আহলে সুন্না ওয়া জায়ামায়েত, যাদের তরিকা পীর ও মাজার কেন্দ্রিক। তারা ইতিমধ্যেই জামায়াত-হেফাজতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু চলতি পর্বে হেফাজত জামায়াতের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে মাঠে নেমেছে এবং জামায়াত দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যবহারের চেষ্টা করছে বিএনপিও। হেফাজতিদের এই রহস্যময় উত্থান-কর্মকাণ্ড অচিরেই মতাদর্শগত কারণে নৈতিক সংকট সৃষ্টি করবে সন্দেহ নেই। কারণ, রহস্যজনক আচরণের মধ্যদিয়ে হেফাজতকে জামায়াত-বিএনপির আন্দোলনের মিত্র হিসেবে ব্যবহারের পেছনে হেফাজতের কিছু লোক জড়িত থাকতে পারে, সবাই নয়। অন্যদিকে নাস্তিক-ব্লগারকেন্দ্রিক যে আন্দোলন গড়ে ওঠেছে তার ন্যায্য দাবিগুলো ইতিমধ্যে আংশিকভাবে পূরণ ও পূরণযোগ্য অন্যগুলো বাস্তবায়নের আশ্বাস সত্ত্বেও এই আন্দোলন টেনে নিতে চাইলে গোঁজামিলের প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ, কিন্তু ধর্মান্ধ নয় এবং ধর্মাশ্রয়ী বা ধর্মব্যবসায়ী দলগুলোর প্রতিও অনুরক্ত নয়। তাদের সম্মিলিত ভোটের সংখ্যাও বেশি নয়।

যে ক'জন ব্লগার ইসলাম ধর্ম ও মহানবী (সা.) এর অবমাননা করেছে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ প্রতিটি মানুষই তাদের এই তৎপরতার বিরুদ্ধে। তাদের বিচারেরও পক্ষে মানুষ। তাদের হটকারিতায় ইতিমধ্যে যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু যে সব মহল ঢালাও ভাবে অন্য মতাদর্শেও সবাইকে 'নাস্তিক' আখ্যা দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করছে, এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ তাদেরও সুনজরে দেখছে না। 'নাস্তিক' শব্দটি এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষের সবার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার একটা মতলবাজী প্রচারণার সমানতালে চলছে। যে চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই পর্বে এমন কিছু লোকও আস্তিকের ধ্বজা নিয়ে সমাজের সামনে হাজির হয়েছে যারা কেবলামুখি হয়ে আছাড়ও খায় না, যাদের ব্যক্তিজীবন খুবই কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী। আস্তিক্য-নাস্তিক্যকে তারা ফ্যাসনে পরিণত করে নির্দলীয় হেফাজতের জমায়েত দেখে

তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছেন। তাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়াও এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। কারণ রাজনৈতিক পন্থায় ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতায় যাওয়ার নির্ভরযোগ্য সিড়ি হতে গেলেও রাজনৈতিক দল-আদর্শ দরকার- যা কওম-হেফাজতিদের নেই বা সে ইচ্ছাও হয়তো তাদের নেই। কওমীরা রাজনৈতিক শক্তি নয়। তাদেরকে সেইসব রাজনৈতিক দলই রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছে যারা ইতিমধ্যে দেউলিয়া হয়ে গেছে, রাজপথ থেকে কানাগলিতে ঢুকে গেছে এবং ধাবিত হচ্ছে চোরাবালীর দিকে।

সরকার কওমী-ওহাবী ও আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের মধ্যে ভারসাম্যের যে চেষ্টা করছে তার ফলাফলও শুভ হওয়ার কথা নয়, পাকিস্তানে শুভ হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা, ধর্মাশ্রয়ী দল দিয়ে ধর্মাশ্রয়ী দলকে ঠেকাতে গেলে সুদূর ভবিষ্যতে লাভবান হবে জামায়াতে ইসলামী। কারণ ইসলামের সবচেয়ে মডার্ণ ইন্টারপ্রিটেনশন জামায়াতীরাই করে থাকে।

৪

শাহবাগের মঞ্চ ভেঙ্গে দেওয়া হলেও তাদের বারে বারে ফিরে আসতে হবে, আরো গণমুখী কর্মসূচি নিয়ে, আরো নির্দলীয় হয়ে কিংবা নতুন কোনো রাজনৈতিক শক্তি হয়ে; বাঙালি মুসলমানদের মনোভূমি পাঠ করে তাদের দরদী হয়ে; নাস্তিক্য-প্রচারকারী, বিতর্কিত ও হটকারীদের বাদ নিয়ে। সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের মহান চেতনা ধারণ করে স্বাধীনতার ঝাণ্ডা হাতে। তাদেরই প্রতীয়মান করতে হবে যে, ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে কোনো বিরোধ আগেও ছিল না, এখনো নেই। এদেশের ধর্ম-প্রাণ মানুষেরাই মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। অতি অল্প-সংখ্যক লোকই তখন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে– কেউ ইসলামের নামে, কেউ স্বার্থের কারণে। বিচার অপরাধীদেরই হচ্ছে, যা স্বাভাবিক। অপরাধীদের বিচার না হলে অপরাধ কখনো বন্ধ হবে না। দেরী হলেই বিচার তামাদি হয়ে যায় না। বিচারের নামে কেউ দলীয় স্বার্থ হাসিল বা কোনো পক্ষকে ব্ল্যাকমেইলিং করতে চাইলে তরুণদেরই দাঁড়াতে হবে তাদেরও বিরুদ্ধে।

তরুণরা আমাদের ন্যায় প্রবীণদের মতো ভাবুক বা কাজ করুক তা আশা করি না। কারণ সেটা করতে গেলে আর আশা থাকে না। তরুণরা হবেন আপসহীন, সাহসী ও স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। এ দেশে স্বপ্ন দেখানোর সাহসী লোক নেই। এই শাহবাগই সব সময়ই আলো দেবে ভবিষ্যতকে, কখনো জোনাকির মতো, কখনো তারকার মতো, কখনো চাঁদের মতো, কখনো সূর্যের মতো। আলো তাদের দিতেই হবে। কারণ, আর কারো হাতে আর আলোর মশাল নেই।

৮ মে ২০১৩

মোমের আগুনে দাবানলের উত্তাপ

শাহবাগের মোমের আলোয় আমরা দেখতে পাচ্ছি সূর্যের উজ্জ্বলতা, আগুনে অনুভব করছি দাবানলের উত্তাপ। এ দাবানল অনেক দূর যাবে, অনেক কিছু পোড়াবে। অনেকগুলো অমীমাংসিত বিতর্ক এক সাথে জড়ো হয়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে। অনেক বকেয়া হিসেব চূড়ান্তকরণের সময়ও সমাগত। ইতিহাস কোনো হিসেবই শিকেয় তুলে রাখে না।

আন্দোলনটা শুরু হয়েছে কাদের মোল্লার প্রাপ্য বিচারের হতাশাজনক রায়ের পর। প্রতিবাদ শুরু হয়েছে রায়কে ঘিরে। শাহবাগের সমাবেশ এ জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, এতে জড়ো হয়েছে আমাদের নতুন প্রজন্ম। এরাই বাংলাদেশের ভবিষ্যত। এরাই আগামী দিনের বাংলাদেশ চালাবে– ছাত্র শিবিররা নয়। একাত্তরে যেমন ছাত্র সংঘ ছিল– এ ধরনের নেতিবাচক শক্তি সব সময়ই থাকে এবং বারবার পরাজিত হয়। এবারও হবে।

আওয়ামী লীগ গত নির্বাচনে যেসব কারণে বিজয়ী হয়েছে তার অন্যতম একটি হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের অঙ্গীকার। আমাদের নতুন প্রজন্মের প্রায় ১৫ শতাংশ ভোট তারা বেশি পেয়েছে এই ইস্যুর জন্য। বিএনপি জামায়াত-শিবিরের তিন শতাংশ ভোটের জন্য হারিয়েছে ১৫ শতাংশের ভোট। এ হিসেবের ব্যবধান গাণিতিকভাবে দিন দিনই বাড়তে থাকবে, যদিও বিএনপি হিসেব করছে উল্টো।

সামনে যারা নতুন ভোটার হবে সেখানেও শাহবাগ-চেতনার ভোটারই হবে অন্তত ৯৫ শতাংশ। কেন বাড়বে? বাড়বে, কারণ, প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষের মতো মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী প্রজন্মের কাছেও স্বাধীনতা হচ্ছে সবচেয়ে বড় গর্ব-সম্মানের বিষয়, অন্তর্গতভাবেই এর প্রত্যয় ও শব্দ আবেগমথিত। এটা শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর সবদেশেই স্বাধীনতার প্রত্যয় সর্বোচ্চ স্থানে। মুক্তিযুদ্ধকালে আমরা যারা সাবালক ছিলাম, স্বাধীনতার পর আমরা আওয়ামী লীগের লুণ্ঠন-হত্যাকাণ্ড-দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেখায় আমাদের অনুভূতি আওয়ামী লীগের প্রতি মিশ্র। কিন্তু নতুন প্রজন্মের সেসব তিক্ত অভিজ্ঞতা নেই। তাদের কাছে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের দল আর জামায়াতীরা স্বাধীনতা-বিরোধী ঘাতক-দালালদের দল। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তাদের অনেক সমালোচনা থাকলেও মৌলিকভাবে এটা তাদের কাছে সত্য। আর এই সত্যকে আরো স্পষ্ট করেছে বিএনপি। কারণ, কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি বাদ দিলে বিএনপিও উত্থানকালে মুক্তিযুদ্ধের জমিনে ভর দিয়েই আওয়ামী লীগের বিকল্প হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বিএনপি স্বাধীনতার ঘোষক একজন উজ্জ্বল মুক্তিযোদ্ধার হাতে সৃষ্টি হলেও, বিএনপির

গঠনতন্ত্রের প্রথম শব্দটি মুক্তিযুদ্ধ দিয়ে শুরু হলেও এবং কিছুকাল আগে পর্যন্ত শীর্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের বড় অংশ বিএনপিতে থাকলেও, সাম্প্রতিক সময়ে বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের গৌরব-ঐতিহ্য সবটাই আওয়ামী লীগের হাতে তুলে দিয়ে কাঁধে তুলে নিয়েছে একাত্তরের ঘাতক-দালালদের। তাদের গাড়িতে তুলে দিয়েছে বাংলাদেশের পতাকা। যেখানে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যয়-চেতনাকে নিজেদের করে নিয়ে এবং সেই গর্ব-অহংকারেরই জমিনে দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিতর্ক-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাওয়ার সুযোগ বিএনপির রয়েছে, সেখানে বিএনপি নিজের জমিনই বন্ধক দিয়ে চলেছে জামায়াতসহ অন্য ধর্ম ব্যবসায়ীদের। তাদের জোটের মিত্র ধর্মব্যবসায়ী ও দলের ভেতরকার প্রচ্ছন্ন ধর্মব্যবসায়ীরা অনেক পরিকল্পনা করে বিএনপিকে রাজপথ থেকে টেনে কানাগলিতে ঢুকিয়েছে, সামনে যার চোরাবালি। এই চক্র বিএনপির আওয়ামী লীগ-বিরোধিতাকে মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধিতায় পর্যবসিত করেছে। তাদের লক্ষ্য বিএনপিকে কাবু করে দ্বিতীয় শক্তিশালী দল হিসেবে জামায়াতপন্থীদের প্রতিস্থাপন। এ পরিকল্পনা আওয়ামী লীগেরও। কারণ, তাতে তাদের বিরাট লাভ। দেশ-বিদেশকে তারা দেখাতে পারবে, তাদের বিকল্প হচ্ছে ঘাতক-জঙ্গীরা। পরিকল্পনা চলছে সমান্তরাল ভাবে। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বিএনপি কানে হাত দিলে পাবে, তাতে দেখতে পাবে তার কী প্রিন্ট, কী ইলেকট্রোনিক, সবগুলো মিডিয়াই চিলে নিয়ে গেছে।

পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। সে-সবের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ-বিএনপির হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে কোথাও কোথাও জামায়াতের কয়েকটি ভোটে বিএনপি জিতে বটে, কিন্তু জয়ের পর মূল নাটাই নিয়ে নেয় জামায়াত। এখানে মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থীরাও জামায়াতের কাছে অসহায়। অন্যদিকে দশ বছর বিএনপি–ভায়া ক্ষমতাভোগের সময় সবগুলো প্রতিষ্ঠানেই জামায়াত তাদের লোকদের প্রচুর চাকরি দিয়ে ভোট ও প্রভাব বাড়িয়ে রেখেছে।

আগে উল্লেখিত জোট-দলের সেই চক্র বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বকে জাতীয়তাবাদী অবস্থান থেকে সরিয়ে নিছক ধর্ম ও ভারত-বিরোধিতার মন্ত্র তুলে দিয়েছে মুখে। বিএনপি এই সত্যও ভুলে গেছে যে, শুধু ধর্মই রাজনীতির বড় নিয়ামক হলে সেখানে পাইওনিয়র হচ্ছে জামায়াতে ইসলামী গং, এবং ভারত-বিরোধিতা বড় নিয়ামক হলে সবচেয়ে বড় দল হতো শফিউল আলম প্রধানের জাগপা।

বস্তুত বাংলাদেশের মানুষ ধার্মিক ও ধর্মপ্রিয়, কিন্তু ধর্মান্ধ নয়, ধর্মব্যবসায়ীদের ক্রীড়নকও নয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের মানুষ ভারত-বিরোধী বা ভারতপন্থী, এর কোনোটাই নয়, তারা বাংলাদেশপন্থী।

জিয়াউর রহমান নিজেও মন্ত্রী করেছিলেন শাহ আজিজ ও আবদুল আলিমকে। মওলানা মান্নান প্রতিমন্ত্রী হন জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর, প্রেসিডেন্ট সাত্তারের আমলে। এ নিয়ে সমালোচনার অবকাশ থাকলেও তখন তা তীব্র তেমন ছিল না। কারণ বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণারও ১৩ দিন আগে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন শাহ আজিজ। ইতিহাসের কাছে এ এক বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন। যেমন বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন আওয়ামী লীগ রাজাকার নূরু মাওলানা ও স্বাধীনতা বিরোধী ফায়জুল হককে মন্ত্রী

করায়; স্বাধীনতা বিরোধী কথিকা লেখক শামসুল হুদা চৌধুরী ও বিচারপতি নূরুল ইসলামকে ছিয়ানব্বই সালের নির্বাচনে নমিনেশন দেয়ায়। একইভাবে বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে থাকবে ১৯৯৬ পর্বে জামায়াতকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করা, একসাথে ওঠাবসা। তবে স্বাধীনতার মৌলিক প্রশ্ন থেকে খুব বেশি দূরে না যাওয়ায় বা যেতে না পারায় মুক্তিযুদ্ধের প্রধান ঝাণ্ডাটা এখনও তাদেরই হাতে। এই ঝাণ্ডার জন্য অনেক কিছুই আওয়ামী লীগ পেয়ে থাকে, কোনো কিছু না করেই। যেমন নির্মূল কমিটি ও গণ-আদালতের ফসল পেয়েছে এবং একইভাবে তারা শাহবাগের ঘটনা থেকেও ফায়দা পাবে, কেউ দিতে না চাইলেও। কারণ, তাদের সংগঠন রয়েছে, অন্য বিকল্পগুলো হয় দুর্বল না হয় বিতর্কিত হয়ে পড়েছে।

আওয়ামী লীগ এখন প্রশ্ন তুলছে জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার বিষয়ে। কিন্তু ইতিহাসে এ ঘটনাও প্রথম নয়। ১৯৮০-৮১ সালে দেশে জামায়াত বিরোধী আন্দোলনের সময় জিয়াউর রহমান জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জেনারেল মাজেদুল হককে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটিও করেছিলেন। এর অল্প দিনের মধ্যে জিয়াউর রহমান নিহত হন।

জিয়াউর রহমানের শেষ দিকের ইতিবাচক ইচ্ছা কিন্তু বিএনপি পরবর্তী কালে তুলে ধরেনি, তুলে ধরার অবকাশ ছিল না, এখনতো নয়ই। এখন জামায়াত কবলিত বিএনপিতে মুক্তিযোদ্ধা ও বামপন্থীদের অবস্থানই দুরূহ হয়ে উঠেছে। অথচ বামপন্থীরাই সূচনা-পর্বে বিএনপিকে মানুষের ঘরে ঘরে নিয়ে গেছেন, জিয়াউর রহমানকে সামনে রেখে। মাওলানা ভাসানী নিজ দলের প্রতীক ধানের শীষ পর্যন্ত তুলে দিয়েছিলেন জিয়ার হাতে। এর তাৎপর্য কিন্তু জিয়াউর রহমান অনুধাবন করে ছিলেন।

জিয়াউর রহমানের সময় বিএনপিতে আসা কতিপয় মুসলিম লীগার এতো পেছনে ছিলেন যে তারা তখন নিজেরাই ছিলেন বোঝা। নিজেরাই জান বাঁচাতে ব্যস্ত। সেদিন মুক্তিযোদ্ধা এবং ভাসানীর লোকেরাই ছিলেন অগ্রভাগে– যারা জামায়াত-বিরোধীও ছিলেন। আর, উত্থানকালের সেই দুই শক্তিকেই অপদস্ত করে বিএনপি এখন নিঃস্ব-প্রায়। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ক্রমনিঃস্বায়নের দিকে ধাবিত হবে দলটি। আর শাহবাগের চেতনার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশে ব্যর্থ হলে বিএনপিকে জনবিচ্ছিন্নতাসহ যে মূল্য দিতে হবে তা পূরণ অসম্ভব।

জোটের মিত্র আর আদর্শের মিত্র যে এক নয়, এ সত্যও ভুলে গেছে বিএনপি। এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের সময় বামপন্থীদের একটি অংশও বিএনপির সঙ্গে ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, জোটের মিত্র হিসেবে বিএনপি আকারে-প্রকারে নব ইস্যুতেই জামায়াতকে সমর্থন করলেও এ উপলব্ধি তাদের নেই যে, এদেশে যতবার জামায়াত-শিবির বিরোধী আন্দোলন হয়েছে, তার প্রতিটির পেছনে প্রথম উস্কানি ছিল জামায়াতেরই। বিএনপি সেসব হটকারিতার লিগেসিও বিনা প্রশ্নে বহন করছে, পরোক্ষভাবে বহন করছে জামায়াতের একাত্তরের লিগেসিও। 'মিত্র জোট'-এর জন্য নিজের সর্বনাশ করা বা অনুরোধে ঢেকি খেলার এমন নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এখানে আমি বিএনপির প্রসঙ্গটি বিস্তারিত ভাবে এনেছি এজন্য যে, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে দোটানাগ্রস্ত বিএনপির ইতিবাচক ভূমিকা-গ্রহণ বর্তমান আন্দোলন, বিএনপি

এবং দেশের ভবিষ্যৎ সব কিছুর জন্যই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। আরো কারণ, বিএনপি যুদ্ধাপরাধ প্রসঙ্গে এখন বক্তব্যে খুচরা চালাকী করলেও দলের লক্ষ লক্ষ নেতা-কর্মী বিচারের পক্ষে। নির্মূল কমিটি গঠনের সময়ও এ অবস্থা দেখা গেছে। দলের অসংখ্য নেতা-কর্মী প্রকাশ্যে-গোপনে সমর্থন করেছে নির্মূল কমিটির কর্মসূচি।

যুদ্ধাপরাধীদের আজকের যে আইনী বিচার তা একদিনের সিদ্ধান্ত নয়, উৎকেন্দ্রিক কোনো ব্যাপারও নয়। বাংলাদেশের জনগণ বিগত কয়েক দশক ধরেই সংগ্রাম করে আসছে স্বাধীনতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে, প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজে রাষ্ট্রযন্ত্রকে বাধ্য করতে। বিরামহীন সেই সংগ্রামের কিছু অধ্যায় এখানে তুলে ধরছি। এখানে আমার নতুন লেখার সঙ্গে নিকট-অতীতে নামে-বেনামে লেখার কিছু তথ্যও সংযোজন করেছি।

প্রাক-বিচার আন্দোলনের ইতিহাস

বিচারের উদ্যোগ সরকার সম্প্রতি গ্রহণ করলেও বিচারের দাবি অনেক পুরনো। ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ এজন্য প্রতীকী বিচারের আদলে গঠিত হয়েছিল গণআদালত।

অবশ্য জামায়াত-শিবির বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তারও আগে। প্রথম উস্কানী দিয়েছিল জামায়াতে ইসলামী নিজেই। ১৯৮১ সালের ২৮ মার্চ জামায়াত নেতারা প্রথম সংবাদ সম্মেলনে দম্ভোক্তি করেন যে, ১৯৭১ সালে তারা কোনও ভুল করেননি এবং বাংলাদেশের কনসেপ্ট সঠিক ছিল না। গোলাম আযমও সাপ্তাহিক বিচিত্রার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে একই কথা বলেন। এই বক্তব্যের পর দেশে জামায়াত-শিবিরবিরোধী প্রচণ্ড ক্ষোভ তৈরি হয়। বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নেতৃত্বে আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। কয়েকটি পত্রিকাও এগিয়ে আসে সোচ্চার ভূমিকা নিয়ে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের তৎকালীন চেয়ারম্যান লে. কর্নেল (অব.) কাজী নূর-উজ্জামান ও মহাসচিব নঈম জাহাঙ্গীর, সংগঠনের নেতা নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, সাদেক আহমদ খানসহ অন্যরা এ ব্যাপারে জোরদার ভূমিকা পালন করেন। দাবি ওঠে অবৈধ নাগরিক ও যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত গোলাম আযমের বিচারের। কেউ কেউ দাবি তোলেন গোলাম আযমকে বহিষ্কারের।

মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় শেষের দিকে গোলাম আযম পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যে মুক্তিযুদ্ধের সময়ই স্বাধীনতার সক্রিয় বিরোধিতা ও পাকিস্তানিদের সহায়তা করেছিলেন তা শুধু নয়, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বিদেশে বাংলাদেশ-বিরোধী প্রচারণা চালিয়েছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। এসব কারণে বাংলাদেশে তার নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যায়। ১৯৭৮ সালে গোলাম আযম পাকিস্তানি নাগরিক হিসাবে বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে এ দেশে আসেন অসুস্থ মাকে দেখার কথা বলে। তার ৬ মাসের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও তিনি আর পাকিস্তানে ফিরে যাননি। এ দেশে থেকে যান এবং একাত্তরে তাদের অবস্থানই সঠিক ছিল বলে প্রচারণা চালাতে উদ্বুদ্ধ করেন অন্যদের। জামায়াত নেতাদের দম্ভোক্তির পর তাই যুদ্ধাপরাধের বিচার ও গোলাম আযমের বহিষ্কারের দাবি জোরদার

হতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আন্দোলনের পাশাপাশি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো আন্দোলনে এগিয়ে আসে। এ ব্যাপারে সাপ্তাহিক বিচিত্রা পালন করে ঐতিহাসিক ভূমিকা। তারা পরপর কয়েকটি প্রচ্ছদ কাহিনী করে জনগণকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ হতে সাহায্য করে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, আওয়ামী লীগ প্রভাবিত মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ, জাসদ প্রভাবিত মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠন সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। সারাদেশে তাঁরা জামায়াত-শিবিরের সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে প্রতিরোধের ডাক দেন। মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বে তখন কয়েকটি সফল হরতালও পালিত হয়। তৎকালীন বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলগুলো কয়েকটি হরতাল করে যতটা না সফল হয়েছে, মুক্তিযোদ্ধাদের হরতাল ছিল তার চেয়ে বেশি সফল। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তখন সামগ্রিক বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মাজেদুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯৮১ সালের ৩০ মে জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। কারণ তখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ঘটনা-প্রবাহ অন্যখাতে মোড় নেয়। পরে সামরিক আইন ঘোষণার মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর দীর্ঘদিন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি জামায়াত-শিবিরবিরোধী আন্দোলনও স্থগিত থাকে। জামায়াতের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তার পাশাপাশি বিদেশি কিছু শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা তাদের আরও সক্রিয় করে তোলে। দেশে যখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয় তখন জামায়াত এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে রাজপথে নেমে আসে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৫ দল এবং বিএনপি নেতৃত্বাধীন সাত দল তখন এরশাদের পতন আন্দোলনকে অগ্রাধিকার দিয়ে কার্যক্রম চালাতে থাকে। জামায়াতে ইসলামী দুই জোটের কর্মসূচিকে অনুসরণ করে রাজপথে 'বৈধতা' লাভ করে। রাজনৈতিক দলগুলো তখন জামায়াত সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করে। এ অবস্থায় ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে জামায়াত জাতীয় সংসদে ১০টি আসন লাভ করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পাকাপোক্ত হয়ে বসে। বিএনপির নেতৃত্বাধীন সাত দল সে নির্বাচন বর্জন করে। ১৫ দল থেকে বের হয়ে যায় পাঁচ দল। এ পর্যায়ে জামায়াত এককভাবে আওয়ামী লীগের কর্মসূচিই অনুসরণ করতে থাকে। সে সময় বিচ্ছিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধা ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা জামায়াত-বিরোধিতা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু প্রতিবাদ-প্রতিরোধ প্রবল ছিল না। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে এরশাদ সরকারের পতন হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জামায়াত ১৭টি আসন লাভ করে। বিএনপি সরকার গঠনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় জামায়াত সেই সুযোগ গ্রহণ করে সরকার গঠনে বিএনপিকে সমর্থন করে আনুষ্ঠানিক ও রাজনৈতিকভাবে বিএনপির সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তোলে। সংসদে দুটি নারী আসন তারা নিয়ে নেয়। আত্মবিশ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে জামায়াতের। সেই বিশ্বাসের ওপর ভর করে জামায়াত ১৯৯১ সালের ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত অধ্যাপক গোলাম আযমকে দলের আমির নির্বাচন করে। গোলাম আযম তখন পাকিস্তানি নাগরিক। এই পদক্ষেপ ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী জনগণকে শুধু

অপমানই নয়, বাংলাদেশের সংবিধানেরও সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। কারণ, কোনো বিদেশি নাগরিকের বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান ব্যক্তি দূরে থাকুক, কর্মী হওয়ারও সুযোগ নেই। ঘটনার পর পরই কাজী নূর-উজ্জামানের বাসায় প্রতিবাদী কিছু রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী ঘটনার প্রতিবাদ এবং গোলাম আযমসহ অন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে গড়ে তোলেন ১শ ১ সদস্যের 'একাত্তরের ঘাতক-দালার নির্মূল কমিটি'। মূল নেতৃত্বে আসেন শহীদ বুমির জননী জাহানারা ইমাম। এই কমিটির শীর্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অনেকেই ১৯৮৫ সালে 'মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র' নামের একটি সংগঠন করে জামায়াতের বিরুদ্ধে দালিলিক প্রমাণসমৃদ্ধ প্রথম গ্রন্থ 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' প্রকাশ করে আন্দোলনে এগিয়ে ছিলেন। নির্মূল কমিটির আবেদন ও আন্দোলন ব্যাপক প্রসার লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধের পরে রাজনৈতিক দলগুলো সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসে। এগিয়ে আসে অন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। পরিসর বৃহত্তর করার জন্য গঠন করা হয় 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি'। ৬৯টি সংগঠন যোগ দেয় তাতে। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম হয়ে ওঠেন আন্দোলনের প্রতীক। তারা ঘোষণা করেন গণআদালতে গোলাম আযমের বিচারের। স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে আন্দোলন।

সরকার গোলাম আযমকে গ্রেফতারের পাশাপাশি আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের নামে জারি করে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা। কিন্তু আন্দোলন থেমে থাকেনি। যথাসময়ে গণআদালত ঘোষিত বিচার কাজ সম্পন্ন করে। গোলাম আযম জেল থেকে বের হয়ে মামলা করে নাগরিকত্ব লাভ করেন। গণ-আদালতের সদস্যবৃন্দ জাহানারা ইমামকে চেয়ারম্যান করে গণআদালতের ১২ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। অন্য সদস্যরা হলেন গাজীউল হক অ্যাডভোকেট, ড. আহমদ শরীফ, স্থপতি মাজহারুল ইসলাম, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, ফয়েজ আহমদ,শিল্পী কলিম শরাফী, মাওলানা আবদুল আউয়াল, লে. কর্নেল (অব.) কাজী নূর-উজ্জামান, লে. কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী ও ব্যারিস্টার শওকত আলী খান।

গোলাম আযমের বিরুদ্ধে গণআদালতে আনীত অভিযোগ হচ্ছে : আসামি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, জনপদ ধ্বংস, নারী ধর্ষণ প্রভৃতি অপরাধজনক কাজে মদদকারী এবং স্বয়ং শান্তি-কমিটি, আলবদর, আলশামস বাহিনী গঠন করে এবং হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে রাজাকার বাহিনী গঠন করার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, জনপদ ধ্বংস, নারী ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ সংঘটনের নির্দেশ প্রদান, প্ররোচিতকরণ, বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা প্রণয়ন করে নিজস্ব বাহিনী আলবদর, আলশামসকে দিয়ে তাদের হত্যা করানো এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে 'পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি' গঠন করে বিদেশি শত্রুর চর হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে অপরাধ সংঘটন করার অভিযোগে অভিযুক্ত।

অভিযোগকারীর পক্ষে কৌসুলিবৃন্দ ছিলেন অ্যাডভোকেট জেড আই পান্না, অ্যাডভোকেট শামসুদ্দিন বাবুল, অ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম রেখা এবং অভিযুক্তের

পক্ষে গণআদালতের নিযুক্ত কৌসুলি ছিলেন অ্যাডভোকেট মো. নজরুল ইসলাম (আসিফ নজরুল)। গণআদালতের রায় বাংলাদেশের গণমানুষের পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, কবি শামসুল হক, ড. আনিসুজ্জামানের উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে অত্র গণআদালতে এই মোকদ্দমার সূত্রপাত। এ সম্পর্কে শাহরিয়ার কবিরের গণআদালতের পটভূমি গ্রন্থে' লেখা হয়, 'জনাব গোলাম আযম, পিতা মরহুম মওলানা গোলাম কবির একজন পাকিস্তানি নাগরিক! বহু দিন ধরে অবৈধভাবে বাংলাদেশে, ঢাকা মিউনিসিপাল করপোরেশনের অন্তর্গত মগবাজার এলাকায় ১১৯ নম্বর কাজী অফিস লেনে অবস্থানরত। গোলাম আযম ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে হানাদার তথা দখলদার বাহিনীকে সর্বতোভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ত্রিশ লাখ নিরীহ নিরস্ত্র নারী, পুরুষ ও শিশু হত্যা এবং দুই লাখ নারী অপহরণ ও ধর্ষণে সহায়তা করে যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন। উক্ত সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শান্তি-কমিটি, আল বদর, আল শামস গঠন করে তাদের এবং তার অনুগত রাজাকার বাহিনী দিয়ে সাহায্য করে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক দুই লাখ নারীকে অপহরণ, ধর্ষণ এবং শ্লীলতাহানিতে প্ররোচিত করে হীন অপরাধ সংঘটন করিয়েছেন। উক্ত সময়ে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে তার অনুগত আল বদর, আল শামস ও রাজাকার বাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে ব্যাপক গণহত্যা সংঘটিত করিয়েছেন এবং হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে গণহত্যার উস্কানি, প্ররোচনা এবং সাহায্য দান করেছেন এবং তার উক্ত কাজের ফলে বাংলাদেশের ত্রিশ লাখ নারী, পুরুষ, শিশু নিহত হয়েছে, উক্ত সময়ে অভিযুক্ত গোলাম আযম তার গঠিত ও অনুগত আল বদর, আল শামস বাহিনী ও শান্তি কমিটি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের নিরীহ পরিবার পরিজনের ওপর সশস্ত্র ধ্বংসযজ্ঞ অভিযান পরিচালনা করেন, উক্ত সময়ে অভিযুক্ত গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে বিদ্বেষ ও সহিংসতা ছড়ানোর লক্ষ্যে ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে ধর্মের নামে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করে এবং এই দেশের শিল্প-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন এবং আজও এই দেশের শিল্প-সংস্কৃতিকে বিকৃত করা এবং শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রসমূহ ধ্বংস করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন, অভিযুক্ত গোলাম আযম ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পাকিস্তানের এজেন্ট হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি গঠন করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান না করার জন্য বিদেশি দেশসমূহকে প্ররোচিত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। অভিযুক্ত গোলাম আযম বিদেশি নাগরিক হয়ে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংবিধানবিরোধী ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচার চালিয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের পর অভিযুক্ত গোলাম আযম তার নিজস্ব অনুগত বাহিনী আল বদর, আল শামস এবং রাজাকার বাহিনী দিয়ে লুটতরাজ এবং নিরস্ত্র নিরীহ মানুষের ঘরে অগ্নিসংযোগ করে অসংখ্য জনপদ ধ্বংস করেছেন, ১৯৭১ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর

মাসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যার নীলনকশা প্রণয়ন করে বুদ্ধিজীবী অপহরণ ও হত্যা করে মানবতাবিরোধী জঘন্য অপরাধ সংঘটন করেন।

উপরোক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ১২টি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রচনা করা হয়। গণআদালতের বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অনুপস্থিত থাকায় ন্যায়বিচারের জন্য অভিযুক্ত গোলাম আযমের পক্ষে অ্যাডভোকেট মো. নজরুল ইসলামকে গণআদালত কৌঁসুলি নিযুক্ত করা হয় এবং গোলাম আযমের পক্ষে নিযুক্ত কৌঁসুলিকে অভিযোগসমূহ পাঠ করে শোনানো হয়, অভিযুক্ত গোলাম আযমের পক্ষে নিযুক্ত কৌঁসুলি তার মক্কেল গোলাম আযমকে নির্দোষ বলে দাবি করেন। গণআদালতের বিচার্য বিষয়সমূহের মধ্যে ছিল।

১. অভিযুক্ত গোলাম আযম কি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করে ত্রিশ লাখ নিরস্ত্র নারী-পুরুষ ও শিশু হত্যা এবং দুলাখ নারী অপহরণ ও ধর্ষণে সহায়তা করে যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন?

২. অভিযুক্ত গোলাম আযম কি ২৬ মার্চ থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আল বদর, আল শামস গঠন করে এবং তার অনুগত রাজাকার বাহিনী দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে দুলাখ নারীকে অপহরণ এবং ধর্ষণে ও শ্লীলতাহানিজনক অপরাধ সংঘটন করতে সাহায্য করেছেন?

৩. অভিযুক্ত গোলাম আযম কি পাকিস্তানি বাহিনীকে গণহত্যায় উস্কানি এবং প্ররোচনা দান করেছেন?

৪. অভিযুক্ত গোলাম আযম কি আল বদর, আল শামস বাহিনী গঠন করে তাদের দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের নিরীহ পরিবার পরিজনের ওপর সশস্ত্র ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করেছেন?

৫. অভিযুক্ত গোলাম আযম কি বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে বিদ্বেষ ও সহিংসতা ছড়ানোর লক্ষ্যে ধর্মের নামে বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে ধর্মের নামে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা এবং এই দেশের শিল্প-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন?

৬. অভিযুক্ত গোলাম আযম কি তার নিজস্ব অনুগত বাহিনী আল বদর, আল শামস, রাজাকার বাহিনী দিয়ে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ করে অসংখ্য জনপদ ধ্বংস করে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটন করেছেন?

৭. অভিযুক্ত গোলাম আযম কি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে এই দেশে ১৯৭১ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে তার অনুগত বাহিনী আল বদর ও আল শামসকে দিয়ে বুদ্ধিজীবী হত্যা সংঘটন করেছেন?

৮. অভিযুক্ত গোলাম আযম কি ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি গঠন করে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করেছেন?

৯. অভিযুক্ত গোলাম আযম কি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচার কাজ চালিয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন?

১০. অভিযুক্ত গোলাম আযম কি স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে তার অনুগত আল বদর, আল শামস বাহিনী এবং রাজাকার বাহিনী দিয়ে বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়ে জঘন্যতম মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন?

বিচার্য বিষয়সমূহের পর্যালোচনা এবং সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলা হয়, বিচারের সুবিধার্থে সমস্ত বিচার্য বিষয়সমূহ এক সঙ্গে পর্যালোচনা করা হলো। গণআদালত এই মোকদ্দমায় পক্ষ মোকদ্দমা প্রদানের জন্য মোট ১৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করে। ফরিয়াদি পরে ১ নং সাক্ষী ড. আনিসুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। তিনি তাঁর লিখিত জনাববন্দিতে বলেন যে, অভিযুক্ত গোলাম আযম ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রতিটি অন্যায়, বেআইনি, অমানবিক ও নিষ্ঠুর কাজকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করার প্ররোচনা দিয়েছিলেন এবং তার প্ররোচনায় দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আল বদর এবং আল শামস বাহিনী হত্যা করে। এই সাক্ষী তাঁর সাক্ষ্যে আরও বলেন যে, অভিযুক্ত গোলাম আযম ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৮ সালের ১০ জুলাই পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সশরীরে উপস্থিত থেকে বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত প্রচারপত্র ও প্রবন্ধের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে দুর্বল, সহায়হীন, বিচ্ছিন্ন ও বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র করেছেন। ড. আনিসুজ্জামান মৌখিক সাক্ষ্যের সমর্থনে গোলাম আযমের মুদ্রিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন বক্তৃতা, বিবৃতি, প্রচারপত্র এবং প্রবন্ধসমূহ দলিলরূপে গণআদালতে দাখিল ও প্রমাণ করেন। ফরিয়াদি পরে দ্বিতীয় সাক্ষী ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। তিনি তাঁর লিখিত জবানবন্দিতে ১নং সাক্ষী ড. আনিসুজ্জামানের বক্তব্যকে পুরোপুরি সমর্থন করেন। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, গোলাম আযম পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমির হিসাবে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, লুণ্ঠন এবং জনপদ ধ্বংসের কাজে সহায়তা দান করেছেন। ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে 'দৈনিক পূর্বদেশ-এর ৫ এপ্রিল, ২৭ জুন (গণআদালত প্রদর্শনী 'খ' পর্ব, দৈনিক পাকিস্তান ৭ এপ্রিল, দৈনিক পাকিস্তান ১৬ এপ্রিল, ২০ এপ্রিল, ১৬ আগস্ট, ১৮ সেপেম্বর, ২৪ নভেম্বর, ১৯ জুন, ২১ জুন, ১৯ আগস্ট, ১৭ সেপ্টেম্বর সংখ্যাসমূহ গণআদালতে প্রদর্শনী 'গ' পর্ব), দৈনিক আজাদ ২১ জুন (গণআদালত প্রদর্শনী 'ঘ' পর্ব), দৈনিক সংগ্রাম, ১৭ জুন, ২২ জুন, ২১ জুন (গণআদালত প্রদর্শনী 'ঙ' পর্ব) আদালতে প্রমাণ করেন। ফরিয়াদি পরে ৩ নং সাক্ষী ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের শিক্ষক। তিনি তার জবানবন্দিতে ড. আনিসুজ্জামান এবং ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরকে পুরোপুরি সমর্থন করেন। ফরিয়াদি পক্ষের ৪র্থ সাক্ষী সৈয়দ শামসুল হক বাংলাদেশের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, কবি এবং নাট্যকার। তিনি তাঁর লিখিত জবানবন্দিতে ফরিয়াদির পক্ষের ১ এবং ২ নম্বর সাক্ষীকে পুরোপুরি সমর্থন করেন। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, গোলাম আযম মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে সক্রিয়

ছিলেন। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে আরও বলেন, গোলাম আযম পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করে, মদদ দান করে বাঙালি জাতিকে সর্ব অর্থে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে নীলনকশা প্রণয়ন করেন। তিনি আরও বলেন, গোলাম আযম বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের যে ধর্মবিশ্বাস সেই ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন, মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতাকামী মানুষের ওপর অমানবিক নির্যাতন করেছেন এবং লাখ লাখ মানুষের প্রাণ হরণ করেছেন। তিনি গোলাম আযম কর্তৃক সংঘটিত কাজকে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর অমানবিক পৈশাচিক কাজের সঙ্গে তুলনা করেন। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর সাক্ষ্যে ১/২/৩ নম্বর সাক্ষীকে পুরোপুরি সমর্থন করেন এবং বুদ্ধিজীবীদের হত্যার জন্য গোলাম আযমকে দায়ী করেন। ফরিয়াদি পক্ষের ৫ম সাক্ষী শাহরিয়ার কবির একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তিনি তাঁর জবানবন্দিতে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ অনুসরণের অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন, গোলাম আযমের নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী ফ্যাসিস্ট দর্শনের অনুসারী হয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে। পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে নানাভাবে প্ররোচিত করে গণহত্যাযজ্ঞ ঘটিয়েছে। গোলাম আযমের পক্ষে তাকে জেরা করা হয় কিন্তু তিনি তার সাক্ষ্যে অবিচল থাকেন। ফরিয়াদি পক্ষের ৬ষ্ঠ সাক্ষী মুশতারী শফী বাংলাদেশের খ্যাতনামা লেখিকা, তিনি তাঁর জবানবন্দিতে ফরিয়াদি বাদে প্রথম থেকে পঞ্চম পর্যন্ত সাক্ষীদের বক্তব্য পুরোপুরি সমর্থন করেন।

ফরিয়াদি পক্ষের ৭ম সাক্ষী সাইদুর রহমান শহীদ প্রকৌশলী ফজলুর রহমানের পুত্র। ১৯৭১ সালের ১৫ এপ্রিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং গোলাম আযমের জামায়াতে ইসলামীর দলীয় লোকেরা তাঁর বাবা-মা এবং তিন বড় ভাইকে গুলি এবং বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে। তিনি তাঁর জবানবন্দিতে গোলাম আযমকে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সহায়তাকারী হিসাবে অভিযুক্ত করেন।

অভিযুক্ত গোলাম আযমের জন্য নিযুক্ত কৌঁসুলি তাকে কোনও জেরা করেননি। ফরিয়াদি পরে ৮ম সাক্ষী অমিতাভ কায়সার বিখ্যাত সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারের পুত্র। তিনি তাঁর জবানবন্দিতে বলেন, ডিসেম্বর মাসের ১৪ তারিখে গোলাম আযমের নেতৃত্বে পরিচালিত আলবদর বাহিনীর সদস্য এবিএম খালেক মজুমদার (বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর সদস্য) এবং আরও কয়েক সশস্ত্র আলবদর শহীদুল্লাহ কায়সারকে বাড়ি থেকে হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণ করে নিয়ে যায়। শহীদুল্লাহ কায়সার আর ফিরে আসেননি। পিতার অপহরণ ও হত্যার জন্য অমিতাভ কায়সার গোলাম আযম ও তার নেতৃত্বে গঠিত আলবদর বাহিনী এবং জামায়াতে ইসলামী দলকে দায়ী করেন।

ফরিয়াদি পক্ষের ৯ম সাক্ষী হামিদা বানু মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গোলাম আযমের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতায় এই দেশের দু'লাখ নারীকে অপহরণ ও ধর্ষণ এবং শ্লীলতাহানি করে বলে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর অভিযোগে দু'লাখ মহিলার ওপর পাশবিক নির্যাতনের জন্য এবং নারী হত্যা ও গণহত্যার জন্য গোলাম আযমকে হানাদার বাহিনীর সহায়তাকারী হিসাবে অভিযুক্ত করেন। ফরিয়াদি পক্ষের ১০ নং সাক্ষী মাওলানা ইয়াহিয়া মাহমুদ তাঁর সাক্ষ্যে পবিত্র ইসলাম ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য গোলাম আযম এবং তার দল জামায়াতে ইসলামীকে দায়ী করেন

এবং এই দেশে গণহত্যা, মুক্তিযোদ্ধা হত্যা এবং অগ্নিসংযোগ, জনপদ ধ্বংসের জন্য গোলাম আযমকে অভিযুক্ত করেন এবং আলেম সমাজের পক্ষ থেকে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

ফরিয়াদি পক্ষের ১১ নং সাক্ষী আলী যাকের বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা প্রণয়নকারী হিসাবে গোলাম আযমকে অভিযুক্ত করে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে গোলাম আযমের গোপন বৈঠকের একটি আলোকচিত্র প্রদর্শন করেন। *(গণআদালত প্রদর্শনী 'চ' পর্ব)*

ফরিয়াদি পক্ষের ১২ নং সাক্ষী ড. মুশতাক হোসেন '৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বাংলাদেশের ডাক্তারদের হত্যা করার জন্য গোলাম আযম সহায়তা দিয়েছেন বলে সাক্ষ্য প্রদান করেন। ১৩, ১৪ ও ১৫ নম্বর সাক্ষী অন্য সাক্ষীদের সমর্থন করেন। গণআদালত ওপরের বর্ণিত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সঠিকভাবে পর্যালোচনা করে। এক থেকে ছয় এবং নয় থেকে পনের নম্বর সাক্ষীরা পরিচিত এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। সাত ও আট নম্বর সাক্ষীদ্বয় শহীদ পিতার পুত্র। তাঁদের সাক্ষ্য এত সহজ-সরল এবং এমন প্রত্যয়ী যে, তাঁদের সাক্ষ্য বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক করে না। সাক্ষীদ্বয় প্রদত্ত সাক্ষ্য সত্য এবং দাখিলকৃত প্রদর্শনীসমূহ অকাট্য বিবেচনা করে সর্বসম্মতভাবে অভিযুক্ত গোলাম আযমের বিরুদ্ধে প্রতিটি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে মনে করে এবং আনীত প্রতিটি অভিযোগের প্রত্যেক অপরাধে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশে উপরোক্ত অপরাধ দৃষ্টান্তমূলক মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ।

যেহেতু গণআদালত কোনও দণ্ডাদেশ কার্যকর করে না, সেহেতু অভিযুক্ত গোলাম আযমকে দোষী সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়। বার্টান্ড রাসেলের গণআদালত শাহরিয়ার কবিরের গণআদালতের পটভূমি গ্রন্থে লেখা হয়, গণআদালত আইনি আদালত নয়, প্রতীকী আদালত ও বিবেকের আদালত। এ ধরনের আদালত গঠনের অন্যতম উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন মনীষি বার্টান্ড রাসেল। যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে বিশ্ব বিবেকের সোচ্চার প্রতিবাদের প্রতিফলন ঘটান তিনি গণআদালত গঠন করে। উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসন ও হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে সারা বিশ্ব যখন সোচ্চার, তখন সেসব অপরাধের প্রতীকী বিচারের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালের ১৩ নভেম্বর তিনি লন্ডনে ভিয়েতনাম ট্রাইব্যুনাল আহবান ও ১শ ১ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। রাসেল আইনজ্ঞ ছিলেন না। মানবতা ও মনুষ্যত্বের প্রতিনিধি হয়ে তিনি এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি বলেছিলেন, ট্রাইব্যুনালের প্রতিটি সদস্য তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য এই বিবেকের আদালত গঠন করেছেন। পাঁচটি ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রস্তুতের জন্য ট্রাইব্যুনাল কমিশন নিয়োগ করে। ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে : আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গ করে আগ্রাসন, পরীক্ষামূলক অস্ত্র ব্যবহার, স্কুল এবং অন্যান্য বেসামরিক এলাকায় বোমাবর্ষণ, যুদ্ধবন্দিদের নির্যাতন ও অঙ্গচ্ছেদ এবং গণহত্যা। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত প্যারিসে ট্রাইব্যুনালের শুনানি চলে। বার্টান্ড রাসেলের পিস

ফাউন্ডেশনের সচিবালয় স্থাপন করা হয় সেখানে। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে বহু বিশ্বখ্যাত বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, সংসদ সদস্য ট্রাইব্যুনালে যোগ দেন। ট্রাইব্যুনালের সদস্যরা তদন্ত কমিশনের সদস্য হিসাবে কাজ করেন এবং প্রামাণ্য তথ্য-সাক্ষ্য প্রস্তুত করেন। এতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, বিবাদী পক্ষের সাক্ষীদের ট্রাইব্যুনালে হাজির হতে বাধ্য করা না গেলেও মার্কিন সরকার ও প্রেসিডেন্ট জনসনকে ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে তার নীতির জন্য আত্মপক্ষ সমর্থনের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানানো হবে। সেটি করা হয়েছিল। ভিয়েতনাম ট্রাইব্যুনাল সব সাক্ষ্য-প্রমাণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভিয়েতনাম যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে জড়িয়ে ফেলা ও উত্তর ভিয়েতনামে গণহত্যার অভিযোগে জনসন সরকার ও মার্কিন প্রশাসনকে দায়ী করেছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও যুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে জড়িতদের বিচার কার্যক্রম একটি বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে কয়েকজনকে। কিন্তু চিহ্নিত অনেক যুদ্ধাপরাধী এখনো গ্রেফতার হয়নি। জনগণ ধৈর্য্য ধরে প্রতীক্ষা করছে বিচার দেখার জন্য। অপেক্ষা করছে লাখো শহীদের বিদেহী আত্মা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের এখনও খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়ার কাজ চলছে। সুতরাং বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়নি। সভ্যজগত এ ব্যাপারে কোনো আপস করেনি। অবশ্য বাংলাদেশ আপাত-আপস করেছিল তার মাটির যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে। কিন্ত শেষ পর্যন্ত যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ। দেশের জনগণ, বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম এই বিচারকে সম্ভাবিত করতে বদ্ধপরিকর রায় দিয়েছে বিগত সাধারণ নির্বাচনে এবং আগাগোড়া অবিচল থেকেছে বিচারের দাবিতে। চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের বায়বীয় আস্ফালন ও আত্মম্ভরিতা মিলিয়ে গেছে বাতাসে। বিচার হতে চলেছে তাদের বাংলার মাটিতে। এ বিচার স্বাগতিক। যারা বিচারের বিরোধিতা করছে তারা ক্রমশ আরো জনবিচ্ছিন্ন হয়েছে, দূরে সরে যাচ্ছে নতুন প্রজন্মের কাছ থেকে। আর বাংলাদেশ? আমাদের মাতৃভূমি আবার রচনা করতে চলেছে আরেকটি অনুপম মহাকাব্য।

নিউ ইয়র্ক, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

ভারতপন্থিতা ও বিরোধিতা নিয়ে কথা

আবেগ থিতিয়ে ঘটনার নির্মোহ-নির্লিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরার জন্যে ৪৩ বছর কম সময় নয়। কিন্তু সেই নির্মোহ-নির্লিপ্ত বর্ণনাটিই পরিপূর্ণভাবে আমরা এখনো পাচ্ছি না।

এটি যে একজনই কিংবা 'এখুনি' তুলে ধরতে পারবে তা-ও নয়। তবে এ ব্যাপারে এখন অনেকেই মন্তব্য রাখা শুরু করেছেন। এই উদ্যোগের সঙ্গে শামিল হতে চাইছি। কিছু বন্ধুর রচনায় উদ্দীপ্ত হয়ে আমার সংগ্রহ ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করার তাগিদ অনুভব করছি।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সশস্ত্র পর্ব চলেছে মাত্র পৌনে ৯ মাস। এতো অল্প সময়ের মধ্যে ত্রিশ লাখ মানুষের জীবনদানসহ কোটি-কোটি মানুষের বলীয়ান আত্মত্যাগের নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। মায়ের গর্ভ থেকে একটি শিশুর জন্ম নিতে যেখানে ৯ মাসের বেশি সময় লাগে, সেখানে পৌনে ৯ মাসে একটি দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে সাফল্য লাভের নজিরও ইতিহাসে বিরল।

তবে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সশস্ত্র পর্বে ভারত সরাসরি সহায়তা না করলে এবং ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ না হলে স্বাধীনতা অর্জনে আরো অনেক বেশি সময় লাগতো এবং জীবন ও সম্পদহানি হতে আরো অনেক বেশি। যুদ্ধে ভারতের তিন হাজারেরও বেশি সেনা নিহত ও নিখোঁজ এবং প্রায় ১২ হাজার সেনা আহত হয়েছেন বলে আমরা জানতে পারি। প্রায় এককোটি মানুষকে দীর্ঘদিন লালন-পালন করেছে ভারত। এ ক্ষেত্রে ভারতের ত্যাগও সীমাহীন। সবচেয়ে বড় কথা, ভারত তখন একটি বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকিও নিয়েছিল, যা ভাগ্যক্রমে ঘটেনি। সপ্তম নৌবহর এসেও ফিরে গেছে, চীনারাও দিনাজপুর দিয়ে ঢোকেনি। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলাম আমরা সেদিন। পরবর্তী কালে আমরা জানতে পারি, আমেরিকা চীনকে অনুরোধ করেছিল ভারতের ভূ-খণ্ড মাড়িয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়তে; তাহলে সপ্তম নৌবহর থেকে আক্রমণ চালাতো আমেরিকা। চীন পিছিয়ে যাওয়াতে আমেরিকাও পিছিয়ে যায়।

সমগ্র পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করলে বলতে হয়, বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক আরো বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল, উচিত ছিল আরো পারস্পরিক বিশ্বাস-আস্থা অর্জন। কিন্তু তা হয়নি। এর জন্য কার দায় বেশি তা ইতিহাসই নির্ধারণ করবে। তবে সাধারণ ভাবে বলা চলে, দায় দু' পক্ষেরই। কারো বেশি কারো কম।

বাংলাদেশের মানুষ শুধু উদারই নয়, বন্ধুবৎসলও। তারা ভারতপন্থী যেমন নয়, তেমনি নয় পাকিস্তানপন্থীও। বাংলাদেশের মানুষ মূলত বাংলাদেশপন্থী। এই সত্য

অনুধাবনে ভারতের শাসকরা যেমন আগ্রহ দেখায়নি, তেমনই বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বও সেই সত্য অনুধাবন করতে ও তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের মূলধারার রাজনীতিকেরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে দেশের মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করে এক অংশের গায়ে ভারতের সিলমোহর ও অন্য অংশের গায়ে পাকিস্তানের তকমা লাগিয়ে দিয়েছেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, প্রতীকিভাবে একথা বলা চলে যে, আওয়ামী লীগ ভোটে জিতলে যেন বা ক্ষমতায় আসে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র', আর বিএনপি ভোটে জিতলে যেন বা ক্ষমতায় আসে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই। তারা লোম বাছতে গিয়ে ইতোমধ্যেই কম্বল উজাড় করে ফেলেছেন। জনগণ রাজনীতিকদের তরফ থেকে এমন ধারণাই পাচ্ছে। অথচ বাংলাদেশের মানুষ শুধুমাত্র বাংলাদেশপন্থী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা নিয়ে দুই দেশেই বিগত ৪৩ বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে। আগেই বলেছি, ৪৩ বছরে আবেগ অনেক থিতিয়ে এলেও এ-নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা এখনো তেমন দেখা যায় না। বরং দুই দেশেই দুই ধরনের চরমপন্থার ধারাবাহিক জাবর কাটার নজিরই আমরা দেখতে পাই। এ বিষয়ের আলোচনায় ভারতীয় চরমপন্থার নির্যাস হচ্ছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ভারতের দয়ার দান– মুক্তিযোদ্ধারা ছিল পথ প্রদর্শক মাত্র। বাংলাদেশী চরমপন্থার নির্যাস হচ্ছে, ভারত যুদ্ধ ও সহায়তা করেছে আমাদের স্বার্থে নয়, চিরশত্রু পাকিস্তানকে ভাঙ্গার জন্য। অবশ্য দুই দেশেই যুক্তিবাদী ও উদার মানবতবাদীরা উল্লিখিত দুই চরমপন্থার বিরোধিতা করে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করছেন। বিশেষ করে রণাঙ্গনে ছিলেন এমন সেনাকর্মকর্তা ও যোদ্ধারা, তাদের প্রকাশিত গ্রন্থে। অবশ্য ওই ধারা এখনো ক্ষীণ। মূলস্রোত এখনও উগ্র মণ্ডলে ঘুরপাক খাচ্ছে। ভারতের প্রতিক্রিয়াশীলরা বাংলাদেশকে অকৃতজ্ঞ এবং ভারত-বিরোধী বলতে কসুর করছে না। আবার বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীলরা ভারতের 'বড়ভাইসুলভ' আচরণকে বিরোধিতা করতে গিয়ে শুধু ভারতেরই বিরোধিতা করছে না, বিরোধিতা করছে মুক্তিযুদ্ধেরও। এক শ্রেণী আবার আওয়ামী লীগের উগ্র বিরোধিতা করতে গিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধকেও করে তুলছে প্রতিপক্ষ।

তবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সহায়তা করেছে বলে আমাদের যেমন তা স্বীকার করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, তেমনি, যুদ্ধে সহায়তা করেছে বলে ভারতেরও উচিত নয় বাংলাদেশের চামড়া তুলে নিয়ে ডুগডুগি বাজানো। একাত্তরের বাস্তবকে আজকেও বাস্তবের জমিতে দাঁড়িয়েই পর্যালোচনা করা উচিত।

বাংলাদেশের মানুষের ওপর অতীতে যারাই আক্রমণ করেছে তাদের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম- যুদ্ধ করেছে এদেশের মানুষ। একই ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও এই ভূখণ্ডের মুসলিমরা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আক্রান্ত জনগণকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, জিতেছে। কিছু কুলাঙ্গার রাজাকার-আলবদর-আলশামস ইত্যাদি হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং তারাও পরাজিত ও ঘৃণিত হয়েছে। পাকিস্তানিদের ইসলামের দোহাইও মানুষ কানে তোলেনি।

অন্যদিকে ভারত যখন আমাদের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন আচরণ করেছে আমরাও প্রত্যুত্তরে তাই করেছি। ১৯৭১ সালে আমাদের অভীষ্ট ছিল স্বাধীনতা লাভ আর ভারতের অভীষ্ট ছিল পাকিস্তানের খণ্ডায়ন। ভারত তার এই আকাঙ্ক্ষার কথা গোপনও রাখেনি। ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক কে সুব্রাহ্মণিয়াম প্রকাশ্যে বলেছেন, 'ভারতকে উপলব্ধি করতে হবে যে, আমাদের স্বার্থেই পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দেওয়া উচিত এবং এবারে আমরা যে সুযোগ পেয়েছি সে ধরনের সুযোগ আসার আশু আর কোনো সম্ভাবনা নেই।'

সম্প্রতি হেনরি কিসিঞ্জারও এক সাক্ষাৎকারে অনুরূপ মন্তব্যই করেছেন।

ভারতের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান ১৭ দিনের যুদ্ধে পাকিস্তান যেখানে প্রায় সমানে-সমানে লড়েছে, সেখানে আমেরিকা ও মুসলিম বিশ্বের ঢালাও অস্ত্র-অর্থ পাওয়া সত্ত্বে সে দেশ ছয় বছর পর ১৩ দিনের যুদ্ধে বেধড়ক মার খেয়েছে ভারতের হাতে– বাংলাদেশ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ছিল বলে, মুক্তি ও মিত্র বাহিনী একসাথে যুদ্ধ করেছে বলে। মিলিত বাহিনীর সেই মারে পাকিস্তান হারায় তার নৌবাহিনীর অর্ধেক,(তারিক আলীর হিসাবে অবশ্য এক-তৃতীয়াংশ), বিমান বাহিনীর এক-চতুর্থাংশ এবং সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ। ভারত পশ্চিম পাকিস্তানের জায়গা দখল করে ৬৫-র যুদ্ধেরও প্রায় তিনগুণ বেশি। এই ঘটনায় ভারত সমরশক্তিতে পাকিস্তানের চেয়ে অনেক দূরে এগিয়ে যায়, বলতে গেলে পাকিস্তানের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। এখন পাকিস্তানের দিক থেকে যুদ্ধের হুমকিও তেমন আর নেই ভারতের।

একাত্তরে বাংলাদেশ বিদ্যমান পরিস্থিতিকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করে ভারতীয়দের শক্তিকে যেমন শত্রুর বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পেরেছে, তেমনি ভারতও অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে ব্যবহার করতে পেরেছে। এই সুযোগের চাষাবাদ পাকিস্তানের মাথামোটা জেনারেলদেরই করা। সেই পর্বে বাংলাদেশ ও ভারত ফসলটা তুলেছে মাত্র। অবশ্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ ৯ মাসের যুদ্ধেই সীমাবদ্ধ নয়, এর রয়েছে বিস্তৃত পটভূমি। সূচনা হয়েছে পাকিস্তান সৃষ্টির পর-পরই। বিকশিত হয়েছে মহান ভাষা আন্দোলন, শিক্ষার আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, ৬ ও ১১ দফার আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে।

১৯৭১ সাল আমাদের জন্য ছিল অস্তিত্ব রক্ষা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম আর ভারতের জন্য ছিল সুদূরপ্রসারী লাভালাভের বিষয়। ভারত ও আমরা দুইজনের দ্বি-মুখী স্বার্থে এক হয়ে যুদ্ধ করেছি। সেই যুদ্ধে আমরাও জিতেছি ভারতও জিতেছে। একাত্তরে বাংলাদেশ ও ভারতের স্বার্থ একটি বিন্দুতে এসে মিশে তৈরি করেছিল মুক্তি ও মিত্র বাহিনী। 'শত্রুর শত্রু বন্ধু', এই সূত্রই ছিল কার্যকর। মানবিক বিবেচনা ছিল দ্বিতীয় স্তরে। আজ আমরা বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতীয় মালামাল পরিবহন করতে দিতে সন্দিহান। আর একাত্তরে ভারত ও আমাদের সম্মিলিত শত্রু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীকেও স্বাগত জানিয়েছি আমরা। ধর্ম দিয়ে তখন পরিস্থিতি বিবেচনা করা হয়নি। এমনও দেখা গেছে, ইসলামের ভেকধারী পাকিস্তানি সৈন্যরা যে-সব বাঙালি মেয়েকে ধর্ষণের পর নগ্ন করে বাঙ্কারে ফেলে গেছে, ভারতের শিখ সেনারা

তাদের মাথার পাগড়ি খুলে মেয়েদের দিয়েছেন লজ্জা নিবারণের জন্য। এমন কি শিখদেও প্রতি আওরঙ্গজেবের নিষ্ঠুরতার কথাও তারা মনে রাখেননি। ভারত তার তৎপরতা দিয়েই সে সময় আমাদের বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব অর্জন করেছিল, ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে একাত্তর সাল পর্যন্ত ভারত এ অঞ্চলে আমাদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস সৃষ্টির কোনো কাজ করেনি। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ভারত পশ্চিম পাকিস্তানের ১৫২৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকা দখল করেছিল। অরক্ষিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেও তাদের ভূমি দখল সম্ভব ছিল। আক্রমণ সম্ভব ছিল। তা না করার ঘটনাকে আমরা ভারতের বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। সেই কারণে ২৩ বছর ধরে তৎকালীন পাকিস্তানের দুই অংশ থেকে দিনরাত সরকারি প্রচার মাধ্যমে ভারত-বিরোধী প্রচারণা চালানো হলেও, জনগণ তা আমলে আনেনি। বরং ২৫ মার্চ পাকিস্তানের আক্রমণের পর মানুষ কোনো রকম পরামর্শ ছাড়াই ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। অর্থাৎ ভারত তখন বন্ধুর মতো আচরণ করেছিল বলে বাংলাদেশের মানুষও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছিল। বিপদের দিনে আশ্রয় নিয়েছিল। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অনেক পরে এসেছে, কিন্তু আক্রান্ত মানুষের আশ্রয় গ্রহণের সিদ্ধান্ত ছিল তাৎক্ষণিক। এই আস্থা রাতারাতি গড়ে ওঠেনি।

আর, স্বাধীনতার পর ভারত যখন প্রতিপক্ষের মতো আচরণ শুরু করে তখন এদেশের জনগণও বিক্ষুব্ধ হতে থাকে। সেই বিক্ষোভ-বেদনা-বঞ্চনা চরম বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছায়। বন্ধুত্বের জায়গায় এই সন্দেহ অর্জনের জন্য ভারতই বহুলাংশে দায়ী। পাকিস্তান আমলের ২৩ বছর ধরে ভারত তার বন্ধুসুলভ বাস্তব তৎপরতা দিয়ে যেমন আমাদের বিশ্বাস অর্জন করেছিল, তেমনি,গত ৪০ বছর ধরে ভারত তার বড়ভাইসুলভ তৎপরতা দিয়ে এই সন্দেহ অর্জন করেছে। শুরু থেকেই ভারত বাংলাদেশের নির্বিশেষ মানুষের বিশ্বাস-বন্ধুত্ব অর্জনের চেয়ে বেশি জোর দিয়েছে একটি দলের বিশ্বাস-বন্ধুত্ব অর্জনের দিকে। বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই ফারাক্কা বাঁধ তারা চালু করে 'পরীক্ষামূলক'-এর কথা বলে যা পরে স্থায়ী রূপ নেয়। তারা গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সীমান্তে অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে বাংলাদেশের সৈন্য পর্যন্ত হত্যা করেছে। চুক্তি করেও ছিটমহল সমস্যা দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রেখে এখনো সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করছে না। ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহীদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশের অনেক সৈন্য-বিডিআর-সাধারণ মানুষ হত্যায় সহায়তা করেছে। চোরাপণ্য দিয়ে সয়লাব করেছে বাংলাদেশের বাজার, সেই সাথে মাদক। পুশইন এর নামে অপমান করছে বাংলাদেশকে। সীমান্তে কয়েকদিন পরপরই হামলা চালিয়ে হত্যা করছে বাংলাদেশের নাগরিক। ঢাকায় বসে কিছু ভারতীয় কূটনীতিক সীমা লঙ্ঘন করে অবাঞ্ছিত বক্তব্য দিয়ে অপমান করেছেন বাংলাদেশের মর্যাদাকে, আহত করেছেন মানুষের অনুভূতিকে। ভারত এখন মেতে উঠছে টিপাইমুখসহ উজানে অনেক বাঁধ নির্মাণে। টালবাহনা করছে তিস্তার পানির হিস্যা নিয়ে। এসব ঘটছে কোটি কোটি মানুষের চোখের সামনে। এখন বাংলাদেশের বর্তমান সরকার সম্পর্কোন্নয়নে অনেক

ছাড় দিয়ে, ঝুঁকি নিয়ে ভারতের চাহিদাগুলো মিটিয়ে দেওয়ার পরও বাংলাদেশের ন্যূনতম পাওনা-চাহিদা মেটাতে ভারত টালবাহানা করছে। এমন কি ভারত এখন বাংলাদেশে তাদের 'অতিমিত্রদের' পর্যন্ত বিপন্ন ও বেইজ্জতি করে চলেছে। এগুলো কাম্য ছিল না। বড় প্রতিবেশী হিসাবে ভারতের দায়িত্বও বেশি, যার প্রতিফলন বাংলাদেশ তার জন্মের আগে দেখলেও পরে আর দেখেনি, দেখছে না।

ভারত ও বাংলাদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় থেকেও প্রচার করা হয় যে, বাংলাদেশে ভারত-বিরোধিতা ও ধর্ম রাজনীতিতে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এই তথ্যও সঠিক নয়। সঠিক হলে কথিত ভারত-বিরোধিতা কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় থাকতো শফিউল আলম প্রধানের দল– কারণ এই দলটিই সবচেয়ে উগ্র ভারত-বিরোধী। অথবা ক্ষমতায় থাকতো ধর্ম-ব্যবসায়ীরা, কারণ তারাও উগ্র ভারত-বিরোধী,অন্তত বিএনপির চেয়ে বেশি। সেক্ষেত্রে আওয়মী লীগ কোনোকালেই ক্ষমতায় আসতে পারতো না। আবার কথিত ধর্মপন্থা যদি রাজনীতির নিয়ামক হতো তাহলে ক্ষমতায় থাকতো কথিত ধর্মপন্থিরা – বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী, কারণ ধর্ম সম্পর্কে তাদের ইন্টারপ্রিটেশনই সবচেয়ে মডার্ণ। ইসলাম-ব্যবহারকারী অন্য দলগুলোও পিছিয়ে থাকতো না। সে ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কেউই ক্ষমতায় আসতে পারতো না বা আসার সম্ভাবনাও থাকতো না। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। এসব ছাড়াও বাংলাদেশের ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতিতে এক নজিরবিহীন ঘটনা আমরা দেখতে পাচ্ছি – জামায়াতে ইসলামীদের সঙ্গে কওমী-পিরালীদের জোট (প্রতীকে বলা চলে ওহাবী-ননওহাবীদের জোট) পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেখানে তাদের সম্পর্ক অহিনকুল। কিন্তু এরপর ও বাংলাদেশে ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতা দখলের আশঙ্কা নেই। জনগণের শক্তি-বিবেচনার ওপর বিএনপির দৃঢ় আস্থা থাকলে চিহ্নিত স্বাধীনতা-বিরোধীদের বাড়ি-গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা তুলে দেওয়ার প্রয়োজন যেমন হতো না, ক্ষমতার ভাগ দেওয়ার যেমন প্রয়োজন হতো না, তেমনি বিএনপিকে মৌল-অবস্থান থেকেও সরতে হতো না, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হতো না নতুন প্রজন্ম থেকেও।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মাশ্রয় ও ভারত-বিরোধিতার উষ্কানী অনেক সময় ভারত ও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও আসে, বিভিন্ন হটকারিতা থেকেও আসে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মাশ্রয় ও ভারত-বিরোধিতা– যে দুইটি ফেনোমেনাই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত– এদের বাজারদর কিছুটা ভালো থাকলেও এগুলো নিয়ামক মোটেও নয়। তারাই বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মাশ্রয় ও ভারত-বিরোধিতার অপবাদ বাংলাদেশের মানুষকে দেয় যারা মর্মবাণীর দিক থেকে এদেশের জনগণকে বুঝতে অক্ষম কিংবা সক্ষম হলেও এগুলো থেকে ফায়দা তুলতে চায়। এরাই আবার সাম্প্রদয়িক-সম্প্রীতিরও শত্রু।

ভারত ও বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণরা বাংলাদেশের মূলধারার সাধারণ মানুষের এই মূল সুরটি অনুবাদ করতে চায় না যে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ চিন্তা-চেতনা, জীবনাচার ও মূল্যবোধে একদিকে যেমন সরল-বিনয়ী, অন্যদিকে প্রচণ্ড সংগ্রামী– কারণ তাদের বেঁচে থাকতে হয় প্রতিনিয়ত বিরূপ প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে। আবার তারা নদীর মতোই উদার। তারা আধা গেরস্ত আধা সন্ন্যাসী। তারা ধর্মানুষ্ঠানে গিয়ে বক্তব্য শুনে

কাঁদে, আবার দোতারার গান শুনেও কাঁদে। তারা ঈদ ও পূজার আনন্দ ভাগাভাগি করে। তারা খুব অল্পে তুষ্ট ও বিগলিত। আবার মর্যাদায় অনাহুত আঘাত এলে ভয়ঙ্করও তারা। এটাই বাংলাদেশের মূলধারার মানুষের মূল সুর যা সবচেয়ে ভালো ভাবে বর্ণনা করে গেছেন নেহরু মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী বিশিষ্ট কবি হুমায়ূন কবির। অবশ্য কিছু দুর্বৃত্ত-কুপমণ্ডুক দুই দেশেই আছে যাদের অপকর্মই সম্পর্ক উন্নয়নের বড় বাধা।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের হতে যাওয়া সুসম্পর্কে মমতা তিস্তার পানিতে চুবিয়ে আধমরা করেছেন আগেই। এখন বলছেন, ফারাক্কা দিয়েও নাকি বাংলাদেশ বেশি পানি পেয়ে যাচ্ছে। ছিটমহল বিনিময়ের বিরুদ্ধেও আদাজল খেয়ে নেমেছেন। বাংলাদেশের মানুষ ঠিক ঠাহর করতে পারছে না, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী নাকি অন্য কেউ। মমতা বিরোধী দলে থাকার সময় বাংলাদেশের পক্ষে অনেক ভালোভালো কথা বলে মানুষের সম্মান ও ভালোবাসা কুড়িয়েছিলেন। এখন বাংলাদেশ মানুষ বুঝতে পারছে যে, বড় অপাত্রে ঢালা হয়েছিলে সেই বিশ্বাস-ভালোবাসা। মমতার ভোটারদের অসম্মান করার জন্য বলছি না, তাদের কাছে বিনীতভাবে দুঃখ প্রকাশ করেই বলছি, মমতা এমন ভাব করছেন, উজানের সব পানি যেন বা প্রকৃতির উদার প্রবাহ নয়, মমতার চোখের জল থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

সারাবিশ্বে নজিরবিহীন ঘটনা ঘটিয়ে ভারত অসংখ্য বাঁধ দিয়েছে উজানে, ভাটির বাংলাদেশের মতামত উপেক্ষা করে। পৃথিবীর আর কোনো দেশে এমন নির্মম ও স্বেচ্ছাচারিতার নজির নেই।

এ সব করছে সেই ভারত যে জানে, সিন্ধুসভ্যতা– হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো একদিন ধ্বংস হয়েছিল উজান-ভাটির মধ্যে পানি নিয়ে সংঘর্ষে। সাম্প্রতিক গবেষণায় এগুলো উঠে আসছে। উজানের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে দেবরাজ হয়েছিলেন ইন্দ্র, বৃত্ত বধকারী ইন্দ্র। ঋগ্বেদে সিন্ধুসভ্যতার ইশ্বর দেবতা বরুণ বিশ্বের অধিপতি, জলের স্রষ্টা। সিন্ধু সভ্যতার এক পর্যায়ে নির্মাণ করা অসংখ্য বাঁধ মানুষের জন্য অকল্যাণকর হয়ে দেখা দেয়। মরুভূমি হতে তাকে এলাকার পর এলাকা। বৃত্তকে বধ করে ইন্দ্র বাঁধ ভেঙে দেন। পানি এবং নদীর নিয়ন্ত্রণ নিয়েই মূলত ঋগ্বেদে ইন্দ্র-বৃত্তের যুদ্ধ। দেবতা-অপদেবতার যুদ্ধ। এমন কি ক্ষতিকর বাঁধ ভাঙায় উদ্বুদ্ধ করতে বৈদিক ধর্মের সংস্কারও করতে হয়েছে। আনতে হয়েছে সোমকে। ঋগ্বেদে শত্রু হিসেবে কোনো মানুষকে দেখানো হয়নি, দেখানো হয়েছে বাঁধকে।

রোহিনী নদীর পানি নিয়ে শাক্য ও কোলীয়দের দীর্ঘ দিনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বন্ধ করতে গৌতম বুদ্ধকে মধ্যস্থতা করতে হয়েছিল। আধুনিক ভারতে বাঁধের বিরুদ্ধে প্রথম বিরোধিতা এল নর্মদায়। আসারই কথা, কেননা, প্রকৃতি কখনো কখনো প্রতিশোধ নিতে দেরী করলেও একবোরে হাত গুটিয়ে বসে থাকে না।

শুধু বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নয়, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীকেও বারবার নাজেহাল করে চলেছেন মমতা। তিনি মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে বাংলাদেশে না এসে খাটো করেছেন প্রধানমন্ত্রীকে। লজ্জায় ঢাকা ছিল মনমোহনের ঢাকা সফর। মমতার বায়বীয় আস্ফালনই হজম করতে হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষকে, ভারতের

কেন্দ্রীয় সরকারকে। গোটা ভারত যেন আজ তেলের বাটি নিয়ে ছুটে চলেছে মমতার পেছনে-পেছনে। সেই দৃশ্য আমাদের কাছে একই সঙ্গে বেদনা ও কৌতুকের।

সে গেল ভারতের কথা। মমতার ভোটাররা এখন কি ভাবছেন তারাই ভালো জানেন। আমাদের প্রশ্ন অন্যখানে। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কোন্নয়নে যে-সব অমীমাংসিত সমস্যা রয়েছে সে-সবের সমাধানে বাংলাদেশ কার সঙ্গে কথা বলবে? কেন্দ্রের সঙ্গে নাকি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে? অবশ্যই কেন্দ্রের সঙ্গে। কিন্তু কেন্দ্রের সঙ্গে সমঝোতায় আসার পর রাজ্য সরকার যদি শর্ত না মানে তাহলে বাংলাদেশ-ভারত আলোচনার দরকার কি? লাভই বা কি? ১৯৭২ সালে বেরুবাড়ি ভারতকে বুঝিয়ে দেওয়ার বহুকাল পর বিনিময়টা পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে ভারতের পক্ষ থেকে আদালতের দোহাই দেয়া হয়। অথচ এজন্য বাংলাদেশ তার সংবিধানও সংশোধন করেছিল। বাংলাদেশ কি তাহলে একবার কেন্দ্রের সঙ্গে, আবার রাজ্যের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করবে? আলাদা সমঝোতায় আসবে? এটা কি সম্ভব? বাংলাদেশ-ভারতের কোনো সমঝোতা বা চুক্তিকে যদি আজ পশ্চিমবঙ্গ উপেক্ষা করে তাহলে কাল ত্রিপুরা-আসাম-মেঘালয়-মিজোরামও তা করতে পারে। তখন অবস্থা কি দাঁড়াবে? দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির পর বাংলাদেশকে কেন জনে-জনে আলোচনা করতে হবে? বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনার আসার আগেই রাজ্য পর্যায়ের মতামতগুলো সমন্বিত করা উচিত ভারত সরকারের। ভারতের সঙ্গে পৃথিবীর অনেক দেশেরইতো বহু চুক্তি হচ্ছে; সেসব ক্ষেত্রেতো এমন হচ্ছে না? বাংলাদেশের দোষটা কোথায়? এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তরের ওপরই নির্ভর করছে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ভবিষ্যত সম্পর্ক। এই জবাব ভারত সরকারকেই দিতে হবে। যান্ত্রিকভাবে সুসম্পর্ক চাইলে তা হবে সোনার পাথরবাটি চাওয়ার মতো। ভারত ধমক দিয়ে তা করতে চাইলে পরিস্থিতি আরো বিগড়াবে, যেমন অতীতে হয়েছে। ভারতের ভুল আচরণই তথাকথিত 'অ্যান্টিইন্ডিয়ান' রাজনীতির মূলধন হিসেবে জন্ম ও বিকাশ– যদিও এই বিকাশ বিকৃত বিকাশ। এতে দুই দেশেরই অনেক ক্ষতি হয়েছে। সামনে আরো সমূহক্ষতির আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। অনেক অদূরদর্শিতার শরীকানা বাংলাদেশ ভোগ করেছে। ভবিষ্যতেও কেন ভোগ করতে হবে। এখন ভারতের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের এই আহবান জানানোর সময় এসেছে, আপনাদের নাকউঁচুদের সামলান, যথাযথ সমমর্যাদার আচরণ করুন।

আওয়ামী লীগ সরকার কিছু না পেয়েই ভারতকে যেভাবে ওয়াক-ওভার দিচ্ছে তার সঙ্গে একমত নই. অনেকেই নয়, সরকারের জোটের মিত্রদের অনেকেও নয়। কিন্তু বিনাস্বার্থে ভারতের হাতে তুরুপের তাস তুলে দেওয়ার পরও এই সরকার থই পাচ্ছে না। ডুবতে বসেছে 'বন্ধু'দেরই জন্যে। এসব ঘটনা থেকে বাংলাদেশ-ভারতের প্রকৃত সুসম্পর্ক প্রত্যাশীদের অনেক কিছুই শেখার আছে।

বাংলাদেশে আরেকটি কৌতূহল-উদ্দীপক বিষয় লক্ষণীয় যে, ক্ষমতায় যখন কথিত ভারতপন্থিরা থাকে, সাধারণ মানুষ তখন ভারতের প্রতি থাকে সন্দিহান, আর যখন কথিত ভারত-বিরোধীরা ক্ষমতায় থাকে, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা দেয় ভারতের প্রতি সহানুভূতি। এরও নিশ্চয়ই কারণ আছে। সুসম্পর্ক স্থায়ী ও সর্বব্যাপী করতে চাইলে এসবের কারণও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

ভারতের ক্ষুদ্র একটি শ্রেণী মধ্যযুগে অখণ্ড ভারতে প্রায় সাত শ' বছরের মুসলমান শাসনের ও তার বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য এখনকার মুসলমানদের প্রতিও ক্ষিপ্ত। বাবরী মসজিদ বা এজাতীয় বিতর্ক সেগুলোতে আরো ইন্ধন জোগায়। অথচ, ভারতে শুধু তুর্কী-মোঘল-পাঠানরাই বাইরে থেকে আসেনি, বাইরে থেকে এসেছে আবীর, কুষাণ, গ্রীক, ইংরেজ প্রভৃতি। আর্যরাও বাইরে থেকেই এসেছে, বৈদিক ধর্ম তাদেরই দান। অন্য আর কারো প্রতি যদি ক্ষোভ না থাকে, মুসলমানদের প্রতি থাকা উচিত নয়। এদিকটাও নজরে রাখা প্রয়োজন।

শুভ সুন্দরের আশা ছেড়ে দেওয়া যাবে না। দুই দেশেই রয়েছে উদার-বিবেকবান-সৃজনশীল-সম্ভাবনাময় মানুষ। তাদের তাগিদ ভোটের উর্ধে উঠে দুই দেশের প্রত্যাশিত সম্পর্কের ভিত্তিভূমি তৈরি করতে সক্ষম। এতে সাফল্য লাভের পূর্ব পর্যন্ত দুই দেশের প্রতিক্রিয়াশীল নেতিবাচক শক্তি ফায়দা লুটতেই থাকবে।

পুনশ্চ : লেখার শুরুর দিকে বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকির যে কথা বললাম, আমার মনে হয় কথাটি ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। কথাটি এ জন্য বললাম যে, ১. পৃথিবীতে তখন সোভিয়েত-মার্কিন ঠাণ্ডা যুদ্ধ তুঙ্গ অবস্থায়। প্রবল প্রতাপশালী আমেরিকার ইগো, আধিপত্য, অস্ত্রব্যবসা নানাবিধ কারণে যুদ্ধ ছড়িয়ে দেয়ার আশঙ্কা ছিল; ২. আমেরিকা এশিয়ায় ভিয়েতনামের বাইরেও সোভিয়েত ইউনিয়নকে আরেকটি ফ্রন্টে টেনে আনায় সচেষ্ট ছিল বলে পরবর্তীকালে জানা গেছে। ঘটনাটি বাংলাদেশকে ঘিরে ঘটলে আমেরিকার আরেকটি বড় লাভ হতো– রুশ-চীন মিলে ভিয়েতনামকে যে সাহায্য করছিল তাতে বাংলাদেশের ঘটনা ঘিরে চীন-মার্কিন এককাতারে এলে ভিয়েতনামে চীনের সাহায্য বন্ধ বা সীমিত হয়ে পড়তো। লাভ হতো আমেরিকার। আমেরিকা তাই খুব চেষ্টা করে চীনকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নামাতে। (এটা ঘটলে ভিয়েতনাম থেকে আমেরিকাকে এমন লজ্জাকর ভাবে পিছু হটতে হতো না। কিছুটা মুখরক্ষার ব্যবস্থা হয়ে যেত)। তবে চীন সে ফাঁদে পা দেয়নি। ভারতের সাথে বৈরিতা থাকায় কৌশলগত কারণে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন দিলেও একটি ভূ-খণ্ডের সব মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লেগে থাকাকে তারা হয়তো সমীচীন মনে করেনি। কিংবা চীন কোনো যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিতে চায়নি,কোরীয় যুদ্ধের স্মৃতি তখনো অনেক তাজা ছিল, যে যুদ্ধে মাওসেতুঙ-এর এক ছেলেও নিহত হন। অথবা এমনও হতে পারে, আমেরিকাকে গাছে তুলে চীন মই সরিয়ে নিয়েছে আর পাকিস্তানকে পুষিয়ে দিতেই হয়তো জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদের বিরুদ্ধে ভেটো দিয়েছে। তাছাড়া নিজেদেরকে বা নিজেদের স্বার্থকে বিপন্ন করে অন্যকে সাহায্য করতে ঝুঁকি নেওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই। ৩. লঘু কারণেও যুক্তরাষ্ট্রকে নানা সময় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়, যেমন, সাম্প্রতিক সময়ে ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর তিন বছর পর আমেরিকা সে যুদ্ধে অংশ নেয়, তাদের একটি জাহাজ জার্মান টর্পেডোর আঘাতে ধ্বংসের পর। একাত্তরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর আঘাতে ঢাকায় একটি মার্কিন ও জাতিসংঘের একটি বিমান ধ্বংস হয়, পশ্চিম পাকিস্তানে ধ্বংস হয় ইউএস মিলিটারির

লিয়াজোঁ চিফ শুক্ ইয়েগার্জসহ মার্কিন বিমান বাহিনীর লাইট-ট্রুইটার এবং কানাডিয়ান এয়ারফোর্সের ক্যারিবয়স। সৌদি, লিবীয় ও জর্ডানের কয়েকটি বিমানও ধ্বংস হয়। অর্থাৎ, যুদ্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার অনেক অজুহাত ছিল আমেরিকার। তবে সব চেয়ে বড় আশংকা ছিল বিদ্যমান রাজনৈতিক অবস্থা। বাংলাদেশ-ভারততো বটেই, গুলিটা চলে গেছে গোটাবিশ্বেরই কানের পাশ দিয়ে।

নিউ ইয়র্ক, এপ্রিল ২০১২

ইতিহাসের সঙ্গে রসিকতার খেসারত

লেখাটি ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব আয়োজিত সেমিনারে 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট : প্রবাসীদের ভাবনা' শিরোনামে পঠিত কী-নোটের সামান্য পরিবর্তিত রূপ।

আমরা যারা নানা কারণ ও প্রয়োজনে প্রবাসে জীবন-যাপন করছি, তারা বাংলাদেশ থেকে এসেছি বটে, কিন্তু বাংলাদেশ ছেড়ে আসিনি। গোবাল ভিলেজের কথা যতই বলা হোক না কেন, পদে পদে আমরা অনুভব করি নাড়ির টান, শেকড়ের টান। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর, সমৃদ্ধ-উন্নত দেশে বাস করলেও আমাদের বুকে দোলে কাশবন, পদ্মা-মেঘনা-যমুনার ঢেউ; আতিপাতি করে খুঁজি বাংলার ঘুঘু ডাকা বিষণ্ন দুপুর। খুঁজি স্বজন-পরিজনকে। পরবর্তী প্রজন্ম-পরম্পরায় কী হবে জানি না, আজকে আমাদের অনুভব এমনই। তাই বাংলাদেশ ভালো আছে জানলে আমরা ভালো থাকি, সংকটে আছে জানলে উদ্বিগ্ন হই।

বিভিন্ন সূত্রে যারা অতি-সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন, আমার ধারণা তাঁরা আমাদের জন্য কোনো সুসংবাদ বয়ে আনতে পারেননি। বাংলাদেশ বা তার মতো দেশগুলো সব সময়ই নানা সংকটে-সমস্যায় থাকে বটে। কিন্তু গড়পড়তা সংকট-সমস্যার বাইরেও আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশ আজ ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি, সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির মুখোমুখি। এটা নিয়েই প্রবাসীরা বেশি চিন্তিত, উদ্বিগ্ন।

আমাদের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো যদি অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিত, নিদেনপক্ষে শিক্ষা নিত ১৯৮৬ ও ৮৮'র নিরর্থক ও প্রহসনের নির্বাচন, ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির একতরফা-হাস্যকর নির্বাচন এবং ২০০৭ সালের হাস্যকর-একতরফা-নির্বাচনী প্রচেষ্টার করুণ পরিণতি থেকে, তাহলেও এই সংকট তৈরি হতো না। তারা ভুলে গেছেন যে, এ ধরনের নির্বাচন সব সময়ই নির্বাচনকে পরিণত করে প্রহসনে, প্রার্থীদের পরিণত করে ফেলে ডাস্টবিনে এবং ভোটকে পরিণত করে আবর্জনায়। ফরাসি বিপ্লবের ৩৬ বছর পর বুরবন রাজবংশের কেউ কেউ আবার যখন রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে, তখন ফরাসি সরকারের একজন মুখপাত্র মন্তব্য করেছিলেন 'দে লার্ন নাথিং এন্ড ফরগট নার্থিং।' তারা ইতিহাসকে উপলব্ধি করেও শিক্ষা নেননি, নাকি ইতিহাসের শিক্ষা উপলব্ধির যোগ্যতাই তাদের ছিল না, এই প্রশ্নের উত্তরটা বিভ্রমের মধ্যেই ছিল। আজ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত সেই বিভ্রমের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমরা আরো উদ্বিগ্ন এ কারণে যে, নিকট-অতীতেও প্রত্যক্ষ করেছি মানুষের লাশকে ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহারের হৃদয়হীন-প্রয়াস। তাই নিকট-ভবিষ্যতেও জান-মালের সম্ভাব্য অপচয়ের আশঙ্কায় দেশবাসীর মতো প্রবাসীরা ভীত, চিন্তিত। অথচ এমন হবার কথা ছিল না।

কিন্তু কেন আমাদের এই অধোগতি, এ প্রশ্ন আজকের সব প্রজন্মেরই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে জনসংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হলেও আমাদের কৃষকরা উৎপাদন বাড়িয়েছেন তিনগুণ। বাংলাদেশের মানুষের জন্য আগের চেয়ে কমপক্ষে পাঁচগুণ বেশি বস্ত্র উৎপাদন করেই ক্ষান্ত নন আমাদের শ্রমিকরা, তারা গোটা বিশ্বের জন্য উৎপাদন করছেন বস্ত্র। রপ্তানি হচ্ছে ঔষুধসহ অনেক পণ্য। শিক্ষার হার ও মান যথেষ্ট বেড়েছে। সবার মাথার ওপর কমবেশি আচ্ছাদন রয়েছে। আমাদের সৎ-পরিশ্রমী ব্যবসায়ীরা আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে এখন আক্ষরিক অনাহারী নেই, অনেকগুলো সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে ভারত থেকেও। বাংলাদেশের প্রায় এককোটি মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে সারাবিশ্বে, তাদের রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রাণ-প্রবাহ। দেশে এখন অঢেল সম্পদ। বাংলাদেশ অর্জন করেছে নোবেল প্রাইজও– এসবই সত্য। কিন্তু একদিকের সত্য। অন্যদিকের সত্য হচ্ছে, বাংলাদেশের এই অর্জনের মূল নায়ক দেশের জনগণ ও তাদের নিজস্ব উদ্যোগ; শাসকরা নয় বরং শাসনকর্তারা বহু ক্ষেত্রে এইসব অর্জনের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে। অন্য দিকের রূঢ় সত্য হচ্ছে, দেশের সম্পদ একশ্রেণীর মানুষ লুণ্ঠন করে আসছে বর্গীর মতো, দুর্নীতির সকল সীমা অনেক আগেই ছাড়িয়ে গেছে। নৈরাজ্য, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা-পরায়ণতা, আইন–শৃঙ্খলার অবনতি চরমে। মহৎ পেশাগুলোও কলুষিত। সর্বোপরি রাজনীতি এখন মেধা-মনীষা ও অঙ্গীকার শূন্যপ্রায়। সৎ ও নিবেদিতরা রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, মন্দ লোকেরা দখল করছে বড় স্থান, যেভাবে নিকৃষ্ট মুদ্রা উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বিতাড়ন করে। ভুল লোক বসে আছে শুদ্ধ জায়গায়। এই দখল অপ-দখল এখনো অব্যাহত। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন অসৎ, ধূর্ত, সুবিধাবাদী, ডিগবাজ, পেশীবাজ, স্তাবক ও সন্ত্রাসীদের প্রাধান্য। রাজনীতিতে এদের প্রাধান্যের কারণ, বাংলাদেশের রাজনীতি এখন মানব জীবনের তিনটি আরাধ্যই সহজে সরবরাহ করছে; এক. ক্ষমতা, দুই. অর্থ ও তিন. প্রচার। মন্দ ও অযোগ্যদের কাছে এই রাজনীতি তাই বেশি আকর্ষণীয়। তারা চলে এসেছে অগ্রভাগে। আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্বও তাদের ওপরই বেশি নির্ভরশীল। কারণ বিন্যাসটা সেই ভাবেই গড়ে উঠেছে। তাই সারাদেশে, কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত, লক্ষ লক্ষ নিবেদিত, আদর্শবান ও সৎ নেতা-কর্মীদের পেছনে ঠেলে কয়েক হাজার পরজীবী চাটার দল, খাদক-গোষ্ঠী, স্তাবক ও মাসলম্যান এক অশুভ রামকুণ্ডলী তৈরির মাধ্যমে জিম্মি ফেলেছে গতিধারাকে। যার অভিঘাত পড়ছে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বত্র। আগে রাজনৈতিক অঙ্গনে নেতৃত্ব আসতো বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, সংস্কৃতির অঙ্গন, ক্রীড়াঙ্গন প্রভৃতি থেকে। এখন আসে সামরিক-বেসামরিক আমলা ও বণিক পল্লী থেকে, এমন কি স্মাগলার এবং ব্যাংক ও মুদ্রাবাজার লুণ্ঠনকারী বোচ্‌কামারাদের চক্র থেকে।

রাজনীতি যেহেতু নীতি-নির্ধারণীতে সবচেয়ে বড় প্রভাব রাখে সেহেতু তার শুভাশুভের ছায়া পড়ে অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে। তাই লুণ্ঠন-দুর্নীতির জন্য শুধুমাত্র রাজনীতিকদের দোষ দিয়েও লাভ নেই। এই দোষ অন্য পেশা-বৃত্তিধারীদেরও কম নয়। তবে দায় রাজনীতিকদেরই বেশি।

বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রতিটি মানুষই দুর্নীতিগ্রস্ত নয়, সবার দুর্নীতির সুযোগও নেই। লুটেরা-দুর্নীতিবাজের সংখ্যাও বেশি নয়, তবে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি। অসৎ-অসৎতা সবখানেই বিদ্যমান। তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের অসৎ অংশ হচ্ছে পার্টটাইম দস্যু আর আমলা-বণিকদের অসৎ অংশ হচ্ছে ফুলটাইম তস্কর। সাংবাদিকদের অসৎ অংশ ব্যাক-মেইলিং ও হলুদ সাংবাদিকতা করে। শিক্ষকদের অসৎ অংশ প্রশ্নপত্র ফাঁস করে। অসৎদের এসবই করার কথা। কিন্তু তারাই বাংলাদেশ নয়। তবে তাদের মোকাবেলায় বাংলাদেশের সরকারগুলো সোচ্চার-আন্তরিক কী না, এই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীতে একেবারে দুর্নীতিমুক্ত দেশ পাওয়া যাবে না। তবে দেখতে হয় দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে আছে কী না। বাংলাদেশে এর কোনোটিই নেই বলে দেশ দুর্নীতির সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং দিন দিন আরো অধোগামী হচ্ছে।

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা দেখে আমরা যতই হা-পিত্যেশ করি না কেন, একই সঙ্গে আমাদের এটাও বুঝতে হবে যে, এমনই তো হওয়ার কথা! আমরা কেউ দায় অস্বীকার করতে পারি না। ব্যর্থতা আড়াল করতে পারি না।

স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ বাহাত্তরের অনবদ্য সংবিধান নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল সুস্থভাবেই। কিন্তু সংবিধানের মলাট শুকোবার আগেই শুরু হয় বিকৃতি। দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম প্রভৃতি সংশোধনী বাংলাদেশের সৃষ্টি-পর্বের আদর্শ-অঙ্গীকারের বিচ্যুতি। সামরিক শাসনও বড় ধরনের বিকৃতি। আবার নির্বাচিত স্বৈর-শাসনও বিকৃতিরই নামান্তর। এতগুলো এবং এতো ধরনের বিকৃতি মোকাবেলা করতে হয়েছে, হচ্ছে বাংলাদেশ ও তার জনগণকে, যার সবগুলোই মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন-চেতনার প্রতিপক্ষ। সে কারণে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠতে গিয়ে বার বার খাবি খাচ্ছে।

আমাদের সবচেয়ে বড় সর্বনাশ করেছে অকাম্য রক্তপাত। আমাদের বীরদের আমরা খুঁজে খুঁজে হত্যা করেছি। এমনকি সপরিবারেও। হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা, শহীদ জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ, জেনারেল মঞ্জুর, ক্যাপ্টেন হায়দার, সিরাজ শিকদারসহ অসংখ্য বীর-বিপ্লবী। সামরিক আদালতের বিচারের নামে হলেও কর্ণেল তাহেরকে হত্যাকাণ্ডই বরণ করতে হয়েছিল। দেশপ্রেমিকদের আমরা আখ্যা দিয়েছি তাঁবেদার, বিপ্লবীদের অপবাদ দিয়েছি সন্ত্রাসীর। এই তো আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নমুনা।

সব রক্তই কথা বলে এবং কথা বলে চলেছে। একটি হত্যাকাণ্ড আরেকটি হত্যাকাণ্ডকে ডেকে আনে কিংবা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডটি আগের কোনো হত্যাকাণ্ডেরই প্রতিক্রিয়া। তাই শুরু আমাদের সুস্থভাবে হলেও বিকাশ ঘটেছে বিকৃতভাবে। আমরা তো সেই বিকৃতিরই শিকার। বিকৃত বিকাশের কাছে সুস্থ-স্বাভাবিক কিছু আশা করা স্বর্ণের পাথর-বাটি চাওয়া নয় কী?।

আমরা আমাদের বীর-নায়কদের হত্যা করে তাদের কারো কারো অপ্রস্তুত (অনীহও হতে পারে) পরিজনকে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছি, যারা রাষ্ট্র-নায়কোচিত গুণাবলী প্রদর্শন করতে না পারলেও বলার কিছু থাকে না। এমন কি ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের পরও সে চেষ্টা তারা না করলে কিংবা চেষ্টার প্রয়োজন মনে না করলেই বা বলার কী থাকতে পারে! অবশ্য স্তাবকরা তো তাদের ওপর মহত্ব ও গুণাবলী আরোপ করেই চলেছে।

আমাদের বীরদের জায়া-কন্যারা কখনো রাষ্ট্র ক্ষমতার চিন্তাও করেননি। কী সরকারে, কী রাজনৈতিক দলে, ক্ষমতার যে গুরুভার তাদের ওপর চাপানো হয়েছে, সে ভার তারা ভালোভাবে বহন করতে না পারলে কতটুক দোষ তাদের দেওয়া যায়, কতটুকু সমালোচনা তাদের করা যায়! আমরা ইতিহাসের সঙ্গে বার বার রসিকতা করেছি, কিন্তু আবার ইতিহাস-নির্দিষ্ট ও অবধারিত বিকৃতি-ব্যর্থতার জন্য প্রতিনিয়ত দোষারোপ করছি তাদেরকে। আসলে কী তাদের তেমন কিছু করার ছিল বা আছে! দোষ কি তাদের খুব বেশি? তারাতো সে ভাবেই চালাবেন, যে ভাবে তারা বোঝেন।

আমরা দুই দলের শাসনগত ব্যর্থতার সমালোচনায় প্রতিনিয়ত মুখর। কিন্তু সমস্যার জন্য দল দুটি নয়, দায়ী দল যারা চালান তাঁরা। জনগণের ওপর এই নেতৃত্বের আস্থা নেই বলে ক্ষমতার জন্য একজন জোট বাধেন রাজাকার-আলবদরদের সঙ্গে অন্যজন বাধেন স্বৈরাচারের সঙ্গে। এদের নিয়ে আবার কাড়াকাড়িও হয়। দেশের মানুষ অসহায়-নির্বাক হয়ে এসব দেখতে বাধ্য হয়। কার দ্বারা দেশজাতি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, ক্ষমতার জন্য তাদের অ্যাট্যিচুডের বহিঃপ্রকাশ।। একজনের মূলধন ভারতের জুজু অন্যজনের পাকিস্তানের। দোহাই চলে ধর্মেরও। দুইপক্ষ মিলে জাতীয়তাবাদ, ধর্ম ও মুক্তিযুদ্ধকে রাজনৈতিক পণ্যে পরিণত করে সময়ে-অসময়ে ব্যবহার করছে। দুই পক্ষ মিলেই দেশের সব মানুষকে ভারতপন্থি ও ভারত বিরোধী- এই দুই ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। অথচ সবারই বাংলাদেশপন্থী হওয়ার কথা। দ্বিধা-বিভক্ত জাতির অগ্রসর হওয়া দুষ্কর। এমন অবস্থা তৈরি করে দেশকে তারা পেন্ডুলামে পরিণত করেছেন, পরিণত করেছেন পঞ্চ-বার্ষিক মিউজিক্যাল চেয়ার-ক্রীড়ায়। স্থির হওয়ার সুযোগও পাচ্ছে না বাংলাদেশ। এসবতো বিকৃতিরই জের। গড়ে উঠবে কী ভাবে।

কয়েক বছর আগ পর্যন্ত একটি প্রধান রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রায় একযুগ ঘনিষ্ঠভাবে সংশিষ্ট থাকার সুবাদে এবং বাকিগুলোকে নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণের আলোকে আমার ধারণা জন্মেছে যে, দুই দল, দুই জোট, বা দুই পক্ষেরই কাছে আদর্শ গৌণ, মুখ্য হচ্ছে ক্ষমতা। দুই পক্ষই নিজেদেরকে ক্ষমতার আসল মালিক ভাবেন। তারা মানতে নারাজ যে, ক্ষমতায় যেতে না পারলেও পার্লামেন্টে নিয়মিত যেতে হয়। বিরোধী দলে থেকেও জনগণের সেবা করা যায়। কারণ বিরোধী দলও সরকারেরই অংশ। এমন কি সব এমপিরই বেতন সমান, যদিও, শুধুমাত্র রেভিনিউ স্ট্যাম্পের ওপর সই করতে যাওয়াটাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। অথচ তা-ই হয়। ক্ষমতায় যেতে না পারলে তাদের কাছে পার্লামেন্ট আর ভালো লাগে না। তাদের অস্বস্তি-ইগো পার্লামেন্টের চেয়েও বড়। তাই তো বারে বারে অসাংবিধানিক শক্তি মাথা তুলতে উৎসাহিত হয়।

এসব তারা জেনেও মানেন না যে, জনগণ যখন না চান, তখন ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে আবার জনগণের আস্থা অর্জনে কাজ করতে হয়। এসব না মেনে তারা বরং নিজেদেরকে মন্ত্রিসভার আজীবন সদস্য গণ্য করেন। এতেই বাধে বিপত্তি, একই সঙ্গে সরকারে ও দলে। একই সূত্রে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা হয়ে পড়েন কর্মচারি এবং জনগণ হয়ে পড়েন প্রজা। কে খাজনা তুলবেন, এই নিয়েই দ্বন্দ্ব-বিতর্ক-রক্তপাত ঘটতে থাকে। জনতা ও তার স্বপ্নকে দুই পক্ষই কনভার্ট করে ক্ষমতা ও সম্পদে। মানুষকে মানুষ নয়, দেখা হয় শিকার হিসেবে, শুধুমাত্র ভোটার হিসেবে। দলে-সরকারে কোথায় গণতন্ত্র, কোথায় কী! আবার এসবকেই গণতন্ত্র বলে চালিয়ে দেওয়ার জন্য বাঘা-বাঘা বুদ্ধিমানেরা সদা দণ্ডায়মান। বাংলাদেশের বড় দুর্ভাগ্য এখানেও। দলমন্য বুদ্ধিজীবীরা মানুষ হিসেবে আধা-মানুষ, দেখেনও তারা এক চোখে।

আবার ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষার সংগ্রামে নিয়োজিতরা তাদের প্রস্থান আসন্ন দেখে রাজতান্ত্রিক উত্তরাধিকারও গড়ার চেষ্টা করেন। তাদের এবং আমাদের সবারই পূর্ণ উপলব্ধিতে আসতে হবে যে, ইতিহসের সঙ্গে এর মধ্যেই অনেক বেশি রসিকতা করা হয়ে গেছে, আর নয়। অপরাজনীতির ভারে দেশের মানুষের মেরুদণ্ড এমনিতেই ন্যুব্জ, তাদের ঘাড়ে আরো ভার পাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। ভারে-ভারে ন্যুব্জ বাংলাদেশের মানুষ এখন একবার ঝাঁপ দেয় জলন্ত উনুনে, আরেকবার ফুটন্ত কড়াইয়ে। অনেকে ভাবেন, যেন তাদের নিস্তার নেই। বিকল্প নই। এটা তারাই বেশি ভাবেন, মানুষের সৃজনশীলতা, উদ্যম ও সম্ভাবনার ওপর যাদের বিশ্বাস নেই। এই ভাবনা ফেরুপাল-জাত ভাবনা বই আর কিছু নয়। এরা ইতিহাস রচনা করে না। অনুসরণ করে। ইতিহাস রচনা করেন অন্যরকম মানুষেরা। সে-সব মানুষ জনতার স্মৃতির পর্দায় এখনো ভাস্কর।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের অযোগ্যতা-ব্যর্থতা বা আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে দেশে তৈরি হয়েছে লুটেরাগোষ্ঠী। অঢেল তাদের সম্পদ। এই সম্পদ দেশে যেমন, বিদেশেও তেমন। বাংলাদেশকে দোহন ছাড়া তারা আর কিছুই করে না।

এতো কিছুর পরও দুই দল ও দুই নেত্রী মুখোমুখি বসার, আলোচনা করার, সংসদকে প্রাণবন্ত ও কার্যকরী করার রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারলে এবং দেশের মৌলিক স্বার্থে একমত হতে পারলে এখনো মন্দের ভালো হিসেবে আরো শুভ কিছু হতে পারে। জনগণ আস্বস্ত হতে পারে। এড়ানো যেতে পারে আসন্ন সংঘাত-রক্তপাত। কিন্তু তারও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আলোচনায় তারা মোটেও রাজি বা প্রস্তুত নন। গণতন্ত্রে আলোচনা-সমঝোতা প্রধান নিয়ামক। এমন কি যুদ্ধের পরও মানুষকে আলোচনায়ই বসতে হয়। কিন্তু এটি কি যুদ্ধংদেহীরা বুঝবেন? এটি তাদের বোঝানোই এখন বড় কাজ।

বাংলাদেশে বসবাসরত জনগণ ও প্রবাসীরা অল্পে তুষ্ট। তারা সরকারের কাছে তেমন কিছুই চান না। তবে এই গ্যারান্টি চান, তাদের শ্রমে-ঘামে অর্জিত সম্পদ ও সম্মান যেন কেউ কেড়ে না নেয়। তাদের জীবন-জীবিকা যেন নিরাপদ থাকে। আমাদের নেতা-শাসনকর্তাদের অন্তত এইটুকু পূরণের যোগ্যতা থাকা উচিত।

বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনার দেশ। পাকে-দুর্বিপাকে সম্ভাবনার স্ফূরণ বিলম্বিত হলেও, তার সরব-উত্থান অবধারিত। বাংলাদেশকে তার নবদিনের, নয়া যুগের নতুন বীরেরা নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসুক এটাই সবার আকাঙ্ক্ষা। আজ দরকার ক্ষমতার পঞ্চ-বর্ষীয় দিনমজুর বা ভিক্ষুক নয়, দরকার স্বপ্নের নতুন ফেরিওয়ালা।

বিজয়ের আলোয় আলোয়

একাত্তরের ২৫ মার্চ পর্যন্ত ঢাকার শাহবাগ ও পরিবাগের মাঝামাঝি যে মহল্লায় বাস করতাম, সেখানে আমরা, বাঙালি মুসলমানরা ছিলাম দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। প্রথম শ্রেণীর নাগরিক ছিল মহল্লার পাঞ্জাবি ও উর্দুভাষী মোহাজেররা। মহল্লার হিন্দুরা ছিল তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক। আমাদের প্রতি অবাঙালিদের অবজ্ঞা, বিদ্রুপ ও অত্যাচার ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা দ্রুত অর্জনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে ছিল সমধিক। দেশ আমাদের, অথচ বাস করছি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো– এ যন্ত্রণা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না।

১৯৬৬ সালে আমি ঢাকায় পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হই হাতিরপুলের র‍্যাংকিন স্ট্রিটের ধানমণ্ডি প্রাইমারি স্কুলে, পরে সিক্সে ভর্তি হই ধানমণ্ডি হাইস্কুলে। হেমায়েতউল্লাহ আওরঙ্গ আমার ক্লাসমেট।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর আমাদের ভূখণ্ডের মানুষ ক্রমশ তিক্ত হতে শুরু করে পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রতি। যুদ্ধের পর অরক্ষিত পূর্ব বাংলা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় পশ্চিম পাকিস্তানিদের আসল স্বরূপ। তাদের শোষণ-বঞ্চনার স্বরূপ প্রকাশিত হতে থাকে। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপসহ প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো সে স্বরূপ তুলে ধরতে থাকে।

১৯৬৬ সালে ছয় দফা দিয়ে আওয়ামী লীগ অন্যদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। মন জয় করে বাঙালিদের। দুই ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলো স্বাধিকার ও স্বাধীনতার প্রশ্নে ছিল ঐক্যবদ্ধ, যদিও মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বহুধাবিভক্ত কমিউনিস্টদের ক্ষুদ্র একটি অংশ বাঙালি জনতার সঙ্গে ঐকমত্য পোষণে ব্যর্থ হয়। তবে ওরা ছিল বিচ্ছিন্ন।

১৯৬৯ সালে নবম শ্রেণীতে ওঠার পর শুরু হয় গণঅভ্যুত্থান। এর আগে যে দলই পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে মিছিল-মিটিং করতো, সুযোগ পেলেই ছুটে যেতাম। ঊনসত্তরে গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' পুস্তক বিরোধী আন্দোলন। এই গ্রন্থটি ছিল আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক বিকৃত পরিবেশনা। সক্রিয়ভাবে আমার কোনো আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সুযোগ আসে এর মাধ্যমে। তখন ছাত্রলীগ শাখা হাইস্কুল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমি ধানমণ্ডি হাইস্কুল শাখার ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি হয়ে গেলাম। আমাদের অভিষেকে এসেছিলেন শেখ শহীদ। তখন বাসে, সিনেমায় ছাত্রদের হাফ টিকিটের আন্দোলনও ছিল জোরদার। পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি পুস্তকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আমাদের স্কুল ও পাশের

মেহেরুন্নেসা গার্লস স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল নিয়ে চলে যেতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের বটতলায়। সেখানে জড়ো হতো অন্যান্য স্কুলের শিক্ষার্থীরা। ডাকসু নেতৃবৃন্দসহ ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করতেন। বিশেষ করে তখন নূরে আলম সিদ্দিকী ও আসম রবের বক্তৃতা খুব উদ্দীপ্ত করতো আমাদের। প্রায়ই আমরা মিছিল নিয়ে যেতাম ডিপিআই ভবন ঘেরাও করতে।

গণঅভ্যুত্থানের পর দেশ হয়ে পড়লো মিটিং মিছিলের দেশ। এসবে অংশগ্রহণে আমার বাড়াবাড়ি দেখে পরিবারের সবাই উদ্বিগ্ন থাকতেন।

আমাদের স্টেশনারি দোকানটি ছিল হোটেল গ্রিন-এর সামনে। তৎকালের অন্যতম অভিজাত হোটেল এটি। মালিক উর্দুভাষী। তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় সরকারের পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিলেন। তাই মিছিল দেখলেই গেট বন্ধ করে দেওয়া হতো ভয়ে। আমাদের দোকানের সামনে ছিল নবাব হাসান আসকারীর বাড়ি। মওলানা ভাসানীর জনসভা শেষে একদল মিছিলকারী এসে এই বাড়িতে যখন আগুন দেন, আমি তখন দোকানে। বাড়িটি পুড়িয়ে তারা আবার চলে যান পাশে খাজা শাহাবুদ্দিনের বাড়ি পোড়াতে। সন্ধ্যার পর কার্ফ্যু হলো। মহল্লার পাঞ্জাবি ও বিহারিরা আমাদের সঙ্গে এই মর্মে সমঝোতায় এল যে, কার্ফ্যুর সময় তারা আমাদের নিরাপত্তা দেখবে আর মিছিলের ক্ষেত্রে আমরা তাদের নিরাপত্তা দেখব। কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যাতে না হয়।

এলাকায় আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন কাশেম ভাই। আমার বড় ভাই মহিউদ্দিন আহমেদ তখন আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাদের একজন। সত্তরের নির্বাচনে তিনি ছিলেন নৌকা মার্কার এজেন্ট। তিনি তখন সাকুরা হোটেলের ম্যানেজার। অবশ্য ২৫ মার্চের কিছুদিনে আগে তাকে বদলী করা হয় কমলাপুর রেলওয়ে রিফ্রেসমেন্ট রুমে। এগুলো একই মালিকের ছিল। এর পরও থাকতেন অবশ্য আমাদের মহল্লাতেই।

মনে পড়ে, ১৯৭০ সালে আমি যখন ভোটারও হইনি, নৌকায় ভোট দিয়েছিলাম তিনটি। সারা দেশটাই তখন নৌকাময়। আমার মতো অতি উৎসাহীদের কর্মকাণ্ড ছাড়াই নৌকার বিজয় একই রকম হতো সন্দেহ নেই। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

ইয়াহিয়া খান যখন ৩ মার্চ জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন, বাঙালিরাও হয়ে উঠলেন দুর্দমনীয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে জাতি তখন ঐক্যবদ্ধ। মওলানা ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফ্ফর, মনিসিং প্রমুখ স্বাধীনতার মৌলিক প্রশ্নে একমত। ব্যক্তি নেতৃত্বের একগুঁয়েমিতে তারা জাতিকে বিভক্ত করেননি। ঝুঁকি নেননি। ওয়াক ওভার দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকে, দিয়েছেন সহায়তা-পরামর্শ। এ-এক অনন্য মহানুভবতা।

মনে পড়ে, ৩ মার্চের পর এক রাতে কার্ফ্যু ভাঙার জন্য কাশেম ভাইয়ের ছোট ভাইসহ আমরা কয়েকজন মিছিল করে মহল্লা থেকে স্লোগান দিতে দিতে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের দিকে যাচ্ছিলাম। সাকুরার কাছে যাওয়ার পরপরই ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থান নেয়া পাক সৈন্যরা ফাঁকা গুলি শুরু করে। তখনো আমাদের নির্বিচারে হত্যার লাইসেন্স তারা পায়নি বলে বেঁচে গেলাম সে-যাত্রা। দৌড়ে চলে আসি বাসায়। এ ঘটনার পর আমার মা, ভাবী ও ছোট ভাই ইউসুফকেসহ আমাকে জোর করে গ্রামের বাড়ি আড়াই হাজারের ইজারকান্দিতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, মার্চের মাঝামাঝি। ঢাকা রয়ে গেলেন বড় ভাই মহিউদ্দিন আহমেদ ও বাবা মমতাজ উদ্দিন

আহমেদ। গ্রামের বাড়ি গিয়ে মন টিকছিল না। মনে হচ্ছিল এতো বড় আন্দোলন ও আয়োজন থেকে দূরে থাকবো? আমি কী এতোই ভীরু? এর পর একেবারে মালির ঘাড়ে গিয়ে পড়লাম। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় উপস্থিত হলাম ঢাকার বাসায়। সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লো আমাকে দেখে। কিছু করার নেই। অনেক পথ হাঁটার কারণে ক্লান্ত ছিলাম বলে ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ পরে ঘুম থেকে উঠে জানলাম, খোলা জিপে শেখ কামাল ও আওরঙ্গ আমাদের মহল্লায় এসে কাশেম ভাইকে কিছু নির্দেশ দিয়ে তারা দ্রুত চলে গেছেন। আমাদের গলিতে ব্যারিকেড দেওয়া শুরু করলাম। আমাদের দোকানের ত্রিশগজ মাত্র দূরে দি পিপল ও গণবাংলা পত্রিকার অফিস। টিক্কাখান বেজায় খাপ্পা ছিল পত্রিকা দু'টির ওপর, বিশেষ করে টিক্কার ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন ছাপা হওয়ায়। আমাদের ছোটাছুটির মধ্যেই শুরু হয়ে গেল ক্র্যাক ডাউন। রাত ১২টার পর বিভীষিকা নেমে এল ঢাকায়। আমরা লুকোলাম হোটেল গ্রিনে। লুকোনো অবস্থায়ই দেখলাম দি পিপল ও গণবাংলায় আগুন দিচ্ছে পাকিস্তানি মিলিশিয়ারা। সঙ্গে নিপ্পন মোটর্সও জ্বললো। পাশের কাঁটাবন বস্তিতে দেখলাম আগুনের শিখা। হোটেল গ্রিন থেকে পূর্ব পাশের সাকুরা পর্যন্ত বামপাশের প্রতিটি দোকান পুড়িয়ে দিল তারা। হোটেল গ্রিন আর তার সামনে আমাদের দোকানসহ অনেকগুলো দোকান বেঁচে গেল ভাগ্যক্রমে। কারণ এই জায়গার মালিক নওয়াব আয়েশা বেগম, যিনি ইয়াহিয়া খানের দূর সম্পর্কের বোন। মহল্লাও বেঁচে গেল বিহারিরা এখানে থাকে বলে। প্রায় দুইদিন অবরুদ্ধ থাকার পর শুক্রবার জুমার নামাজের আগে কার্ফ্যু তোলার পর আমরা তিনজন তিন দিকে বেরিয়ে পড়লাম, যাতে মারা পড়লেও এক সঙ্গে সবাই মারা না পড়ি। আমি চলে গেলাম বন্ধু আনিসের সঙ্গে কলাকোপার আগলী-গালিমপুরে। আনিস নিপ্পন মোটর্সে কাজ করতো। বাবা গেলেন কাকরাইল মসজিদের তাবলিক জামাতিদের সঙ্গে। বড় ভাই গেলেন আরেক কাফেলায়।

গ্রিন হোটেল থেকে বের হয়ে প্রথম দেখলাম আমার এক বন্ধুর লাশ, আমাদের এলাকার খাককান্দার সিদ্দিক। সাকুরার পাশে তার দোকানে জ্বলন্ত অঙ্গার হয়ে বসে আছে। এই দোকানের মালিক ছিলেন এমদাদ সাহেব যিনি ১৯৯৬ সালে আড়াই হাজারে আওয়ামী লীগের এমপি হয়েছিলেন। শাহবাগ হয়ে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভেতর দিয়ে ডানে-বামে অসংখ্য লাশ ও আহত মানুষ পেছনে ফেলে ভীত মানুষের কাফেলার সঙ্গে সারাদিন হেঁটে সন্ধ্যায় পৌছলাম গালিমপুর। গ্রামের রাস্তার দু' পাশে দেখলাম খাদ্য ও পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শত শত মানুষ। শিশুদের জন্য নিয়ে এসেছে দুধ। বাঙালির নৈতিকতায় সেদিন এসেছিল প্লাবন যা আমরা ধরে রাখতে পারলে ইতিহাস হতো অন্যরকম।

গালিমপুর থেকে পরের সপ্তায় দুইদিন হেঁটে বাড়িতে পৌঁছে দেখি আব্বা আর বড় ভাই আগেই পৌছে গেছেন। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম।

আজ আমার ওজন শরীরের সঙ্গে মানান-সইয়ের চেয়ে বেশি। কিন্তু একাত্তরে ছিলাম লিকলিকে, মাত্র পঁচানব্বই পাউন্ড। ক্লাশ টেনে উঠেছি মাত্র। বাড়িতে কয়েক দিন থেকে গ্রামের বন্ধু সিরাজকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম আগরতলা। বলাবাহুল্য পালিয়ে। উঠলাম হাঁপানিয়া বেজ ক্যাম্পে। এখান থেকে ট্রেনিং-এর জন্য মুক্তিযোদ্ধা বাছাই করা

হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, মুক্তিযুদ্ধে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য আমাকে অযোগ্য বিবেচনা করা হলো। বার বার লাইনে দাঁড়াই, কাজ হয় না। আমার ডান-বাম থেকে সবাইকে নেয়, আমাকে নেয় না। কারণ একটাই, বয়স যে কম তা শুধু নয়, অসম্ভব রোগা আমি। ওদের ধারণা, আমি বন্দুকই আগলাতে পারব না। কিন্তু আমি জানতাম পারব। তাই হাল না ছেড়ে বার বার দাঁড়াতাম লাইনে। একবার সিরাজকে রিক্রুট করল, কিন্তু আমাকে করলো না। সিরাজ আবার আমাকে ছাড়া যাবে না। আমার জন্য বেচারার যুদ্ধেও ট্রেনিং নেয়া হলো না। এক সময় কঠিন পেটের পীড়া ও আমাশয় হয়ে গেল। হবারই কথা। বেজ ক্যাম্পে ভাত দিত এক বেলা। সন্ধ্যার পর। প্রায় পচে যাওয়া আতপ চালের মধ্যে পোকাও থাকত যা সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখা না যাওয়ায় ভালোই হতো। সাথে কথিত ডাল, প্রায় পানিই বলা যায় একে। তবে শুনতাম যারা ট্রেনিং নিতে যেতে পারতো, সেখানে আরো উন্নত খাবার ছিল। এসব নিয়ে কারোই কোনো অনুযোগ ছিল না, আমাদেরও না। ভারত তার সাধ্যমতো যথেষ্ট করে চলছিল। কিন্তু অসুখতো কিছুই কনসিডার করে না। আমার মতো অনেই অসুস্থ হয়ে পড়ত। অবস্থা সংকটজনক দেখে আগস্টে ফিরে এলাম বাড়িতে। সুস্থ হয়ে নভেম্বরে এলাকার আরো ত্রিশজনের মতো একত্রে রওয়ানা হলাম ত্রিপুরায়। কিন্তু সীমান্ত পার হওয়া গেল না। সীমান্ত তখন পাকিস্তানিদের সঙ্গে আলবদর, আল শামসরাও পাহারা দিচ্ছিল। মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের যাওয়া আসা কঠিন হয়ে পড়ল। কারণ, আলবদর-আলশামসরা স্থানীয় বলে জানত কোন কোন পয়েন্টগুলো বন্ধ করতে হবে। কী ভয়ঙ্কর ও নিপুণ তাদের বিশ্বাসঘাতকতা। কয়েকদিন নৌকায় কাটিয়ে আবার ফিরে এলাম। অপেক্ষা করতে থাকলাম সীমান্তের অবস্থা শিথিল হওয়ার। কিন্তু তা আর হয়নি। সর্বাত্মক যুদ্ধ লেগে গেল। স্বাধীন হয়ে গেল আমার দেশ। আক্ষেপ রয়ে গেল আমার। আমার স্বজনেরা, আমাদের বীরেরা লড়াই করে, জীবন দিয়ে স্বাধীনতা দিয়ে গেল আমাদের। আমাকে দিয়ে গেল বাড়তি কিছু, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর নাগরিকত্বও।

সশস্ত্র যুদ্ধে যেতে না পারার আক্ষেপ আজো রয়ে গেল। সান্ত্বনা এইযে, চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। পরেও মুক্তিযুদ্ধের মহান স্বপ্ন-চেতনার পক্ষে যা কিছু ঘটেছে সে-সবের মিছিলে থাকার চেষ্টা করে আসছি।

২২ ডিসেম্বর ২০১১

এক মহান মওলানার কথা

আমি মাওলানা ভাসানীর সংস্পর্শে আসিনি কখনো, কিন্তু তিনি আমার হৃদয়ে ও চেতনায় সব সময় বিরাজমান। তাঁর বক্তৃতা শুনতাম জনসভায় গিয়ে, দূরে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তিনি অন্তর্গতভাবে সবসময়ই অতি কাছের।

মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম মমত্ববোধ দেখেছি, কিন্তু শিখতে পেরেছি অল্পই। এই আক্ষেপ আজীবনের।

মওলানা ভাসানী আমাদের কালের সাহসীতম মানুষ, প্রজ্ঞাবান রাজনীতিক, নির্মোহ নেতা। তাঁর কালের জওহরলাল নেহরু, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, নেতাজী সুভাষ বসু, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ মাপের নেতা তিনি। একই সঙ্গে তিনি রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সমাজ সংস্কারক। রাজনীতিক ও সংস্কারক– এই দুই গুণের সমন্বয় রাজনীতিতে বিরল যা ঘটেছিল মওলানা ভাসানীর ক্ষেত্রে।

তিনি আমৃত্যু ছিলেন রাজপথের মানুষ, ক্ষমতার কানাগলিতে প্রবেশ করেননি। তাই লোভ-লালসার চোরাবালিতে ডুবতে হয়নি কখনো।

তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন করেছেন, পাকিস্তান হওয়ার পর প্রথম আপাত-অগ্রসর একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন, আপাত-অগ্রসর পাঠকের জন্য ইত্তেফাক পত্রিকা করেছেন, কাগমারীতে প্রথম বিশ্বমানের একটি সম্মেলন করেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানকে প্রথম আসসালামু আলাইকুম এবং লাকুম দি নুকুম ওয়ালিদীন বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক প্রথম দিয়েছেন, স্বাধীন বাংলাদেশে আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে প্রথম সোচ্চার হয়েছেন। আমৃত্যু প্রতিটি সংগ্রামে-উত্থানে-স্পন্দনে প্রথমের শিরোপা অক্ষুণ্ন রেখেছেন। তিনিই ছিলেন একমাত্র নেতা যিনি মাত্রাচ্যুত হতে দেখলে যে-কাউইকে বলতে পারতেন, 'খামুশ'।

আমাদের স্বাধীনতা অর্জন ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রমের অন্যতম বরেণ্য পুরুষ ছিলেন মওলানা ভাসানী। এই মহান নেতার স্থান দল-মতের উর্ধে। তাঁর মাপের প্রজ্ঞাবান ও নির্লোভ নেতা আমাদের ইতিহাস ও সমকালে খুব বেশি নেই। জাতির সব সংকট ও সংগ্রামে অটল পর্বতের মতো হাজির থেকেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন না, কিন্তু কমিউনিস্টরা তাঁকে নক্ষত্র জ্ঞান করে নিজেরা গ্রহ-উপগ্রহের মতো ঘুরপাক খেয়েছে তাঁর চারপাশে। তাঁর কাছে যারা পানি পড়া নিতে আসতেন, তিনি পানিতে ফুঁ দিতেন এবং পাশাপাশি ডাক্তারের কাছে যেতেও উপদেশ দিতেন। বেশি দরিদ্র দেখলে ওষুধের জন্য দু'চার টাকা ধরিয়ে দিতেন।

তিনি একদিকে সর্বহারার রাজত্ব কায়েমের ডাক দিয়েছেন, আরেকদিকে করেছেন খোদাই খিদমতগার। বিরোধ দেখা দেয়নি কোনোটির মধ্যে।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছেন একদিকে, অন্যদিকে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের সময় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সাহায্য দেয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহবানও জানিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের, রাজনীতির সেই সুমহান সংস্কৃতি বিকৃতির কবলে পড়ে নিষ্পেষিত এখন।

মওলানা ভাসানী পরম পরহেজগার-ধর্মপ্রাণ ছিলেন। কিন্তু ধর্মান্ধ ছিলেন না এবং ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির ঘোরতর বিপক্ষে ছিলেন। এই কারণে ধর্মের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে তিনি এক মহান মওলানা।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নেতানেত্রীদের মৃত্যু জনগণের মধ্যে গভীর রেখাপাত করে বটে, শূন্যতার সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু মওলানা ভাসানীর প্রয়াণ মানে "শতাব্দীর সূর্য অস্তমিত" হওয়া।

মওলানা ভাসানীর স্মৃতি অমর হোক।

নিউ ইয়র্ক, ১৫ নভেম্বর ২০১৩

হুমায়ূন আহমেদ ও আইডিয়ার জীবন

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর সৃজনশীলতার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি ভালোবাসার পত্রই লিখে গেছেন। এই ভালোবাসা মানুষের প্রতি, মানবগ্রহের প্রতি ভালোবাসা। এই পত্রটিই আমরা কখনো দেখেছি উপন্যাসের আকারে, কখনো ছোট গল্পের আকারে, কখনো পত্রিকার কলামের আকারে, কখনো নাটক-চলচ্চিত্ররূপে। হুমায়ূন আহমেদের প্রধান গুণ, তিনি-যে মানুষকে ভালোবাসেন তা তিনি জানান্ দিতে পেরেছেন। মানুষকে বোঝাতে পেরেছেন। এ জন্যই প্রতিটি মানুষের হৃদয় জয় করা সহজ হয়েছে তাঁর। প্রবল হাসির পর পরই হঠাৎ করে মানুষের বুকে তুলতে পারতেন আবেগের ঝড়, কান্নার ঝড়। কান্নার সে অংশটি লেখা হতো যেন বা কলম কালি দিয়ে নয়, অশ্রু দিয়ে। তিনি সবখানেই অনুসন্ধান করেছেন সৌন্দর্যের, এমন কি পতিত-পাপীদের মধ্যেও। সেই সৌন্দর্য সঞ্চার করে দিতে পেরেছেন অন্যের মাঝে, তাই তাঁর ভিলেনরাও পায় পাঠকের সহানুভূতি। হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার এমন কাব্য বাংলা সাহিত্য আর দেখেনি কখনো। এ এক অভূতপূর্ব উত্থান, বিস্ময়কর বিকাশ এবং বিষাদময় পরিণতি। একদিকে প্রবল জাগতিক মিসির আলী, অন্যদিকে মহাজাগতিক হিমু – দু'জনকেই সমানভাবে তৈরি ও বিকশিত করা চাট্টিখানি কথা নয়। এক্ষেত্রেও হুমায়ূন অদ্বিতীয়। তার পাঠকেরা প্রবল পরস্পর-বিরোধী এই দুই চরিত্রের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে হিমশিম খায়, কিন্তু হাল ছাড়ে না।

আমি হুমায়ূন আহমেদের লেখা পড়তে ভালোবাসি, তাঁর নাটক-ছবি দেখতে ভালোবাসি– আনন্দ পাই। লক্ষ লক্ষ অনুরাগী রয়েছে তাঁর। চার্লি চ্যাপলিনের চলচ্চিত্রগুলোকে বলা হয় মানব জাতির প্রতি এক একটি প্রেমপত্র। আমি যখন হুমায়ূন আহমেদের লেখা পড়ি বা নাটক-সিনেমা দেখি, মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসার উত্তাপটা তখন স্পর্শ করি। সেই ভালোবাসা কাগজের পাতায় ও পর্দায় নিখুঁতভাবে লেপে রেখে গেছেন তিনি। ভালোবাসার নান্দনিক ও শুদ্ধতম প্রকাশ কঠিন বটে।

মৃত্যুকে ভয় ছিল না হুমায়ূনের, কিন্তু বাঁর ইচ্ছাও ছিল প্রবল। সে ইচ্ছা তিনি গোপনও করেননি। কখনো প্রতীকে, কখনো বা প্রত্যক্ষে তারাশঙ্করের সেই কবিরই প্রতিধ্বনি করেছেন, 'জীবন এত ছোট কেনে'– যেখানে একটি কচ্ছপ বাঁচে তিন-সাড়ে তিন শ' বছর! কোনো মানে হয়! প্রকৃতির এ এক বড় রহস্য; যদিও হুমায়ূন বলতেন, 'প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে না'। এসবের ব্যাখ্যা অনুধাবন সাধারণের সাধ্যাতীত। তাঁদের পক্ষেই সহজ, যাঁদের রয়েছে মানবোত্তর-দেবদুর্লভ জ্ঞান।

সুকান্ত চলে গেলেন অকালে। জীবিত থেকেও নজরুল থেমে গিয়েছিলেন মাঝ পথে। সোমেন চন্দকে আমরা হারিয়েছি এক পৈশাচিক ও লজ্জাস্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। আবুল হাসান, রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লা কত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। হুমায়ূন আহমেদও বলতে গেলে অকালেই চলে গেলেন। অবশ্য আমরা যদি জীবনকে বয়সের ফিতে দিয়ে মাপি তাহলে মনে হবে, হুমায়ূন অকালে চলে গেছেন। কিন্তু জীবনকে যদি তাৎপর্যের পাল্লায় মাপা হয়, তাহলে আমরা দেখব, এই স্বল্পকালেই অনেক কিছু করে গেছেন, অনেক দিয়ে গেছেন আমাদের জন্য। মহাবীর আলেকজান্ডার বয়স পেয়েছিলেন হুমায়ূনের অর্ধেকের একটু বেশি। কি আসে-যায় তাতে। হুমায়ূন আহমেদের কর্মই এখন প্রধান, বরণীয়, স্মরণীয়।

পরকীয়া অবস্থায় ডায়না মারা যাওয়ার পরও মানুষের সহানুভূতি পেয়েছেন। মানুষ খুবই বিচিত্র জীব। বাঙালি মধ্যবিত্ত আরো বিচিত্র। তারা শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে খোঁজে, বাস্তবের নয়, আইডিয়ার জীবন– যে জীবন হতে পারতো কিন্তু হয়নি। শিল্প-সাহিত্য যারা রচনা করেন; বিশেষ করে মেধাবী-খ্যাতিমান যাঁরা, তাঁদের মধ্যেও বাঙালি মধ্যবিত্ত আইডিয়ার জীবনই খোঁজে। নাটক-সিনেমার নায়ক-নায়িকাতো বটেই, এরা এমন কি তাদের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেও খোঁজে আইডিয়ার জীবন। আমাদের সমাজে যে লোকটি অহরহ দুর্নীত করে, ঘুষ খায়, সেও চায় উপন্যাস-নাটক-সিনেমার নায়কেরা যেন ঘুষ না খায়, দুর্নীতি না করে। এ-সবের গল্পকার, উপন্যাসিক, নাট্যকার, চলচ্চিত্রকাররা যেন অতি সৎ হয়। তাদের রাজনৈতিক নেতারা যেন সৎ হয়। যে লোক দুশ্চরিত্র সেও চায় তার আইডিয়ার নায়ক-নেতারা যেন চরিত্রবান হয়। প্রচণ্ড দুর্মুখ-বাচাল-মিথ্যাবাদীরাও চায় তাদের নায়ক-নেতারা যেন পরিমিতিবোধ সম্পন্ন হয়। যখন এর ব্যত্যয় দেখতে পায় তখন তারা মর্মাহত হয়। তাদের কাছে মনে হয় এই পতন মহীরুহের পতন। দ্বিতীয় বিয়ের কারণে হুমায়ূন আহমেদের এই মনস্তাত্ত্বিক পতনই হয়েছিল, কিন্তু মানুষের মধ্যে তিনি বিচরণ করেছেন সরবে, সগৌরবে, যেমন ট্রাজেডির পতিত নায়করাও মহিমাসহ মানুষের ভালোবাসা সহানুভূতি পান, তেমনটা পেয়েছেন। সমাজে বহু মানুষ আছে যাদের মধ্যে অল্পবিস্তর বিকৃতি আছে, যারা মহীরুহের পতন দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। আর যদি সেই মহীরুহের কানটি মলে দেওয়ার সুযোগ আসে, তাহলে তো কথাই নেই, বিমল আনন্দে তা করে থাকে। তাদের হতাশ করেছেন হুমায়ূন আহমেদ।

২

যে নরক তৈরি করা হয়েছে মানুষের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের জন্য, মানুষকে স্ব স্ব ধর্মের পথে আনার জন্য, হুমায়ূন আহমেদ শুরুই করেছিলেন সেই নরককে নন্দিত আখ্যা দিয়ে– রূপকে, প্রত্যক্ষে। এই নরক পরকাল-প্রসারী নয়। এ নরক জীবনের, যে জীবন অনেক নারকীয়তা নিয়েও অনিন্দ্যসুন্দর। এই চিত্রকল্প তৈরি বড় মেধার কাজ।

হুমায়ূন আহমেদ বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন-জগতকে প্রভাবিত করার পাশাপাশি প্রভাবিত করছেন নতুন প্রজন্মের অনেক লেখককেও। তিনি নিজেও বিভিন্ন ভাষার বহু লেখকের অনুরাগী। তার অনেক গ্রন্থের নামও রেখেছেন পরিচিত কবিতার চরণ দিয়ে।

প্রথম জীবনে বহু লেখকই কারো কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন। পরে তাদের নিজস্ব ধারা গড়ে তোলেন এবং পরবর্তী প্রজন্মকে প্রভাবিত করেন। সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে প্রভাবিত হওয়ার ক্ষমতা মেধাবীদেরই আছে; মেধাহীনরা করে নকল। এ ধরনের প্রভাবিত হওয়ার সাক্ষ্য বাংলা সাহিত্যেই অনেক আছে। মাইকেল মধুসূদন প্রভাবিত হয়েছেন হোমার দ্বারা। রবীন্দ্রনাথে প্রভাব রয়েছে লালন-বিহারীলালের। এমন কি বাংলাদেশের যে জাতীয় সঙ্গীত, সেটিতেও গগন হরকরার একটি গানের ছায়া রয়েছে। প্রভাবিত হয়েছেন জীবনানন্দ দাস। ভারতে এখন বঙ্কিম চন্দ্রের যে বন্দে মাতরম গান নিয়ে নতুন করে মাতামাতি শুরু হয়েছে সেটিতেও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় খণ্ডের একটি শ্লোকের ছায়া রয়েছে *(পৃষ্ঠা-৬৬১, শ্লোক : ১৪-৩-১০)*। বঙ্কিম বেঁচে থাকতে এ গান নিয়ে ততো উচ্চকিত ছিলেন না। গানটি লিখে আট বছর ড্রয়ারে ফেলে রাখেন। এরপর আনন্দমঠ উপন্যাসে জুড়ে দেন। সত্তর বছর পর কংগ্রেস এটি গ্রহণ করে দলীয় সঙ্গীত হিসেবে। অতি মাত্রায় পৌত্তলিকতা বা হিন্দু ধর্মের একক প্রাধান্যের জন্য এটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হতে হতেও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। যুগান্তর-অনুশীলন যুগের আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের লোক অংশগ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু তখন উদ্দীপ্ত হওয়ার জন্য হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বন্দে মাতরমকে প্রধানভাবে অবলম্বন করলেও মুসলমানরা সুর মেলাতে পারেননি ঐ একই কারণে। সে গানে এমন পঙক্তিও রয়েছে, 'বাহুতে তুমি মা শক্তি / হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি / তোমার প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।' যার জন্য মুসলমান বিপ্লবীরা কণ্ঠ মেলাতে পারেননি তাতে।

ছায়া-প্রভাবের এ খেলা নিরন্তর চলে আসছে। প্রকৃতি একজনের রেশকে কাটছাঁট করে সঞ্চার করে আসছে অন্যজনের মধ্যে। মহাজাগতিক এই লেন-দেনের ওপর বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি আলোকপাত করেছেন হুমায়ূন আহমেদ।

জর্জ বার্নাড শ' বলেছেন, যে নিজের এবং নিজের সময় সম্পর্কে লেখে সে সব সময় এবং সব মানুষ সম্পর্কেই লেখে। হুমায়ূন আহমেদ তা-ই লিখেছেন।

৩

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমার দু'বার মাত্র সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি একসময় বিটিভিতে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান সংকলন করতাম। বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্প নিয়ে আলোচকদের একজন হিসেবে সেসময় তিনি এসেছিলেন। সামান্য কথাবার্তা হয়েছে। আরেকবার ২০০৫ সালে, আমি যখন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক, তাঁর দখিনা হাওয়ায় গিয়েছিলাম পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি সংক্রান্ত একটি বিষয়ে পরামর্শের জন্য। দ্বিতীয়বার গিয়ে আমার আরেকটি লাভ হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা তাঁর 'জোসনা ও জননীর গল্প' স্বাক্ষর করে উপহার দিয়েছিলেন আমাকে। অবশ্য এটি অনেক আগেই পড়ে ফেলেছিলাম। সে কথা তাঁকে জানাবার পর বইটিতে মুক্তিযুদ্ধের উপাদানে কি কি ঘাটতি আছে সে-সব সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চান। আমি উপন্যাসের যথাযথ প্রশংসা করে জানাই যে, মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি স্বীকার করে এ বিষয়ে আমার কাছে যে-সব তথ্য আছে দেওয়ার অনুরোধ জানালেন। আমি সানন্দে রাজি হলাম। এ-ও জানালাম, আমার লেখা 'জনগণের মুক্তিযুদ্ধ :

চেতনার স্বরূপ-সন্ধান'– গ্রন্থে এ বিষয়ে মোটামুটি একটি চিত্র আছে। তিনি বললেন, বইটি আমার কাছে আছে। জাফর ইকবাল দিয়েছে। আমার তখন মনে পড়ল, আমার গ্রন্থে প্রিয় লেখক জাফর ইকবালের লেখার উদ্ধৃতি থাকায় তাঁকে একটি বই ডাকযোগে সিলেটে পাঠিয়ে ছিলাম। কোনো উত্তর না পেয়ে ধরে নিয়ে ছিলাম পৌঁছেনি। প্রত্যাশিত উত্তরটি হুমায়ূন আহমেদের কাছে পেয়ে ভালোই লাগলো। কিন্তু জাফর ইকবাল এটি হুমায়ূন আহমেদকে 'জোসনা ও জননীর গল্প' লেখার আগে নাকি পরে দিয়েছেন এ নিয়ে কোনো কথা হলো না। হুমায়ূন আহমেদ আরো কোনো ত্রুটি আছে কি না জানতে চাইলে বললাম, চীন-ভারত যুদ্ধ ১৯৬২ সালে হয়েছে, ১৯৬৫ সালে নয়। তিনি আমাকে প্রশ্রয় ও অভয় দিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন, এমন ত্রুটি চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন। কয়েকদিন পর আফসার ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত তাঁর এক গল্পে দেখলাম, তিনি লিখেছেন, পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর ছিল বুদ্ধদেবের পুত্র কুনালের চোখ। কিন্তু কুনাল বুদ্ধদেবের পুত্র না, সম্রাট অশোকের পুত্র। গৌতম বুদ্ধের পুত্রের নাম রাহুল। এ তথ্য লিখে আমি আফসার ব্রাদার্সের বাবুল ভাইকে দিয়ে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন এবং হুমায়ূন আহমেদকে জানাতে অনুরোধ করলাম। সংশোধন বা জানানো হয়েছিল কি না জানি না। আমি আমেরিকা চলে আসি। আসার কিছুদিন পর বাবুল ভাই মারা যান। তিনি হয়তো হুমায়ূন আহমেদকে জানাতে পারেননি, অথবা জানিয়ে থাকলেও হুমায়ূন আহমেদ হয়তো আবার ভুলে গেছেন। কারণ, তার সর্বশেষ উপন্যাস 'দেয়াল'-এর শেষের দিকে আবার লিখেছেন, কুনাল বুদ্ধদেবের পুত্র। দেয়াল-এর আরেকটি অসঙ্গতিও বিস্ময়কর। মার্কটোয়েনের বিখ্যাত একটি উক্তি (নির্বোধের সঙ্গে তর্ক করো না, তা হলে সে তোমাকে তার পর্যায়ে নামিয়ে এনে ঘায়েল করবে) খন্দকার মুশতাককে দিয়ে এমনভাবে বলানো হয়েছে যে, মনে হবে এ দার্শনিক উক্তি খন্দকার মুশতাকেরই। এ কাজ হুমায়ূন আহমেদকে আগে কখনো করতে দেখা যায়নি। হয়তো মরণ-ব্যাধির কারণে এসব অসঙ্গতি চোখে পড়েনি। এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ এ জন্য তুললাম, যাতে দেয়ালের পরের সংস্করণগুলোতে শুদ্ধ করা যায়। শুদ্ধ করা প্রয়োজন হুমায়ূন আহমেদেরই ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে। এ কর্তব্য এখন আমাদের।

তাঁর কাছে আমাদের অনেক ঋণ। সে কারণে আমাদের কর্তব্য-খেলাপি হওয়া উচিত নয়।

নিউ ইয়র্ক, ২২ জুন ২০১৩

মানব-মণীষা কলিং-বেল টিপছে মহাকাশে

পৃথিবী থেকে ৫১ কোটি কিলোমিটার দূরের ধূমকেতুতে নেমেছে ফিলে নামের রোবট। এটি কোনো-কোনো দেশগোষ্ঠী পাঠালেও মূলত গোটা মানবগ্রহের প্রতিনিধি। গবেষকদের আশা, অভিযান সফল হলে ৪৫০ কোটি বছর আগে সৌরজগৎ সৃষ্টির সময়কার প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে জানা যাবে। নিউটন ও পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের ওপর নির্ভর করে ধূমকেতুতে ফিলের এই অবতরণ।

এর আগে যাওয়া নাসার তৈরি কিউরিসিটি মঙ্গল গ্রহে কলিং-বেল টিপছে প্রাণের সন্ধানে, যেন বা বলছে,'অ্যানিবডি হোম'? যদি কেউ থেকে থাকে, যদি কেউ সাড়া দেয়! অনেকদিন চলবে তার সন্ধান।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় একটি বালুর চেয়েও আকৃতিতে ছোট আমাদের এই মানবগ্রহ ছাড়া আর কি কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব নেই? সবটাই কি শূন্য। প্রকৃতির এমন অপচয় কি হতে পারে? সৃষ্টির এমন অপচয়তো হওয়ার কথা নয়। এসব জ্বলন্ত প্রশ্ন নিয়ে মানুষ বহুকাল থেকে উত্তর খুঁজে আসছে মহাকাশে।

মানুষ এখন স্বপ্ন দেখছে মহাবিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বাস করার। কিন্তু গ্রহ-থেকে গ্রহান্তরে, ছায়াপথ থেকে ছায়াপথে এই যে বিশাল মহাবিশ্ব, সেখানে জীবনের সম্ভাবনা কতটুকু! অতিদূরের নক্ষত্রপুঞ্জে প্রাণ থাকলেও মানুষ কি সেখানে পৌঁছতে পারবে?

আমাদের একটি মাত্র ছায়াপথেই রয়েছে নানা মাপের ও বয়সের প্রায় দশ হাজার কোটি তারা, তার মধ্যে সূর্যও একটি। প্রতি সেকেন্ডে একটি করে তারা গুণে গেলেও শুধু এক ছায়াপথের সব তারা গুণতেই লাগবে তিন হাজার বছরেরও বেশি। মহাবিশ্বে এই ছায়াপথের মতো তারাগুচ্ছ আছে প্রায় এক হাজার কোটি। অগণন এই সংখ্যা। কিন্তু মানুষ দমবার পাত্র নয়। চাঁদ দিয়ে শুরু করে মানুষের যাত্রা বিকশিত হচ্ছে মঙ্গলে। এবার প্রথম অবতরণ হলো একটি ধূমকেতুতে।

বিজ্ঞানীদের অনুমান, এককালে মঙ্গলে প্রাণ ছিল। তাই হয়তো বা এই গ্রহকে করা যাবে মনুষ্যবাসের উপযোগী। লক্ষ্য সেটাই মানুষের।

কিন্তু মহাবিশ্বে আমাদের এই মানবগ্রহ ছাড়া আর কোথাও জীবিত প্রাণের সন্ধান কি একেবারেই নেই? সে কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। এই মহাবিশ্বে যত তারা রয়েছে এসবের শতকরা একটিতেও যদি সূর্যের মতো গ্রহজগৎ থাকে, এবং সেই এক হাজার গ্রহজগতের মধ্যে যদি মাত্র একটিতেও বুদ্ধিমান প্রাণী থাকে, তাহলে পৃথিবীর বাইরে শুধুমাত্র আমাদের ছায়াপথেই সভ্যতার দেখা মিলতে পারে অন্তত দশলাখ জায়গায়। এই অনুমান বিজ্ঞানীরাই করছেন।

বহুকাল চেষ্টার পর মানুষ আকাশ জয় করতে পেরেছে। মহাবিশ্বকে জানার জন্য মানুষ প্রাচীনকাল থেকে চেষ্টা করে আসছে, মানমন্দির তৈরি করে। গ্রিকরা প্রায় দুই হাজার বছর আগে আলোক্সান্দ্রিয়ায় মানমন্দির তৈরি করে। বাগদাদে তৈরি হয় এক হাজার বছর আগে, সমর খন্দে ছয়শ' বছর আগে। আমেরিকার তখন খবরও জানতো না মানুষ। ইউরোপ তখন অন্ধকারে। তখন সভ্যতার আলোক উজ্জ্বল ছিল প্রাচ্যে। আজ আমেরিকা সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে কেবল সাধনার বলে।

পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাবের পরই রহস্যভেদ করতে মানুষ তাকিয়েছে আকাশের দিকে। পশু চরানো, চাষাবাদ করা, ঋতুর আগমন বার্তা উপলব্ধির জন্য তাকাতে হয়েছে আকাশের দিকে। রাতে দূরের পথে যেতে তারকারাজি পালন করেছে পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা। আজো পাখিরা এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে যখন উড়ে যায়, তারকারাজিই গতিপথ দেখায় তাদের। লাখ লাখ বছর ধরে মানুষ তার প্রেমের-সৌন্দর্যে-বীর্যের প্রতিচিত্র অংকন করেছে তারাকে ঘিরে। আদিম গুহা আবিষ্কারের পর সেখানে দেখা গেছে আকাশ ও তারার ছবি আঁকা রয়েছে। সেই তারকামণ্ডলে মানুষ এখন বসবাস করতে চাইছে। মানুষ অসীম সম্ভাবনাময় প্রাণী। তার কাছে আজ যা কল্পনা কাল তা বাস্তব। একদিন হয়তো মানুষ তারার রাজ্যেই বাস করবে, জন্মাবে সেখানে, অন্তিম শয়ানও হবে সেখানেই। একদিন হয়তো পেয়ে যাবে কোথাও নতুন প্রাণের সন্ধান। তখন তারায়-তারায় গড়ে উঠবে মিতালী। এই মহাবিশ্বের প্রতিটি নক্ষত্র-গ্রহ-উপগ্রহ-ধূমকেতু মিলেই একদিন হয়তো গড়ে উঠবে একটি পরিবার। মানুষের সেই সৃজনশীলতার উত্থান শুরু হয়েছে। রোবটযান ফিল ও কিউরিসিটি তার অধুনা-স্বাক্ষর। ফিল ও কিউরিসিটির টিমকে অভিনন্দন – মানুষের জন্য বিজয়ের বার্তা নিয়ে আসায়।

১৪ নভেম্বর ২০১৪

স্বদেশ-প্রবাস কথকতা

এক.

প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলেটি স্বপ্ন দেখে উপজেলা শহরের বাসিন্দা হওয়ার। উপজেলায় যে আছে সে স্বপ্ন দেখে তার জেলা শহরে গিয়ে থাকার। জেলা শহরের বাসিন্দা চলে যেতে চায় রাজধানী ঢাকা শহরে। ঢাকা শহরের মানুষ আসতে চায় আমেরিকায়। আর আমেরিকায় যারা আছে তারা যেতে চায় চাঁদে-মঙ্গলে। একদিন চাঁদে যারা বসবাস করবে, তারা ছড়িয়ে পড়তে চাইবে গ্রহ-গ্রহান্তরে। মানুষের স্বপ্নের শেষ নেই। সম্ভাবনার শেষ নেই। আরো কত কিছুই না করবে মানুষ।

একদিন, ১৯৬৪ সালের মধ্য আগস্টের এক ঘুঘু ডাকা বিষণ্ন দুপুরে দুর্গম এক চর থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম ঢাকা শহরে। পেছনে পড়েছিল কাশবন আর ধু ধু বালুর চর। সাথে ছিল দুর্দমনীয় স্বপ্ন আর বিভ্রম। কি ঘোরই না লেগেছিল চোখে। আরও ছিল সজীব তরতাজা একটি ফুসফুস। হায়, কিছুই আর আগের মতো নেই। ছোট্ট কোশা নৌকায় মেঘনার বুক বেয়ে সাত কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে বৈদ্যেরবাজার থেকে লঞ্চে উঠেছিলাম। সে-ই প্রথম যন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ। ঘোর লাগা চোখে বুঝতে পারিনি, সেই যন্ত্র চিরকালের জন্য নিয়ে যাবে অন্য জগতে। প্রকৃতির কাছে আর ফিরে যাওয়া হয়নি। গ্রামে গেছি বহুবার, যন্ত্র আর যন্ত্রণা কবলিত হয়ে, সেই আগের ভূমিপুত্র হয়ে আর নয়। যদি ফিরে পেতাম সে ছোট্ট কোশা নৌকাটি, সেই টাইম মেশিনের মতো, প্রকৃতির কাছে আবার ফিরে যাওয়ার জন্য! তাতো হবার নয়, গোটা সভ্যতায় নাড়া দিলেও নয়। আর প্রকৃতিরই বা আগের মতো আছে কি? নেই। যন্ত্র তার হৃদপিণ্ডে ঘুরছে প্রতিদিন গাড়ল শব্দসহ।

দুই হাজার দশ সালের উনিশ অক্টোবর আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে সহধর্মীনির ডিভি পাওয়ার সুবাদে যখন নিউ ইয়র্কে আসি, তখনো চোখে ছিল আরেক বিভ্রম। আসার সময় 'এই ফিরে আসব' বলে রিটার্ন টিকেট কিনে এনেছিলাম। টিকেট তখন খোলা ছিল। কিন্তু আমি নিজে খোলা নই, মুক্ত নই। কত বন্ধন জড়িয়ে গেছে চারদিকে, কতো না ভাবে। সব রিটার্ন টিকেট সবসময় ক্যাশ করা যায় না। জানি না কবে পারব। এখানকার যন্ত্র আরো শক্তিশালী, আরো নিপুণ। আবার বিভ্রম, আবার সমর্পণ।

আমি এখন বিশ্ব নাগরিক, কিন্তু প্রতিদিন আতিপাতি করে খুঁজি সেই ছোট্ট কোশাটি, যে প্রকৃতির হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে আমাকে তুলে দিয়েছিল যন্ত্রের পিঠে। গাঁও গেরামের মহাকাব্যিক হাহাকার এখন নস্টালজিয়া মাত্র। এই হাহাকারতাড়িত হয়েই মধুসূদন হয়তো মিনতি করেছিলেন, 'রেখো মা দাসেরে মনে...।

আমেরিকা আসার পর কেউ কেউ বলেন, 'আপনারাও দেশ ছেড়ে দিলে কিভাবে হবে?' তখন নিজে নিজেই প্রশ্ন করি, আমরা কারা? আমিই বা তেমন কি? মহান মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন-চেতনা-ফসল মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছেনি, বিপ্লবও হয়নি। আমরা তো দার্শনিকভাবে অনেক আগেই পরাজিত। কি প্রয়োজনেই বা আসব আর? তবে এই সাময়িক পরাজয়ই তো শেষ কথা নয়, শাশ্বত নয়। শাশ্বত হচ্ছে স্বপ্ন ও সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম চলছে বিরামহীনভাবে।

আবার কেউ কেউ বলেন, দেশে যা ছিলেন ভুলে যান। এখন মানিয়ে নিন। যে দেশে যে বাও...। মনে মনে বলি, দেশেও কেউকেটা কিছু ছিলাম নারে ভাই। ছিলাম একেবারে সাধারণ মানুষ। অনেক কিছুই করেছি সন্দেহ নেই। কৃষিকাজ করেছি, শিক্ষকতা করেছি, সাংবাদিকতা-রাজনীতি-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি করেছি। করেছি চুক্তিভিত্তিক আমলাপনা। কিন্তু সব কিছুই সাধারণ মানুষের কাতারে থেকে। অসাধারণ কখনো হতে চাইনি, এখনো চাই না।

এই প্রবাসে এক-একজন বাংলাদেশী মানে এক-একখণ্ড বাংলাদেশ। তার হৃদয় কাদামাটির জমিন। তার উচ্ছ্বাস বাংলাদেশের পতাকা, তার উচ্চারণ মহান একুশে ফেব্রুয়ারী। আর তার দলাদলি-রেষারেষি? সেও তো বাংলাদেশেরই প্রতিবিম্ব। বাংলাদেশ বদলালে তারাও বদলাবে। কিন্তু বদলাবে কে? কবে?

ডিসেম্বর ২০১১

নিউ ইয়র্ক, অরুন্ধতী রায় ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

সম্প্রতি পড়ে শেষ করলাম অরুন্ধতী রায়ের 'দ্য শেপ অব দ্য বিস্ট'। তিনি বেশি খ্যাত হয়েছেন 'দ্য গড অব স্মল থিংকস'-এর জন্য। কিন্তু তার প্রতিটি লেখাই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বর্তমান বিশ্বের পাবলিক ইন্টেলেকচুয়ালদের একজন। আমি তার অনুরাগী পাঠক। আমাকে সবচেয়ে বেশি আপ্লুত করেছে তার 'দ্য এন্ড অব ইমাজিনেশন'। ভারত দ্বিতীয়বার পারমাণবিক পরীক্ষা চালানোর পর এটি লিখেছিলেন তিনি। ঘটনাটিকে তিনি দেখেছিলেন সৃজনকালের অবসান হিসেবে। আর ঘটনার পর আদভানী বলেছিলেন, 'বুদ্ধ স্মাইল এগেইন'। অবশ্যই হেসেছিলেন বুদ্ধ এবং সেটা অবশ্যই ব্যাঙ্গাত্মক হাসি। পৃথিবীর প্রথম যুদ্ধবিরোধী মানুষ, রক্তপাত বিরোধী মানুষ গৌতম বুদ্ধকে নিয়ে কি করুণ ব্যঙ্গ করেছিলেন আদভানী। তিনি হয়ত এটা বিশ্বাস করেন না, যে, বৌদ্ধদের দৃঢ়-ধর্মীয় বিশ্বাস, বুদ্ধ আবার জন্ম নেবেন বারানশীতে, যখন তাঁর নাম হবে মৈত্রেয়। 'মজ্জিম পন্থার' (মধ্যপন্থা) উদ্ভাবক বুদ্ধকে নিয়ে কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে 'মৈত্রেয় জাতক'। বানী বসুর লেখা চমৎকার ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস। কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তার কলমেও বুদ্ধ খাটোই হয়েছেন। বুদ্ধকে যে অভিধা দিয়ে তিনি উপন্যাস শেষ করেছেন (চনক চরিত্রের মুখ দিয়ে) এটা ও এক ধরনের বিষোদাগার। স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করব না যে, কিছু কিছু লেখক-লেখিকার কলম শাঁখের করাতের মতো, যাদের কলম প্রাচীন যুগে গেলে কালিমালিপ্ত করে বৌদ্ধদের এবং মধ্যযুগে গেলে করে মুসলমানদের– বানী বসু সে কাতার অতিক্রম করতে পারেন নি। খুব বেশি লেখক-লেখিকা তা পারেননি। কিন্তু অরুন্ধতী রায় তা পেরেছেন। এজন্য ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি সচেতন বিবেকবান মানুষের কাছে অরুন্ধতী রায়ের স্থান অনেক উপরে। আবার ভারতেই রয়েছে রমিলা থাপার, ভগবান এস গিদওয়ানী, ইরফান হবিব প্রমুখের মতো ইতিহাস সন্ধানী যারা অনেক বেশি সত্যসংলগ্ন ও শ্রদ্ধেয়।

আমরা আমাদের নিয়ে উচ্চকিত বটে। তেমন উচ্চকিত অরুন্ধতীও তার দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে। কিন্তু প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভারতের ব্যবহার, ভারতীয় পারমাণবিক উন্মাদনা, কাশ্মীরে নিপীড়ন, মাওবাদীদের নির্মূলের প্রক্রিয়া প্রভৃতির বিরুদ্ধে অরুন্ধতী যতটা সাহসী-উচ্চকিত তা অন্যত্র দেখা যায় না। তার নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, প্রকৃতিবাদিতা, মানবাধিকার আন্দোলন, মার্কিন-ইসরাইলী যুদ্ধবাদিতার বিরোধিতা সবগুলোই মানবতার মহত্তম স্মারক কর্মকাণ্ড বলে আজ বিবেচিত হচ্ছে। স্বাধীন হলেও

আমরা এসব অনেক ব্যাপারে নিশ্চুপ। অঙ্গীকার, সাহস ও মেধার অপূর্ব সমন্বয় অনেকের মধ্যেই আছে, কিন্তু তারা অরুন্ধতী রায়ের পথে হাঁটেন না। কেননা, সেপথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। অরুন্ধতী চলে গেছেন নোয়াম চমস্কীদের কাতারে। যারা অস্ত্রের ভাষা ভালো বোঝেন, তাদের আবার ভালো বোঝেন অরুন্ধতী। তিনি স্পষ্ট বলেছেন জর্জ বুশ, ওসামার বিন লাদেন, এরিয়েল শ্যারন, পাকিস্তানের মোল্লাবৃন্দ, এল কে আদভানী ও নরেন্দ্রমোদী প্রমুখের চিন্তা ও কর্ম অভিন্ন। তারা পরস্পরকে ভালো বোঝেন। অরুন্ধতী ভাষায়, 'বুশ প্রোবেবলি নোজ দ্যাট রাইট-উয়িং রিলিজিয়ান দে সাবস্ক্রাইব টু, আর ব্রাদার্স ইন আরম্।'

২.

এক সময় আমার মধ্যে একটি মাত্র অমীমাংসিত প্রশ্ন সবসময় জাগরিত ছিল, 'সৃষ্টির রহস্য কী?' কোথা থেকে এলাম, কেনই বা কিছুদিন পৃথিবীতে থাকতে হবে, তারপর যাবই বা কোথায়? এ এক নিরন্তর প্রশ্ন। তারপর একসময় যোগ হয় আরেক প্রশ্ন, মানব জীবনের লক্ষ্য কী? যেসব মণীষী-দার্শনিক জীবনকে সহজভাবে গ্রহণের কথা বলছেন তারাই নমস্য মনে হয়েছে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের নিরন্তর সংগ্রাম ছিল জীবনকে সহজ করা, কিন্তু চিন্তাকে নয়। তাদের উপদেশ ছিল 'সিম্পল লিভিং এন্ড হাই থিংকিং'। এই চিন্তায় বহুকাল ঘুরপাক খেতে খেতে সম্প্রতি মার্কিন মুল্লুকে এসে হাজির হয়েছি। এখানে এসে নিজের সামনে তৃতীয় দার্শনিক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি 'জীবনের জন্য প্রয়োজন কতটুকু?' এই যে মানুষ কেবল বুদ্ধশ্বাসে ছুটছে আর ছুটছে তার প্রয়োজন কতটুকু?

আমি এসেছি বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের একটি থেকে, এসেছি বিশ্বের সমৃদ্ধ ও সবচেয়ে শক্তিশালী দেশে। এই আগমন ধারাবাহিক বিকাশ নয়, উল্লম্ফন। তাল মেলানো তাই হয়ে ওঠে না।

এখানে জীবন ঠাসা খাদ্যে, বিনোদনে, বিজ্ঞাপণে আর উদ্বেগে। যুক্তরাষ্ট্র দরিদ্র নয়, কিন্তু দেশের ভেতর দরিদ্র অসংখ্য। এখানকার দরিদ্রদের কষ্ট আমাদের দরিদ্রদের চেয়ে কম নয়। কষ্টের আলাদা কোনো মাতৃভাষা নেই। প্রবল তুষার ঝড়ের সময়ও, প্রচণ্ড শীত ও বাতাসে যখন হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দেয়, তখনো বাসের জন্য মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা। দুর্যোগ যত বাড়ে বাসের সংখ্যা কমে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলেও অনুযোগ নেই। বাসস্ট্যান্ডে ঘন্টা খানেক দাঁড়িয়ে থাকার পর দেখা গেল এক সঙ্গে দু'টো তিনটে বাস এসে গেছে। এ নিয়েও প্রশ্ন নেই, হৈ চৈ নেই। সিস্টেম নামের কলের দম দেওয়া পুতুল যেন এক একজন।

যাদের কাজ সকাল ৬/৭টা থেকে, কিন্তু যেতে হয় দেড় দু'ঘণ্টার পথ – দুর্যোগের সময় তাদের কষ্টের অন্ত নেই। উঠতে হয় ভোর চারটায়, খেয়ে না খেয়ে ছুটতে হয় বৃষ্টি-বরফ-বাতাস-শীত ঠেলে। তখন তুলনা করতে ইচ্ছে হয়, বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকরা কি এদের চেয়েও অসুখী? এখানে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ ঘটেছে। বিজ্ঞান মানুষের বিশ্রাম না বাড়িয়ে বা বাড়িয়ে চলেছে বেকারত্ব। যুক্তরাষ্ট্রে এখন প্রায় ৭ শতাংশ বেকার। যাদের কাজ আছে, তাদের বড় অংশও সবসময় উদ্বেগে থাকে কখন

কাজটি চলে যায়, কখন আবার কাজের 'আওয়ার' কমে যায়। কর্মহীনতাকে তাদের বড় ভয়।

অধিকাংশ মানুষই বিশ্রামের সময় যেটুকু পায় তার বেশির ভাগ চলে যায় বিজ্ঞাপণ পড়তে পড়তে। ঘরে ঘরে আসে বিজ্ঞাপনের বাণ্ডিল, মূল্য হ্রাসের বাণ্ডিল। গরিবেরও জীবনযাপনে এত বেশি দ্রব্য লাগে যে, বিজ্ঞাপন তাদের বিশ্রাম ও সৃজনীশক্তি মুড়িয়ে ফেলে। এর থেকে নিস্তার নেই। সবাই ছুটছে আর ছুটছে। আবার এরাই বেশি পড়ছে, জীবন-জগৎকে দিচ্ছে নানা মহার্ঘ আবিষ্কার।

আমার অনুভবগুলোই নতুন করে পেলাম অরুন্ধতী রায়ের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক গ্রন্থ 'দ্য শেপ অব দ্যা বিস্ট'-এ। নিউ ইয়র্কে এসে, থেকে ও দেখে তিনি বলেছেন, I have't got used to doors that open on their own when you stand infront of them, or looking at this Suparmarkets stuffed with goods. But when I am here. I have to say that I don't necessarily fat, "oh, look how much they have and how little we have". Because I think Americans themselves pay such a terribb price .... I don't really have to come first inclass. I don't really have to be the highest crner in my little town." These are so many happiness that come from just loving and companionship and even losing.

নিউ ইয়র্ক, মার্চ ২০১১

সাত শ' কোটিতম শিশুদের কানে কানে...

পৃথিবীর সাতশ' কোটিতম শিশুটি আমরা পেয়ে গেছি। সে জন্মেছে ভারতের লক্ষ্ণৌতে। তার নাম নার্গিস। মায়ের নাম বিনীতা। বাবার নাম অজয়। জাতিসংঘের সংশিষ্ট দফতর আগেই জানিয়ে রেখেছিল ৩১ অক্টোবর জন্ম নেয়া যেকোনো শিশু ৭শ' কোটিতম শিশু বলে গণ্য হতে পারে। এদিকে বাংলাদেশ, গ্রিস, ফিলিপাইন দাবি করছে যে সে-সব দেশে সে-সময় জন্ম নেয়া শিশু সেই কাঙ্ক্ষিত শিশু। নার্গিসকে বেছে নেয়ার কারণ জাতিসংঘের ভাষায় 'কন্যা শিশু বা ভ্রূণ হত্যার বিষয় নিয়ে সচেতনা সৃষ্টি'র জন্য।

কথাটি মোলায়েমভাবে বলা হয়েছে। আসলে পৃথিবীর কিছু দেশে, বিশেষ করে ভারতে কন্যা শিশু অনেকের কাছেই অনাকাঙ্ক্ষিত। বিজ্ঞানের বদৌলতে সম্প্রতি গর্ভে থাকতেই শিশুর লিঙ্গ পরিচয় সনাক্ত করা যায় বলে কন্যা গ্রহণে অনিচ্ছুকরা সে ভ্রূণকে হত্যা করে মায়ের গর্ভেই। আমরা বাল্যকালে এক রচনায় পড়তাম, 'একদা আরবের লোকেরা কন্যা শিশুকে জীবিত কবর দিত। সেই আইয়ামে জাহিলিয়াতের নব্য সংস্করণ চলছে এখন কিছু দেশে। এ সম্পর্কে ভারতের প্লান ইন্টারন্যাশনালের নির্বাহী পরিচালক ভাগ্যশ্রী ডেঙ্গেল বলেছেন, এ অঞ্চলের লাখো কন্যা শিশু আলোর মুখ দেখে না।' শুধু ভারত নয়, চীনসহ আরো কিছু দেশে সম্প্রতি ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে কন্যা ভ্রূণ হত্যা। সে-সব ফাঁড়া কাটিয়ে, পৃথিবীর দেশে দেশে সপ্তকোটিতম যেসব শিশু জন্ম নিয়েছে, আলোর মুখ দেখেছে তাদের সবাইকে এই মানবগ্রহে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

হে সপ্তকোটিতম শিশুরা, আমরা তোমাদের অগ্রবাহিনী হিসেবে তোমাদের কানে কানে কয়েকটি কথা বলে রাখতে চাই যাতে এখানে এসেই হোঁচট না খাও। তোমাদের জানিয়ে রাখতে চাই যে, তোমাদের জন্মের সময়টি পৃথিবীর একই সঙ্গে চূড়ান্ত শুভ ও অশুভ সময়। তোমাদের সময়টি সম্পদে-জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-প্রযুক্তিতে পৃথিবী খুবই সমৃদ্ধ। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এতো সম্পদ আর কখনো দেখা যায়নি। কিন্তু পাশাপাশি এই তথ্যটি তোমাদের না জানালে নয় যে, পৃথিবীতে মানুষে মানুষে এমন প্রবল পার্থক্যও কখনো আর দেখা যায়নি। মানুষকে হত্যার জন্য মানুষের দ্বারা এমন মারণাস্ত্র তৈরির নজিরও আগে দেখা যায়নি। সারা পৃথিবীকে ১৫ বার ধ্বংস করার ক্ষমতা এখন যুদ্ধবাজ মানুষের হাতে।

তোমরা জেনে রাখো, বর্ণের নামে, ধর্মের নামে, জাতীয়তার নামে এবং অহংবোধের কারণে কোটি কোটি মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে। গত শতাব্দীর দু'টি

বিশ্বযুদ্ধেই হতাহত হয়েছে ছয় কোটি মানুষ। কোটি কোটি মানুষ হয়েছে ছিন্নমূল। বিরাণ হয়ে গেছে কত না ভূমি। সে যুদ্ধ শেষ হলেও অন্য রঙে, অন্য বর্ণে যুদ্ধ এখনো চলছে। কিছু সংখ্যক মানুষের লোভ ও জিঘাংসার কারণে চলছে সে-সব যুদ্ধ। সেই কিছু সংখ্যকরাই দুনিয়াটা চালাচ্ছে - শাসনের গায়ে নানা প্রলেপ দিয়ে। মানুষের সাথে মানুষের সীমাহীন বৈষম্যও সেই কিছু সংখ্যক মানুষেরই কারণে। গত সপ্তাহেই জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন পৃথিবীর বিখ্যাত সাপ্তাহিক টাইম ম্যাগাজিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বিশ্বে পর্যাপ্ত খাদ্য থাকা সত্ত্বেও এখনো রাতে একশ' কোটি মানুষ না খেয়ে থাকে। ভেবে দেখ, কি ভয়ঙ্কর অবস্থা। অথচ আজ থেকে দু'শ' সাত বছর আগে সারা পৃথিবীর জনসংখ্যাই ছিল মাত্র একশ' কোটি।

দেশে দেশে মানুষের সাথে মানুষের বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদও চলছে। কারণ, পৃথিবীতে সংবেদনশীল ও সৃজনশীল সংগ্রামী মানুষের সংখ্যাই বেশি। তারাই ইতিহাসের নিয়ামক শক্তি। তারাই রচনা করে কালজয়ী ইতিহাস। অপশক্তিরা স্থান পায় ইতিহাসের কালো অধ্যায়ে। তোমরা জেনে আশ্বস্ত হবে যে, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী যে দেশ, বৈষম্য যেখানে সবচেয়ে বেশি মাস দেড়েক আগে সেখানে শুরু হয়েছে এক আলোকময় আন্দোলন। তাদের আন্দোলন শতকরা এক শতাংশের বিরুদ্ধে নিরানব্বই শতাংশের আন্দোলন। আন্দোলনের আলো ছড়িয়ে পড়েছি সারা বিশ্বে। প্রতিটি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সংগ্রামী সম্ভাবনাময় মানুষেরা অগ্রসর হয়। সংগ্রাম কখনো পেছনের দিকে যায় না। এই নিরানব্বই শতাংশের আন্দোলনও একদিন না একদিন অবশ্যই সফল হবে। একদিন বৈষম্যের অবসান ঘটবে কিংবা নিদেন পক্ষে অনেক কমে আসবে মানুষের সাথে মানুষের বৈষম্য। একদিন যুদ্ধ নামক মানব সভ্যতার চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতার অবসান ঘটবে। কারণ যে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান নিকট অতীতে ইরাকে নিরর্থক যুদ্ধ লাগিয়েছেন ভুল তথ্যের ওপর, দেশেও প্রবল আওয়াজ ওঠেছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তারা দাবি জানাচ্ছে, Stop the next war now', 'Not buying war, grieb remains unsold.

২০০৩ সালে এই যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা পৃথিবীর এক কোটি বিশ লাখ মানুষ ছয়শ' নগরে-শহরে নেমে আসে যুদ্ধের বিরুদ্ধে। শান্তির পক্ষে। সেই মিছিলে যুদ্ধে সন্তান হারানো এক পিতা যে প্লাকার্ড বহন করছিলেন তাতে লেখা ছিল Gearge Bush lied, my son died যুদ্ধবিরোধী ন্যান্সি ল্যাজিন লিখেছেন, 'Base on lie a war should never been happened, not one more day, not one more dime, not one more life, not one morelie - end the occupation, bring the troops home now...'

এইসব আন্দোলনই ইতিহাসের সম্ভাবনাময় আন্দোলন। এইসব মানুষেরাই ইতিহাসের সম্ভাবনাময় মানুষ, সমকালের শ্রেষ্ঠ মানুষ, তোমরা আসো, ওদের সঙ্গেও পরিচয় হবে তোমাদের।

বাংলাভাষার এক কবি দুর্দশাগ্রস্ত পরাধীন দেশে জন্ম নেয়ার পর মুহূর্ত সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি, জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি।' কিন্তু ক্ষোভ নিয়েই তিনি বসে থাকেন নি। ছাড়পত্রে লিখেছেন,

'চলে যাব তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।'

তিনি সেই সংগ্রামের সূচনা করে গেছেন। সেই স্বপ্ন বহন করে চলেছে পরের প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম। হে, নবাগত শিশুরা, এখানে যেমন আনন্দ আছে তেমনি আছে দুঃখও। হতাশার পাশাপাশি আছে স্বপ্নও। সব মিলিয়েই জীবন সুন্দর এবং প্রয়োজনীয়। বিপর্যয় ও সম্ভাবনার দেশকাল নেই, আলাদা মাতৃভাষা নেই। সারা পৃথিবীতেই তাদের অস্তিত্ব– অবয়ব অভিন্ন। তোমরা যখন আরো বড় হবে, তখন সুকান্তের মতো জার্মান কবি-নাট্যকার বের্টল্ড ব্রেশট-এর নানা সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে পরিচিত হবে। তিনি প্রথমে লিখেছেন হতাশার কথা, 'আমার সময়ে রাস্তাগুলো শেষ হয়েছে চোরাবালিতে / ভাষণ আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে কসাইখানার দিকে...।

তারপর পরই তিনি আবার লিখেছেন 'কিন্তু আমাকে ছাড়া শাসকরা আরো নিরাপদ থাকত / এটাই ছিল আমার আশা / এভাবেই ফুরিয়ে গেছে সময় / এই পৃথিবীতে যেটুকু আমার জন্য বরাদ্দ ছিল।'

নিউ ইয়র্ক, অক্টোবর ২০১৩

বই নিয়ে কথা আছে বৈকি

হাইস্কুলে পড়ার সময় একদিন দেখলাম ঢাকার বলাকা সিনেমা হলের পাশের বিশাল বইয়ের দোকানটি জুতোর দোকান হয়ে গেল। এটি ছিল একটি অভিজাত বইয়ের দোকান। তখন আমি বই না কিনে ভাড়া নিতাম। নিউমার্কেটের উত্তর-পশ্চিম দিকের ফুটপাতে একজন চট বিছিয়ে বই বেচতেন, ভাড়াও দিতেন। দস্যু বাহরাম, বনহুর, কুয়াশাসহ নীহার-নিমাইদের লেখা বই। দুই দিনের জন্য চার আনা।

বলাকার অভিজাত দোকানের খরিদ্দার না হলেও মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সেদিনই প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম, পণ্য হিসেবে বই খুবই দুর্বল। 'লক্ষ্মী' এসে হাঁক দিলেই 'সরস্বতি' গুটিয়ে নেয় নিজেকে। একটি দোকানে বইকে হটিয়ে জুতোর আগমন বইকে জুতো-পেটা করার মতোই অপমানজনক মনে হয়েছিল।

বহু বছর পর আমেরিকা এসেও দেখলাম প্রায় অভিন্ন ঘটনা। বন্ধুবর লেখক-সাংবাদিক কাউসার খানের ফ্লোরিডার বাড়িতে বেড়াতে গেলাম ২০১১ সালের গোড়ার দিকে। কাউসারও খুব পড়ুয়া, বইয়ের খোঁজখবর রাখে। বই কেনে সানসিটির একটি বিশাল মলের বইয়ের দোকান থেকে। খুব গল্প করলো দোকানটি নিয়ে। আমাকে নিয়ে গেল দেখাতে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম মন্দার কারণে দোকানটি এরমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। আরো দেখলাম, দোকানের প্রায়ান্ধকার বারান্দার মতো কাউসারের মুখের আলোও নিভে গেছে। বই সবখানেই পিছু হটে। পুঁজি এভাবেই 'মাহাত্ম্য' ঘোচায় 'সম্মানিত' পণ্যেরও। পুঁজির কাছে সব জায়গাই বাজার এবং সব কিছুই পণ্য। মার্ক্সের সাবধান বাণীও মনকে প্রবোধ দিতে পারে না অনেক সময়।

মন্দা, নৈরাজ্য, দুর্ভিক্ষ, সামরিক শাসন, এমন কি 'গণতান্ত্রিক আমলের' রাজনৈতিক সংঘাতে প্রথম আক্রান্ত হয় সরস্বতির বরপুত্র বই– সৃজনশীল বই। অবশ্য গাইড বই নোট বই টিকে থাকে, টিকে থাকে অপগ্রন্থও। সমস্যা সৃজনশীলের।

বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর ১০টি সম্ভাবনাময় দেশের একটি। প্রবৃদ্ধি আকর্ষণীয়, মাথাপিছু আয় প্রায় বার'শ ডলার। অনেক সূচকে প্রতিবেশীদের ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু সেই তুলনায় বইয়ের ক্রেতা-পাঠক বাড়েনি।

ক্রয় ক্ষমতায় বাংলাদেশের শহুরে মধ্যবিত্তরা পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্তদের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকলেও বই ও ভ্রমণে অনেক পিছিয়ে। কলকাতা বইমেলায় যারা গেছেন তারা অবশ্যই হতাশা প্রকাশ করবেন বই কেনায় আমাদের দৈন্যদশা দেখে– বাংলা একাডেমির বইমেলা নিয়ে আমরা যতই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি না কেন। আমার সুযোগ হয়েছিল তেহরান বইমেলায় অংশ নেয়ার। পরিবার-পরিজন নিয়ে লোকজন

আসে। যাবার সময় সবার দু'হাত ভর্তি বইয়ের ব্যাগে। শিশুদের হাতেও বইয়ের ব্যাগ। সুযোগ হয়েছিল আসাম বই মেলায় অংশ নেয়ার। সামর্থ ও সংখ্যার হিসেব বিবেচনায় আনলে অসমীয়দের বইপ্রীতিও ঈর্ষণীয়। তারা ঢাকঢোল বেশি পেটায় না কিন্তু এসব মেলার অন্তর্নিহিত শক্তি-প্রেরণা অনেক বেশি।

বাংলা একাডেমির বইমেলা আমাদের অনেক আবেগের সঙ্গে জড়িত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে বলে জমে খুবই ভালো। কিন্তু বেচাকেনা হয় তুলনামূলকভাবে কম। বইমেলায় আসা লোকজনের অর্ধেকে বই কিনলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস হতো অন্যরকম। বাংলাদেশের মধ্যবিত্তদের অতিক্ষুদ্র অংশই বইয়ের জন্য তাদের সংসারে জায়গা ও বাজেট রাখেন। বহু পরিবারে এখনো সৃজনশীল বই মানে 'আউট' বই। তাই আমাদের মধ্যবিত্তদের মূলধারার অনেক সংসারে 'ইন' করতে পারছে না বই। এই অচলায়তন ভাঙার কোনো আশাও দেখা যাচ্ছে না।

আমরা প্রায়ই গ্রাম পাঠাগার, পারিবারিক পাঠাগার প্রভৃতির স্লোগান শুনি। কিন্তু কিছুদিন পরেই খেই হারিয়ে যায়। বাংলাদেশে মধ্যবিত্তদের ঘরে টিভি-ফ্রিজ-ওভেন সব আছে কিন্তু বই নেই বহু গৃহে। উচ্চবিত্তদের বড় অংশ গাড়ি-বাড়ি-বাগান বাড়ির পাশাপাশি আজকাল টিভি চ্যানেল, রেডিও চ্যানেলের মালিক হওয়ার চেষ্টাও করছেন। বই! কদাচ উপস্থিত ও ক্রয় করতে দেখা যায়। পারিবারিক পাঠাগার আলোকিত পরিবারের প্রতিচ্ছবি হলেও দেখা যায় এই বই-প্রতিবন্ধীরা উজ্জ্বল আলোর ভেতরেও অন্ধকারে ডুবে থাকেন। তাই তাদের মনের অন্ধকার যায় না। অনেকের সন্তানকে গ্রাস করে মাদক, সন্ত্রাস প্রভৃতি। এদের বইয়ের নেশা ধরিয়ে দেওয়া গেলে ইতিহাস হতো অন্যরকম। কিন্তু তাদের অভিভাবকদের সে সময় নেই। যে-ঘরে আলোকিত বই আছে, পিতামাতা বই পড়েন, তাদের সন্তানরাও বইমুখি হতে বাধ্য। বইমুখিদের সন্ত্রাসী-মাদকাসক্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক কম। কোনো গবেষক যদি এমন একটা গবেষণা করেন; সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ঘুষ-দুর্নীতি-প্রতারণা ইত্যাদির মাধ্যমে যারা বাংলাদেশকে অন্ধকারের দিকে নিতে চায় তাদের ঘরে বইয়ের উপস্থিতি কেমন– তা হলে চমৎকার গবেষণা হবে বলে আমার বিশ্বাস।

এককালে পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপন করার আগে গোপনে খোঁজ নেয়ার চেষ্টা হতো, সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যরা বই পড়েন কি না, ঘরে বই আছে কি না, সাংস্কৃতিক ভাবে উন্নত কি না। আজকাল অন্য কিছু দেখেন। বইয়ের অবস্থা হয়েছে বড় লোকের গরিব আত্মীয়ের মতো।

আগে হাইস্কুল-কলেজে আলাদা লাইব্রেরি ছিল, একজন শিক্ষক লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্ব পালন করতেন। দিনে দিনে এটা বড় আকার পাওয়ার চেয়ে আরো সংকুচিত হয়েছে। সরকার কিছু বই কিনে নানা লাইব্রেরিতে পাঠানোর একটা প্রথা গড়ে উঠেছিল, কিন্তু দলমন্যতা এটাকে লাটে তুলেছে। মাথাব্যথা সারানোর পরিবর্তে মাথা কেটে ফেলা হয়েছে।

সুস্থ পরিবেশে আগের ক্রয় ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। রাস্তা বের করা যেতে পারে বইকে দলীয় লুণ্ঠনের বাইরে রাখার প্রক্রিয়া নিয়ে। কিন্তু কোনো ভাবেই সরকারি উদ্যোগে বই কেনা বন্ধ করা উচিত নয়। তা হলে ভবিষ্যতে আরো বন্ধ্যা সরকারেরই জন্ম হবে।

বই নিয়ে সৈয়দ মুজতবা আলীর অনেক সরেস রচনা-ব্যঙ্গের কথা আমরা জানি। সেই আবহ থেকে খুব একটা উন্নতি আমাদের হয়নি। অথচ বইকে উপেক্ষা করে কোনো জাতি বড় হতে পারেনি। ঘুরে ফিরে বইয়ের কাছে যেতেই হবে– হোক সেটা প্রিন্ট বা ইলেকট্রোনিক ভার্সন। বইকে উপেক্ষা করা শুধু ভুল নয়, অপরাধ। টাইম মেশিন ছবিতে একাট ধ্রুপদী উদাহরণ আছে। টাইম মেশিনে চড়ে নায়ক ভবিষ্যতের এক দেশে গিয়ে দেখতে পান সেখানে কোনো কিছুরই অভাব নেই। জন্তু বিশেষ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে। একজনের প্রতি আরেকজনের কোনো দায়িত্ব বা মায়া-মমতা নেই। নদীর পাড়ে একজনকে কুমিরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, অন্যরা নির্বিকার। নায়ক খুব মর্মাহত ও বিস্মিত হন। কিন্তু নায়ক যখন এক পাঠাগারে গিয়ে দেখেন বইয়ের ওপর বিরাট ধুলোর আস্তর, শত শত বছর ধরে কেউ বই স্পর্শ করেনি, বই হাতে নেয়ার পর ঝরঝর করে পড়ে গেল, তখন চিৎকার করে গালাগাল করতে লাগলেন সবাইকে। সব সহ্য হলেও বইয়ের অবমাননা তার সহ্য হয়নি। আর, বইকে উপেক্ষা করায়ই সেই দেশের ও কালের মানুষের চরম অধপতন হয়েছিল। ক্লিওপেট্রা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে তিরস্কার করে ছিলেন জুলিয়াস সিজারকে, সিজারের সৈন্যরা মিশরের পাঠাগারের একাংশ ধ্বংস করেছিল বলে। সিজার মাথা নুইয়ে অপবাদ সহ্য করেন। নালন্দা-বিক্রমশীল পাঠাগার বা বাগদাদের পাঠাগার ধ্বংসকারীরা যেমন ইতিহাসের ঘৃণা থেকে রেহাই পায়নি তেমনি নব্যযুগের বই প্রতিবন্ধীরাও ইতিহাসে সমালোচিত হবে সন্দেহ নেই। বই প্রতিবন্ধীদের হাত থেকে রক্ষা পেতে সামাজিক আন্দোলনের বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের বর্তমান সমস্যার টেকসই সমাধানের জন্য দরকার চিন্তার রাজ্য ব্যাপক আলোড়ন ও আন্দোলন। কিন্তু তার আগে দরকার আলোকিত বই, তার প্রকাশ এবং ব্যাপক প্রচার। প্রয়োজন বই-বান্ধব পরিবেশ। দরকার সেই বই, যা মানুষকে আলোকিত করে। হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, পৃথিবীতে বইয়ের মতো বহু বস্তু আছে যেসব বই নয়। এগুলো পোড়ালো কিছু আলো পাওয়া যাবে, ভেতরে আলো নেই। অপগ্রন্থ পৃথিবীর সব দেশেই আছে। আলোকিত গ্রন্থ মূলধারা ও সর্বব্যাপী হয়ে উঠলে অপগ্রন্থ ক্ষতি তেমন করতে পারে না। আলোকিত গ্রন্থই চিনিয়ে দেয় সব ধরনের অন্ধকারকে।

আবার কিছু-কিছু বই আরো একটি বড় ক্ষেত্রেও আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের বড় অবলম্বন হতে পারে। বয়স ও সময়ের ফিতায় মাপলে আমাদের জীবন খুবই ছোট। তবে এই জীবনকে আমরা আগে-পিছে অনেকটাই সম্প্রসারণ করতে পারি। বিদ্যমান জীবনেই আমরা অতীতে চলে যেতে পারি ইতিহাস, ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস, ঐতিহাসিক চিঠি ইত্যাদির ডানায় ভর করে। আবার দূর-সুদূরের ভবিষ্যতে চলে যেতে পারি কল্পবিজ্ঞান বা সায়েন্সফিকশনের রথে চড়ে। আজ যা কল্পবিজ্ঞান কাল তা বাস্তব হয়ে আসে– এত বহুল প্রমাণিত। 'হিস্টোরি রিপিট ইটসেল্‌ফ'– এটাওতো মানব সভ্যতারই আপ্তবাক্য। এখানে রথ-ডানা সবইতো বই। এই সুযোগ আমরা হারাই কেন। তাই, সহৃদয় ও আন্তরিক কামনা, বই-প্রতিবন্ধী সংসারগুলোকেও ফিরে আসুক বই-বান্ধব পরিবেশ। সদা-সর্বদা অভিভাবকের ছড়ি না ঘুড়িয়ে কিছুটা দায়িত্ব আমরা বইয়ের ওপর ছেড়ে দিতে পারি বৈকি!

৩০ মে ২০১৪

উন্মুল আবহে গ্রন্থ-বান্ধবদের সংগ্রাম

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের বই বিক্রি বাড়ানোর জন্য যারা কাজ করে চলেছেন তাঁদের অন্যতম একজন বিদ্যাপ্রকাশের মজিবর রহমান খোকা। প্রশান্ত মহাসাগর-উপকূলের শহরে থাকেন বলেই হয়তো তাঁর ধৈর্যের কমতি নেই। লজএঞ্জেলেসে বাংলাদেশিদের যে-কোনো অনুষ্ঠানে একটা বইয়ের স্টল দেয়ার জন্য সব সময় তক্কে তক্কে থাকেন। কখনো সুযোগ পান, কখনো পান না। না পেলেও নিরাশ হন না। এখন মেতে আছেন লজএঞ্জেলেসে অনুষ্ঠেয় গ্রন্থ উৎসব নিয়ে। অন্যদেরও মাতানোর চেষ্টা করছেন। তাঁর লক্ষ্যটা পরিষ্কার এবং সম্মানের। তাঁর ধৈর্যপূর্ণ প্রয়াস স্মরণ করিয়ে দেয় বাংলা একাডেমির চত্বরে চট বিছিয়ে বইয়ের দোকান সাজিয়ে বইমেলার সূচনা করা প্রয়াত চিত্তরঞ্জন সাহাকে। চিত্তরঞ্জন সাহার নিকটাত্মীয় ও অনুসারী বিশ্বজিত সাহা যুক্তরাষ্ট্রে বাংলা বই বিক্রির প্রসারে অনেক দিন ধরে কাজ করে যাচ্ছেন। তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন আমাদের মজিবর রহমান খোকা ভাই। দুই বই-বান্ধব তাদের যুদ্ধে জয়ী হোক, এই কামনা করি।

যুক্তরাষ্ট্রে আমি প্রায় চার বছর ধরে। বাংলাদেশের বইয়ের বেচাকেনার অবস্থা দেখে হতাশও। কারণটা বলি। আমি যে পত্রিকায় কাজ করি, সাপ্তাহিক আজকাল, সেটি নিউ ইয়র্কে বহুল-প্রচারিত, আলোচিত ও পাঠক নন্দিত। গত জুনে নিউ ইয়র্কে মুক্তধারা আয়োজিত বই মেলার বেশ আগে থেকে সমন্বিত-উদ্যোগে অংশগ্রহণের পাশাপাশি আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়েও বই বিক্রি কিঞ্চিত বৃদ্ধির চেষ্টা করি। সেটা ছিল, পত্রিকার প্রকাশক জাকারিয়া মাসুদ জিকোকে অনুরোধ করে বিনা পয়সায় ক্রমাগত দৃষ্টি-আকর্ষণীয় রঙিন বিজ্ঞাপন প্রকাশ, সংশ্লিষ্টদের সাক্ষাৎকার বা মেলার তথ্য অতীতের চেয়ে বেশি করে প্রচার, ফেসবুকে ব্যাপক প্রচার ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপনের ভাষা ছিল এ রকম, সুহৃদ প্রবাসী, আপনি সৌভাগ্যবান যে ইচ্ছে করলেই বই কিনতে সক্ষম। বাংলাদেশি লেখকদের বই কিনুন, বাংলাদেশের সঙ্গে থাকুন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে থাকুন। এই বই কেনা মানে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পকে সহায়তা করা, বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধতর করা। একই সঙ্গে নিজেকে আলোকিত করা। প্রিয় বাংলাদেশের স্নিগ্ধ পরশ নিয়ে অনেক বই আসছে বইমেলায়। পরিবার পরিজনসহ অংশ নিন।'

ফেসবুকে বইয়ের পক্ষে প্রচারের ভাষা ছিল এ রকম, 'পারিবারিক পাঠাগার মানে আলোকিত পরিবার। বইয়ের জন্য আপনার সংসারে একটু জায়গা ও বাজেট বরাদ্দ রাখুন। গ্রন্থের সব ধরনের বিজ্ঞাপন শেয়ার করুন।'

আমি নিজে 'বই নিয়ে কথা আছে বই কি' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখি আজকালে। নিবন্ধের অংশ বিশেষ এরকম, 'কিছু কিছু বই আরো একটি বড় ক্ষেত্রেও আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের বড় অবলম্বন হতে পারে। বয়স ও সময়ের ফিতায় মাপলে আমাদের জীবন খুবই ছোট। তবে এই জীবনকে আমরা আগে-পিছে অনেকটাই সম্প্রসারণ করতে পারি। বিদ্যমান জীবনেই আমরা অতীতে চলে যেতে পারি ইতিহাস, ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস, ঐতিহাসিক চিঠি ইত্যাদির ডানায় ভর করে। আবার দূর-সুদূরের ভবিষ্যতে চলে যেতে পারি কল্পবিজ্ঞান বা সায়েন্সফিকশনের রথে চড়ে। আজ যা কল্পবিজ্ঞান কাল তা বাস্তব হয়ে আসে– এতো বহুল প্রমাণিত। 'হিস্টোরি রিপিট ইটসেল্‌ফ'– এটাওতো মানব সভ্যতারই আপ্তবাক্য। এখানে রথ-ডানা সবইতো বই। এই সুযোগ আমরা হারাই কেন। তাই, সহৃদয় ও আন্তরিক কামনা, বই-প্রতিবন্ধী সংসারগুলোতেও ফিরে আসুক বই-বান্ধব পরিবেশ। সদা-সর্বদা অভিভাবকের ছড়ি না ঘুড়িয়ে কিছুটা দায়িত্ব আমরা বইয়ের ওপর ছেড়ে দিতে পারি বৈকি!... বই-প্রতিবন্ধীরা উজ্জ্বল আলোর ভেতরেও অন্ধকারে ডুবে থাকেন। তাদের মনের অন্ধকার যায় না। অনেকের সন্তানকে গ্রাস করে মাদক, সন্ত্রাস প্রভৃতি। এদের বইয়ের নেশা ধরিয়ে দেয়া গেলে ইতিহাস হতো অন্যরকম। কিন্তু তাদের অভিভাবকদের সে সময় নেই। যে-ঘরে আলোকিত বই আছে, পিতামাতা বই পড়েন, তাদের সন্তানরাও বইমুখি হতে বাধ্য। বইমুখিদের সন্ত্রাসী-মাদকাসক্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক কম।'

আমার নিবন্ধটিও ব্যাপকভাবে প্রচার করি ফেসবুকে। নিউইয়র্কের অন্যান্য পত্রিকাগুলোও এবার আগের চেয়ে আরো ব্যাপক প্রচার চালায় বইমেলার পক্ষে। মনে মনে আশা ছিল বেচাবিক্রি কিঞ্চিত হলেও বাড়বে। কিন্তু বই মেলায় একাকী গোপনে অনেক প্রকাশকের সঙ্গে কথা বলে মনে হলো অন্যান্য বছরের তুলনায় বিক্রি বাড়েনি, প্রায় একই অবস্থা। এ দেখে একটা হতাশা কাজ করতে থাকে আমার মধ্যে, যার জের এখনো চলছে।

কিন্তু আমি এও জানি, আজ যারা এদেশে বই বিক্রি বাড়াতে নিরলস সংগ্রাম করে যাচ্ছেন তাঁরা একদিন অবশ্যই সফল হবেন। তাঁরা আমার মতো এতো অধৈর্য-অলস নন। তাদের ধৈর্যের ভাণ্ডার পূর্ণ থাকুক, জীবনী শক্তি অটুট থাকুক – এই কামনা করি।

নিউ ইয়র্ক, ১২ অক্টোবর ২০১৪

একটি নাটক ও দুই দিকপাল

১৯৮৯ সালের মধ্যভাগের এক দুপুরে প্রখ্যাত টিভি-ব্যক্তিত্ব আতিকুল হক চৌধুরী তাঁর মুখোমুখি উপবিষ্ট আমাকে বললেন, স্ক্রিপ্ট পছন্দ হয়েছে। নায়কের চরিত্রে শক্তিমান অভিনেতা প্রয়োজন। আপনি কাকে প্রেফার করেন?

আমি জীবনের প্রথম টিভি নাটকের নায়ক নির্বাচনে মতামত দিতে পারবো, এতোটা ভাবিনি। সুযোগ পেয়ে দুরু-দুরু বুকে বললাম, হুমায়ুন ফরীদি হলে ভালো হয়। আতিকুল হক চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বললেন, এক্জাক্টলি। আমিও তাই ভাবছিলাম।

নাটকের নাম চানমিয়ার নেগেটিভ-পজিটিভ। নায়কের চরিত্র ছিল একজন ছিঁচকে চোরের, যে নানা কারণে চুরি ছেড়ে দিলেও কাউকে তা বিশ্বাস করাতে পারছিল না– 'কালো খাতা' থেকে নাম কাটাতে পারছিল না। এ অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এবং এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা চানমিয়াকে ধরে চরম শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। চানমিয়া অনেক বলে-কয়ে জীবন রক্ষা পাওয়ার পর তিনি জীবন দেশের কাজে উৎসর্গের সিদ্ধান্ত নেন। মুক্তিযুদ্ধে বেশ বীরত্বপূর্ণ ভূমিকাও রাখেন। কিন্তু স্বাধীন দেশে সুস্থ জীবন ফিরে পাননি। বড় চোরেরা তখন গিলে খাচ্ছে ছোট চোরদের– অর্থাৎ মাৎস্যন্যায়।

নায়ক সম্পর্কে মতামত দিয়ে সেই যে এলাম, নাটক প্রচার পর্যন্ত যাওয়া হয়নি। অনেকে রিহার্সাল দেখতে যান, এডিটিং দেখতে যান। এই নাটকের ক্ষেত্রে আমার তাও যাওয়া হয়নি। কারণ ছিল দু'টি; এক, স্ক্রিপ্ট তুলে দিয়েছি আতিকুল হক চৌধুরীর হাতে, মূলচরিত্র করবেন ফরীদি, আমি গিয়ে কি করব? দুই, সন্দিহান ছিলাম, নাটক ফ্লপ করে কি না, বেশি লোক হাসিয়ে লাভ কি? নীরবেই চলে যাক।

পর্দায় নাটক দেখে চমকে উঠলাম। আমি নায়ককে যেভাবে কল্পনা করেছিলাম ফরীদির অভিনয় তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি জীবন-ঘেঁষা ও সপ্রতিভ। বিস্মিত শুধু আমি হইনি, দর্শক-শ্রোতা-নাট্যমোদী সবাই হয়েছেন। তখন বিটিভি-ই ছিল একমাত্র ভরসা। সপ্তাহের নাটক নিয়ে সারা সপ্তাহ আলোচনা হতো। প্রশংসার শেষ ছিল না। বহুবার এ নাটক দেখানো হয়েছে 'মনের মুকুর'-এ। এই কৃতিত্ব আমার চেয়ে বেশি হুমায়ুন ফরীদির অভিনয় ও আতিকুল হক চৌধুরীর নির্মাণ-কৌশলের। পরবর্তীকালে আমার অন্যান্য নাটকের তরুণ অনেক অভিনেতা আমাকে বলেছেন, সেই নাটকে হুমায়ুন ফরীদির অভিনয়-অনুসরণ ছিল তাদের পাঠ্যতালিকার মতো– বিশেষ করে যাঁরা গ্রুপ থিয়েটার করতেন। তাঁদের সবার কাছে নাটকের প্রধান আকর্ষণ ছিল ফরীদির

অভিনয়। ফরীদির অসাধারণ অভিনয়ের গুণেই দেখা গেল নাটকের একটি ছিঁচকে চোরের পার্সোনালটি ও পরিব্যাপ্তির কাছে ধূলিস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে বড় বড় সব চরিত্রের ব্যক্তিদের অভিব্যক্তি। চোর ছাপিয়ে গেছে ভদ্রলোকদের।

পরদিন আতিকুল হক চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে দু'টো ভালো খবর পেলাম। এক, চরিত্রটি ফরীদির বেশ পছন্দ হয়েছিল বলে বেশি করে একাত্ম হতে পেরেছেন। দুই. চানমিয়ার নেগেটিভ-পজিটিভ-এর জন্য আতিকুল হক চৌধুরীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন আবদুল্লাহ আল মামুন। তখনকার সময় ও পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় নিলে এটি ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ, বিটিভি-র ভেতরে তখন অনেক দ্বীপ-উপদ্বীপ।

আতিকুল হক চৌধুরী বললেন, মুসা, স্ক্রিপ্ট বেশি কাটাকুটির বদনাম আমার আছে, কিন্তু আপনার একটি সংলাপও ফেলিনি। কারণ, আমার কাছে মনে হয়েছে, ইউ আর সান অব দ্য সোয়েল। সংলাপগুলো ছিল খুবই মাটি ও জীবনের কাছাকাছি।

ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও হুমায়ুন ফরীদির সঙ্গে যোগাযোগ করিনি, ঘনিষ্ঠতা নেই বলে। করা যে উচিত ছিল পরে তা বুঝেছি।

এরপর আমি বহু নাটক-সিরিয়াল লিখেছি, কিন্তু চানমিয়ার নেগেটিভ-পজিটিভ-এর মতো কোনো চরিত্র নির্মাণ করতে পারিনি, ফরীদির মতো অভিনেতাও পাইনি। এমন কি, বলতে দ্বিধা নেই, ঐ রকম ভালো নাটকও আমি আর লিখতে পারিনি। নাটক প্রচারের প্রায় একযুগ পর দৈনিক বাংলার সিঁড়িতে উঠতে-উঠতে হঠাৎ দেখা পাওয়া আতিকুল হক চৌধুরী বললেন, কি অপূর্ব নাটক ছিল আপনার? কি অপূর্ব অভিনয় ছিল ফরীদির। কোনো ধ্বংসের মুহূর্তে আমাকে যদি কেউ পাঁচটি নাটক হেফাজতে রাখতে বলেন, তার একটি হবে চান মিয়ার নেগেটিভ-পজিটিভ।

হুমায়ুন ফরীদির সঙ্গে এই নাটক নিয়ে কথা হয়েছিল ১৬ বছর পর। ২০০৫ সালে আমি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল বাংলাভিশনের গোড়াপত্তনে যখন ব্যস্ত, ফরীদি আসেন বাংলাভিশনে। মুস্তাফিজুর রহমান তখন সিইও। তিনি তখন মিটিং-এ ব্যস্ত বলে ফরীদি আমার রুমে বসে অপেক্ষা করছিলেন। আলাপের এক পর্যায়ে যখন বললাম আমি সেই নাটকের নাট্যকার তখন হো হো করে জোরে হেসে বললেন, আরে মিয়া, আপনি সেই লোক! কই ছিলেন আপনে? মনে মনে কত খুঁজছি আপনাকে।

অবশ্য ফরীদির সঙ্গে আমার প্রথম সামনা-সামনি দেখা হয় সম্ভবত ১৯৮৪ সালে। শেখ নেয়ামত আলী তার দহন ছবির লোকেশনের জন্য একটি পত্রিকা অফিস খুঁজছিলেন। শিল্পী মাশুক হেলাল এ খবর জানালে মোস্তাফা জব্বারকে বলে আমাদের অফিস ব্যবহার করতে দিয়েছিলাম। আমি তখন বহুল প্রচারিত নিপুণ-এর চিফ রিপোর্টার। স্যুটিং এর দিন অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়েছিলাম ফরীদির সঙ্গে। তার মান নেই। থাকার কথাও নয়।

ফরীদি যে আমাদের কালের সবচেয়ে শক্তিমান অভিনেতাই ছিলেন তা শুধু নয়, ছিলেন শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে অজস্র পড়াশোনা করা বোদ্ধা ব্যক্তিত্ব। 'নিপুণ'-এ কাউসার খান ফরীদির একটা বড় সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। মুখোমুখি হয়েছিলেন দুই দিকপাল; একজন অভিনয় জগতের, অন্যজন চিত্র সাংবাদিকতার। এমন বুদ্ধিদীপ্ত,

মণীষাসম্পন্ন ও প্রাণবন্ত সাক্ষাৎকার খুব কমই পড়েছি। কি গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল ফরিদীর। ফরীদি আজ নেই। কাউসার খান ফ্লোরিডায়। কিন্তু সাক্ষাৎকারটি ইতিহাস হয়ে থাকবে। আমার ধারণা সেই সাক্ষাৎকার ছিল ফরীদির জীবনের শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎকার। কাউসার খানের উচিত তার সাক্ষাৎকারগুলো বই আকারে প্রকাশ করা।

ফরীদি আমার কাছে নায়ক ছিলেন আরো এক কারণে, বিয়ে করেছিলেন বেলি ফুলের মালা দিয়ে – বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে, যদিও সে ধারা পরে থেমে গিয়েছিল। বন্ধুবর মঈনুল আহসান সাবের লিখেছেন, আত্মজীবনী লেখার ইচ্ছা ছিল ফরীদির। কিন্তু পারলেন না, সময় পেলেন না। তার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল অনেক ইতিহাস, অনেক তথ্য; যেগুলো মুদ্রিত থাকলে উপকৃত হতো আমাদের শিল্প-সাহিত্যের জগত। অনুপ্রাণিত হতো নতুন প্রজন্ম। এভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে আরো কত জনের ইতিহাস। তাই ফরীদির অকাল মৃত্যু একটি শিক্ষাও দিয়ে গেছে। সময় থাকতে জীবনী লিপিবদ্ধ করে যাওয়া।

হুমায়ুন ফরীদি আজ অন্য ভুবনে যেখান থেকে কেউ ফিরে আসে না। পাখি উড়ে গেলে পড়ে থাকে পালক। ফরীদিও রেখে গেছেন অনেক পালক, অনেক স্মৃতি।

স্বপ্নের ফেরিওয়ালা এক সাংবাদিকের কথা

সাংবাদিকতা ও শিক্ষকতার মতো পেশাগুলোকে বলা হয় 'মহৎ পেশা'। কিন্তু পুঁজি 'মহৎ-পেশার' মাহাত্ম্যকে কী ভাবে গুড়িয়ে দেয় তা কার্লমার্কস বহু আগেই লিখে রেখে গেছেন। তার পরও বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে কিছু পেশাকে এখনো আলাদা চোখেই দেখা হয়। সাংবাদিকতা তার মধ্যে একটি। পাশাপাশি, যে-সব পেশা যোগ্যতা হিসেবে শিক্ষা, মেধা-মনীষা, অঙ্গীকার প্রভৃতি দাবি করে, সে-সবেরও একটি সাংবাদিকতা। দেশে দেশে সাংবাদিকতার রকমফের অনেক। বাংলাদেশে আরো বেশি। বাংলাদেশের কিছু কিছু সাংবাদিক দুনিয়ার সবকিছু সম্পর্কেই কিছু কিছু জানেন, কিন্তু কোনো কিছু সম্পর্কেই ভালোভাবে জানেন না। এদের অনেকে ম্যারাডোনাকে ফুটবল শেখান, সোফিয়া লোরেনকে শেখান অভিনয়, ডিসিকা-স্পিলবার্গকে শেখান ছবি নির্মাণ, রবিশঙ্করকে শেখান সঙ্গীত, এস এম সুলতানকে শেখান অঙ্কন কৌশল, লেখা শেখান হুমায়ূন আহমেদকে। নাজীমউদ্দীন মোস্তান সে ধরনের সাংবাদিক ছিলেন না। যা জানতেন, ভালোভাবেই জানতেন বা জানার চেষ্টা ছিল তাঁর। শুধু রেফারেন্স পড়ে কোনো বইয়ের আলোচনা করতেন না। কাউকে মুগ্ধ করার কোনো প্রবণতা তার মধ্যে দেখা যায়নি।

প্রায় দুই দশক আগে বোম্বের চিত্রনায়িকা রেখা একবার বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'সাংবাদিকরা ব্যর্থ মানুষ'। তখন খুব আহত হয়েছিলাম শুনে। বহু বছর ধরে কথাটি আমি উল্টে-পাল্টে পরীক্ষা করেছি। এখন মনে হয়, রেখার হয়তো দুর্ভাগ্য যে, কোনো প্রকৃত-আলোকিত সাংবাদিকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। তার হয়তো সময় গেছে একশ্রেণীর বিচ্ছিন্ন গড়পড়তার মাঝে, যারা অহরহ রাজা উজির মারেন, মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে সফর প্রভৃতি করেন, বড় বড় হোটেলে দাওয়াত খান, যখন তখন ফোনে হম্বিতম্বি করতে পারেন; কিন্তু নিজের ঘরে এসে মুখোমুখি হন নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের। এদের কেউ কেউ অল্প বেতন পান, কেউ কেউ সেই অল্পও নিয়মিত পান না। রাজা-উজির মারার বায়বীয় আস্ফালনের সঙ্গে বাস্তবের অসঙ্গতি তাদের হীনমন্য করে তোলে, করে তোলে এক ধরনের মনোবিকলনের শিকারও। এরা সব সময় মহীরুহের পতনের জন্য কামনা ও অপেক্ষা করেন। সুযোগ পেলেই মানুষের চরিত্র হনন করেন। আর কারো কানটি মলে দেওয়ার সুযোগ পেলেতো কথাই নেই। এদের এক অংশ অবশ্য হম্বি-তম্বির রকমফের করে ঠাটবাট বজায় রাখেন। নাজীমউদ্দিন মোস্তান এদের দলেও ছিলেন না।

সৎ সাংবাদিকরা সর্বাবস্থায় অবিচল থাকেন। দারিদ্র্য বা হুমকি কখনো বিচলিত বা হতাশ করে না তাদের। নাজীমউদ্দিন মোস্তান এদের দলে ছিলেন। ছিলেন অল্পে তুষ্ট, ছিল না হা-হুতাশ। সাংবাদিক হিসেবে, একজন মানুষ হিসেবে আলোকিত যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন প্রচণ্ড আশাবাদী। সে আলো ও আশা অন্যের মধ্যে সঞ্চার করার মহৎ গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। এমনটি এখন খুব কমই চোখে পড়ে। তাঁর কাছে আরেকটি বড় শেখার বিষয় ছিল, বিনয়। ঢাকার পল্লবীর সাংবাদিক হাউজিং সোসাইটিতে আমি ছিলাম তার প্রতিবেশী। স্ট্রোক হওয়ায় ভালো করে কথা বলতে পারতেন না। যখনই কোনো ব্যাপারে তার প্রশংসা করতে যেতাম, বা বলতাম 'এটা আপনার কাছে শিখেছি', তিনি সঙ্গে সঙ্গে জিভে কামড় দিয়ে একহাতে আমার মুখ চাপা দিতেন। এমনই বিনয়ী-লাজুক-অন্তর্মুখী ছিলেন মোস্তান ভাই। তিনি আমাদের কাছে এখন স্মৃতি মাত্র। কিন্তু বাংলাদেশে তাঁর স্মৃতিচারণ বা স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন যতটা হওয়া উচিত ছিল তার কিছুই হলো না।

এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের সময় আন্দোলনের অংশ হিসেবে একঝাঁক তরুণ সাংবাদিক সাপ্তাহিক বিচিত্রা, খবরের কাগজ, নয়া পদধ্বনি, পূর্বাভাস, ঢাকা, আগামী, দেশবন্ধু প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। আজ তাদের প্রায় সবাই প্রতিষ্ঠিত লেখক-সাংবাদিক। তখন নাজীমউদ্দিন মোস্তান ভাই আমাদের অনেকের কাছেই ছিলেন গুরুর মতো। তিনি নিজে দুই হাতে লিখতেন। ইত্তেফাকের চাকরির বাইরেও, এমন সময় গেছে, কোনো কোনো সপ্তায় তেরটি পর্যন্ত কলাম লিখেছেন। একদিন তাঁকে বললাম, মোস্তান ভাই, এতো পরিশ্রম করলে আপনিতো অসুস্থ হয়ে পড়বেন। তিনি বললেন, মোটেও না। ধরে নেন আমাদের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে এবং জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের দণ্ড হিসেবে লিখতে নির্দেশ দিয়েছে। আমি সেটাই মনে করি। আপনারাও দুই হাতে লিখুন। এই স্বৈরাচারের পতন ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে সাপ্তাহিকগুলোর ওপরই নির্ভর করতে হবে।

বস্তুত, তখনকার বাস্তবতা এমনই ছিল। প্রায় সবগুলো দৈনিক ও প্রভাবশালী সাপ্তাহিক এরশাদের অনুগত বা তার নির্যাতনের ভয়ে ভীত ছিল। তখন কিছু সাপ্তাহিকই সাহস নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। এগিয়ে এসেছিলেন তরুণেরা। কয়েকটি পত্রিকা এরশাদ সরকার নিষিদ্ধও করেছিল। এরশাদের পতন হলেও শরীর মোস্তান ভাইকে ক্ষমা করেনি। এক সময় নিজে প্রকাশ করলেন সাপ্তাহিক রাষ্ট্র। তার স্ট্রোক হওয়ার পর আমরা শুধু তার ক্ষুরধার লেখা থেকেই বঞ্চিত হলাম না, সাপ্তাহিক রাষ্ট্রের মতো একটি ভবিষ্যত-প্রসারী স্বাপ্নিক পত্রিকার প্রকাশনাও রুদ্ধ হয়ে গেল। নাজীমউদ্দিন মোস্তান দিনমজুর-সাংবাদিক ছিলেন না, ছিলেন ফেরিওয়ালা সাংবাদিক – স্বপ্ন ফেরি করতেন তিনি। আমি মোস্তান ভাইয়ের মতো একাধারে মেধাবী-সৎ-অঙ্গিকারবদ্ধ-পরিশ্রমী লেখক-সাংবাদিক আর দেখিনি।

বিরল গুণে-গুণান্বিত আমাদের কালের একজন সেরা-পথিকৃত দেশপ্রেমিক সাংবাদিক নাজীমউদ্দিন মোস্তানের মৃত্যুতে বিএনপি নেতৃবৃন্দ শোক প্রকাশ করলেও সরকার বা আওয়ামী লীগ নীরব ছিল। হতে পারে তারা 'অধিক শোকে পাথর' ছিল, কিংবা নাজীমউদ্দিন মোস্তান তাদের উচ্ছিষ্টভোগী বা কলমী-বরকন্দাজ ছিলেন না বলে,

অথবা হতে পারে নাজীমউদ্দিন মোস্তানের উচ্চতা পরিমাপের মতো কেউ 'আওয়ামী অঞ্চলে' নেই বলে এই নীরবতা। তিনি দলকানাদের ঈর্ষার শিকারও হয়ে থাকতে পারেন। ঘটনা যা-ই হোক, নাজীমউদ্দিন মোস্তান এখন সব কিছুর উর্ধ্বে। কারো হীনতা-দীনতায় তাঁর কিছু যায়-আসে না। তবে তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী ঘটনা আবার দেখিয়ে গেল, বাংলাদেশের রাজনীতিকরা কী ভাবে মানুষ থেকে অর্ধমানবে পরিণত হোন, কী ভাবে তাদের একটি চোখ সব সময় বন্ধ থাকে এবং কী ভাবে তারা জগৎ-সংগীত শোনেন একটি কান বন্ধ রেখে। চলে যেতে যেতে নাজীমউদ্দিন মোস্তান আবার সে-সব প্রমাণ করে গেলেন।

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা নাজীমউদ্দিন মোস্তানকে বেহেস্ত নসীব করুন, এই দোয়া করি।

৩০ আগস্ট ২০১৩

মুখোমুখি পর্ব

এক. আবুল কাসেম ফজলুল হকের মুখোমুখি

'শীলভদ্র-দীপঙ্করের কাল থেকে একাল পর্যন্ত বাঙালির রয়েছে জ্ঞানচর্চার ও শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির ঐতিহ্য। কিন্তু এই জ্ঞানগত ঐতিহ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক ঐতিহ্যের সংযোগ সকল কালেই ক্ষীণ। অতীতের ও বিদেশের সৃষ্টিধারা বললে অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা নিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্য চর্চায় বাংলাদেশকে একটি প্রগতিশীল ও সৃষ্টিশীল রাষ্ট্রে উন্নীত করতে হবে।'

বাংলাদেশের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, সংস্কারমনস্ক বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক উপরের দু'টি বাক্যে সংক্ষেপে বিধৃত করেছেন আমাদের সমস্যা, সম্ভাবনা এবং সমাধানের কথা। তিনি বুলিসর্বস্ব নয়, দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণ ও পরিশ্রম করে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎকালের জন্য রচনা করেছেন কিছু নির্দেশিকা-পরামর্শ। আটাশ দফার আকারে এগুলো প্রচারের জন্য গঠন করেছেন স্বদেশ চিন্তা সংঘ। তার নির্দেশনা-পরামর্শে সমস্যার পাশাপাশি সমাধনের সুস্পষ্ট রূপরেখা দেয়ায় দৃষ্টি আকর্ষণ করছে পরিবর্তনকামী মানুষের, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের। তার আটাশ দফার আরেকটি প্রধান দিক হচ্ছে বাংলাদেশের মূল ও উপরিকাঠামোর প্রতিটি ক্ষেত্র– যথা অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য সব কিছু নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আমাদের বর্তমানকালকে ব্যাখ্যা করেছেন, প্রদর্শন করেছেন ভাবীকালের স্বপ্নকেও।

প্রশ্ন : অনেকে বলেন, বর্তমান বড় দুই দল ও দুই নেত্রীর বাইরে নতুন রাজনীতির সূচনা সম্ভব নয়। আপনার পর্যবেক্ষণ কী?

উত্তর : হ্যাঁ তেমন কথা শোনা যায়। এগুলো অনেক বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীই বিশেষভাবে বলে থাকেন। এসব কথা হতাশার কথা। হতাশ লোকেরাই এসব বেশি বলেন। আমি তো লক্ষ্য করি মানুষ দুই দল বা দুই জোটের কাছে জিম্মি হয়ে থাকতে চায় না, তারা মুক্তি চায়, স্বাধীনতা চায়। ভবিষ্যতের জন্য ২৮ দফা বর্তমান ঐতিহাসিক পর্যায়ে জনগণের দাবি-দাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি নিয়েই প্রকাশিত।

প্রশ্ন : হতাশা থেকে যারা বলেন তাদের সম্পর্কে কী বলবেন?

উত্তর : এরা মানুষের সৃজনশীলতায় বিশ্বাস করে না, পরিবর্তনশীলতায় আস্থা রাখে না। তারা ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এসব বলে। তাদের ইচ্ছা ও চিন্তা বাংলাদেশে আর বেশি দিন কার্যকর থাকবে না।

প্রশ্ন : অতীতের ইতিহাসেও এদের দেখা গেছে...

উত্তর : কিন্তু ইতিহাসের গতিধারায় তাদের কর্তৃত্ব থাকে না। তারা পরিবর্তনকে বাধাই দেয়। এদের স্বপ্ন নেই, কল্পনা নেই, ভবিষ্যত ভাবনা নেই, কর্তৃত্বও নেই। এরা টিকে থাকে অন্যকে আশ্রয় করে। নিজেরা কিছু করতে পারে না।

প্রশ্ন : ২৮ দফার ব্যাপারে সাড়া কেমন পাচ্ছেন?

উত্তর : ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি, বিশেষ করে তরুণদের কাছ থেকে। সবাই নতুন দল চায়। তাদের বলি, জনগণ চাইলে অবশ্যই দল হবে। হয়তো সময় লাগবে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন, ক্ষমতাকামী এবং রাষ্ট্রঘনিষ্ঠ ক্ষমতাবহির্ভূতরা ঘুরে ফিরে ক্ষমতায় আসছে, যাচ্ছে। তারা মিলে বাংলাদেশটা কেমন চালাচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : এক কথায় দেশ ভালো চলছে না। বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে এখনো সফলভাবে গড়ে ওঠেনি। তাই জীবন এখানে বিকারগ্রস্ত। এখানে ধনী, গরিব, শিক্ষিত, নিরক্ষর জাতীয়ভাবে সবাই হীনমন্যতায় ভোগে। এগুলোকে ভালো বলার কিছু নেই। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা আছে। নেতৃত্ব গড়ে তোলা গেলে মানুষ জাগবে। জাতি এখন ঘুমন্ত অবস্থায় বলা যায়।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে আপনার ২৮ দফার প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু?

উত্তর : বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কথা ভেবেই ২৮ দফা রচনা করেছি। এটি করেছি কোনো রাজনৈতিক সংগঠন থেকে নয়– ব্যক্তিগতভাবে এবং চিন্তাশীল সংগঠন থেকে। আমার তুলে ধরা ২৮ দফা নিয়ে কেউ একটি রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারে, বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলো দফাগুলো ব্যবহার করতে পারে। সে-সব উদ্যোগ ব্যর্থ হলে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজন হবে। শেরেবাংলা একে ফজলুল হক ও মওলানা ভাসানী গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে ২১ দফা দিয়ে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। ষাটের দশকে শেখ মুজিব ৬ দফা দিয়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, সংগ্রামে পরিচালিত করেছিলেন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব পেলে ২৮ দফা দ্বারাও সেরকম ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন সম্ভব। ২৮ দফা অবলম্বন করেও কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্ব তেমনটা করতে পারে। ২৮ দফা অতীতের যেকোনো কর্মসূচির চেয়ে অনেক বেশি সমাজমনস্ক এবং সমাজের নিম্নস্তরের, মোট জনসংখ্যার ৯০ ভাগের জন্য ন্যায় ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি।

প্রশ্ন : আপনি নিজেও তো এক সময় সক্রিয় রাজনীতি করেছেন ---

উত্তর : কয়েক বছর ছাত্র রাজনীতি করেছি যদিও আশাপ্রদ কিছু পাইনি। তাছাড়া জেনারেশনেরও একটা ব্যাপার আছে। যখন আমরা কাজ করার পর্যায়ে বা বয়সে পৌঁছেছি তখন শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ৬ দফা জনগণকে জয় করে নিয়েছে। ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে ৬ দফা পরিচালিত হয়েছিল। সেজন্য পূর্ববাংলার

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে সমর্থন-সহায়তা করলেও ৬ দফায় একাত্ম হতে পারিনি। এর সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা ও ত্রুটির দিকগুলো প্রথম থেকেই সেগুলো বড় হয়ে দেখা দিতে শুরু করে। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতি সুস্থধারায় উত্তীর্ণ হয়নি। সেজন্যই আমাদেরকে নতুন করে চিন্তা করতে হচ্ছে। ২৮ দফার মাধ্যমে সেই চিন্তা ও কর্মস্পৃহাকে রূপ দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

প্রশ্ন : ২৮ দফা আপনার কতদিনের চিন্তা ও শ্রমের ফসল?

উত্তর : দীর্ঘকালের। ষাটের শুরু থেকেই একটি কর্মসূচি নিয়ে কাজ শুরু করি - ৬ দফারও আগে থেকে। তখন আমার চেতনায় হক-ভাসানীর ২১ দফার স্মৃতি জীবন্ত ছিল। আমি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার অনুসারী ছিলাম। সেই ধারা থেকে এ ধরনের কর্মসূচি আশাও করেছি। কমরেড মনিসিং, সুখেন্দু দস্তিদার, কমরেড তোহা, আবদুল হক - এদের কাছ থেকে এ ধরনের সর্বাঙ্গীন কর্মসূচি আশা করেছি। আশা করেছি মৌখিক বক্তব্যে, লেখায়, বক্তৃতায় - ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের আগে থেকেই। পরেও জাতীয় জীবনে এ ধরনের কর্মসূচি প্রত্যাশা করেছি। স্বাধীন বাংলাদেশে যারা রাজনীতি ও চিন্তার ক্ষেত্রে আমার পূর্বগামী, তাদের থেকে আশা করেছি। অনেককে অনুরোধ করেছি, যারা জাতীয় রাজনীতিতে কমবেশি সুপরিচিত ছিলেন। আমার 'সংস্কৃতি ও রাজনীতির সম্ভাবনার নব দিগন্ত' গ্রন্থে ২৮ দফাই আছে একটু ভিন্ন ভাষায়। ২০০১ সালে বাংলাবাজার পত্রিকায় চার কিস্তিতে ২৮ দফার বক্তব্য প্রকাশ করেছি। অবশেষে ২০০৪ সালের নভেম্বর মাসে ২৮ দফা বর্তমান মুদ্রিত রূপে আসে। এর পেছনে আমার অন্তত ৪০ বছরের চিন্তা আছে। প্রথমে চিন্তা ছিল অনেকটা অস্পষ্ট - অনেক সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটিমুক্ত হয়েছে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিমার্জন এবং বিকাশের ধারা ধরেই এগুতে হবে।

প্রশ্ন : দেশ বিদেশের সবশ্রেণীর বাংলাদেশী ও প্রবাসীদের কাছে ২৮ দফার বক্তব্য কীভাবে পৌঁছাবেন?

উত্তর : আপাতত মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করছি। শিগগিরই ওয়েব সাইটে যাবে। এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমি প্রবাসী বাংলাদেশি পাঠকদের অনুরোধ করছি ,২৮ দফা যদি তাদের মনঃপূত হয় তাহলে এর ব্যাপক প্রচারে সহায়তার ।

সাপ্তাহিক আজকাল, এপ্রিল ২০১১

দুই. হায়দার আকবর খান রনোর মুখোমুখি

হায়দার আকবর খান রনো বাংলাদেশের রাজনীতিতে মেধাবী, মননশীল ও প্রাজ্ঞজন বলে পরিচিত। শুধু রাজনীতিতে নয় তার সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা ও সৃজনশীলতা দেখা যায় লেখনীতেও। তার অনেকগুলো গ্রন্থের মধ্যে সম্প্রতি সাড়া জাগিয়েছে 'শতাব্দী পেরিয়ে'। আমাদের উজ্জ্বল সময় ষাটের দশক নিয়ে এতো বস্তুনিষ্ঠ ও বিস্তৃত আলোচনা আর কেউ করেননি।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র প্রবলভাবে বিরাজিত থাকার কারণে মেধা-মনীষা প্রায়-নির্বাসিত অবস্থায়। বহু প্রতিভাবান ও অঙ্গিকারবদ্ধ রাজনীতিক যেখানে গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন, ক্ষমতা ও ক্ষমতা বহির্ভূত বুর্জোয়া রাজনীতি থেকে ফায়দা লুটছেন, সেখানেও তিনি ব্যতিক্রম। অনেক চাপ-প্রলোভন উপেক্ষা করে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে এখনো আঁকড়ে ধরে আছেন বামপন্থাকে। তাঁর নিকটজনদের অনেকেও চলে গেছেন গড্ডলিকায়। কিন্তু তিনি আছেন। সম্প্রতি তিনি ওয়ার্কার্স পার্টি ছেড়ে তিনি যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে – ষাটের দশকে যে দল ভেঙে বহুধাবিভক্ত হয়েছিল। চার দশকে অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে এসেছেন রনো।

প্রশ্ন : বাম ঐক্যের স্মারক হিসেবে আপনিতো সিপিবিতে যোগ দিয়েছেন। বাম ঐক্য আশা করা যায় কি?

উত্তর : ষাটের দশকে যেসব মতভেদের কারণে আমাদের মধ্যে ভাঙন ঘটেছিল, আদর্শগত বিভক্তি দেখা দিয়েছিল, সে সবের প্রাসঙ্গিকতা এখন আর নেই। ওয়ার্কার্স পার্টি ও সিপিবি উভয় দল আলোচনার ভিত্তিতে স্ব স্ব অবস্থান থেকে সরে এসে বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। গোষ্ঠী মানসিকতা ত্যাগ করে সমাজ পরিবর্তনের মহান লক্ষ্যে ঐক্যের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আধুনিক বিশ্বে অনেক দেশের রাজনৈতিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে তারা নিজেদের ঝুলে থাকা বিভেদ আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা উল্টোটা করব কেন? বৃহত্তর স্বার্থে গোষ্ঠী মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসা দরকার।

প্রশ্ন : অনেক বামপন্থী এখন আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ঢুকে গেছেন, সেখানে স্বস্তিবোধ করছেন। বিষয়টা কী ভাবে দেখছেন?

উত্তর : আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে কমিউনিস্ট ধ্যান-ধারণার কোনো মিল নেই। কেউ কেউ জোর করে মিল বের করার চেষ্টা করছেন। এটা অপচেষ্টা এবং দুঃখজনক। আওয়ামী লীগ সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন রহস্যজনক।

প্রশ্ন : রাশেদ খান মেননের মহাজোটে অবস্থান কতোটা সঙ্গতিপূর্ণ?

উত্তর : ব্যক্তিগতভাবে মেনন দশ বছর বয়স থেকে আমার বন্ধু। সেই বন্ধুত্ব অটুট আছে। কিন্তু রাজনৈতিক বিচারে বলব মেনন ভুল করেছেন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আমি মনে করি মেনন তার ভুল বুঝতে পারবেন।

প্রশ্ন : ভারতের কমিউনিস্ট পাটির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ বাংলাদেশের সন্তান। দুই বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রায় একই সময় শুরু হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় প্রায় চার দশক ধরে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় থাকলেও বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা তেমন সুবিধা করতে পারলেন না কেন?

উত্তর : এ ব্যাপারে আমি আগেও বলেছি যে, বাংলাদেশের কমিউনিস্টদের রয়েছে ব্যাপক অপরিপক্কতা, বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের অভাব এবং প্রচুর ভ্রান্তি। দেশ ভাগের পর সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ একজনও এ দেশে আসেননি। শুধু ব্যতিক্রম ছিলেন খোকা রায়। সেই অপূর্ণতা পরবর্তীকালেও সম্প্রসারিত হয়েছে। পঞ্চাশের

রায়টের পরও হাজার হাজার কমিউনিস্ট নেতাকর্মী ভারতে চলে গেছেন। তাদের শূন্যস্থান পূরণ হয়নি।

প্রশ্ন : এক সময় ভারতের নকশাল আন্দোলন বাংলাদেশকেও প্রভাবিত করেছিল। গড়ে উঠেছিল নানা দল। এ সবের প্রভাব কী শুধুই নেতিবাচক?

উত্তর : এখানে হক-তোহা-মতিন আলাউদ্দিন-সিরাজ-সিকদার-শান্তিসেন প্রমুখ তাদের আন্দোলনে মার্ক্সবাদী শব্দ-আদর্শ ব্যবহার করেছেন বটে কিন্তু পরিণতি হয়েছে দুঃখজনক। প্রান্তিক মানুষেরা এসব আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়নি। পন্থা বিতর্কিত হয়েছে তাতে।

প্রশ্ন : যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

উত্তর : এই বিচার সবাই চায়। তবে মনে রাখতে হবে কোনো ধরনের প্রতিহিংসা চরিতার্থের কাজে যেন এই বিচার ব্যবহার না হয়। নিজস্ব দায়বোধ ও স্বচ্ছতা থেকে বিচার কাজ পরিচালনা করা উচিত।

প্রশ্ন : আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইউরোপ-আমেরিকা-এশিয়ায় এখন মার্ক্সবাদ নতুন করে তেমন প্রসার লাভ করছে না, যা করছে ল্যাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকায়। আপনার পর্যবেক্ষণ কী?

উত্তর : ধীর লয়ে হলেও বিকাশ ঘটছে সেই দুই মহাদেশে। বিশেষ করে ল্যাতিন আমেরিকায় কমিউনিস্টরা জোরদার ভূমিকা পালন করছেন। এই ভূমিতেই আমেরিকান শোষণ বেশি হয়েছে। তাই সেখানে সাম্রাজ্যবাদী স্রোত প্রবল হয়েছে। কিউবা, ভেনিজুয়েলা, ব্রাজিল, বলিভিয়া, নিকারাগুয়া আজ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন হুগো শাভেজ। তাদের কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ছে সারা দুনিয়ায়। আফ্রিকাও এগুচ্ছে ধীরে ধীরে।

প্রশ্ন : বর্তমান ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাকামী দুই দল বা জোট সম্পর্কে আপনার তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ কী?

উত্তর : বিভিন্ন লেখায়-আলোচনায় আমি সবসময় বলে আসছি যে, এখনকার ক্ষমতাসীন রাজনীতিতে এমন এক শ্রেণী প্রতিনিধিত্ব করছে যাদের অধিকাংশই লুটেরা। গণতন্ত্র বা জনগণের প্রতি এদের কোনো দায়বোধ ও শ্রদ্ধা নেই। এই লুটেরাদের কোনো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও নেই-এরা সংস্কৃতি বর্জিত। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, সংসদের ভেতর সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যরা পরস্পর যে ভাষায় খিস্তি-খেউর করেন তা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ করতে পারে না। এসব দেখে প্রশ্ন জাগে, সংসদ কী অশ্লীলতার চর্চা কেন্দ্র? নিম্ন রুচির মানুষ গিজগিজ করছে সবখানে। এই শিক্ষা-সংস্কৃতিহীনদের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ সংসদীয় রাজনীতিকে কলুষিত করে চলেছে।

প্রশ্ন : বছর খানেক আগে আপনি এক পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'বর্তমান ও অতীত মন্ত্রিসভার এককালীন বামপন্থীরা আসলে বিট্রেয়ার'। এর ব্যাখ্যা কী?

উত্তর : হ্যাঁ, আমি তাই বলেছি। আপনার প্রশ্নের জবাবে আমি আমার আগের বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করে বলতে চাই, আপনারা যাদের বামপন্থী হিসেবে দেখছেন তারা আসলে প্রকৃত বামপন্থী নন। এদের কারো কারো প্রতি আমি ব্যক্তিগতভাবে

শ্রদ্ধাশীল। তাদের সততা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা যখন ক্ষমতার লোভে তকমা লাগিয়ে সরকারে যোগ দেন তখন বামপন্থী হিসাবে এমনিতে কষ্ট পাই। কষ্টটা আরো বাড়ে যখন দেখি তারা যে রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ করছেন সেটি লুটেরা ধনিক শ্রেণীর রাজনীতি। বামপন্থী থেকে যারা আদর্শকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বিভিন্ন সরকারে গিয়ে হালুয়া রুটির ভাগ নিয়েছেন, আমি তাদের রাজনৈতিক বিট্রেয়ার বলি। আমার বক্তব্যের পর অনেকে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তবে পাঠকদের ব্যাপক সমর্থনও পাওয়া গেছে আমার বক্তব্যের পক্ষে।

প্রশ্ন : দুই জোটের বিকল্প বামপন্থীরা হতে না পারলে অন্য বিকল্প কী হতে পারে?

উত্তর : অসাংবিধানিক শক্তির উত্থান। সেটা কাম্য নয়।

প্রশ্ন : ভারতের সাথে সম্পকর্কে কী ধাঁচে দেখতে চান?

উত্তর : সমমর্যাদার সম্পর্ক চাই। ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নত হোক এটা চাই। তবে নতজানু হয়ে নয়। টিপাইমুখ বাঁধের পরিকল্পনা থেকে ভারতকে অবশ্যই সরে আসতে হবে। এই বাঁধ হলে শুধু বাংলাদেশ নয়, পূর্ব ভারতও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রশ্ন : ড. ইউনূসকে নিয়ে সরকারের কর্মকাণ্ডকে কীভাবে মূল্যায়ন করছেন।

উত্তর : সরকার ড. ইউনূসকে যেভাবে অপদস্থ করেছে তা প্রত্যাশিত ছিল না। একটা সুন্দর ও সম্মানজক সমাধান সরকার করতে পারতো। করেনি, এর কারণ বোধগম্য নয়। যদিও আমি মনে করি কেবল ক্ষুদ্র ঋণই দারিদ্র্য বিমোচনে যথেষ্ট নয়, তবুও ড. ইউনূসের সার্বিক ভূমিকার আলোকে সরকারের আচরণ ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত।

প্রশ্ন : সিপিবি-বহির্ভূত বামপন্থীদের প্রতি আপনার আহবান কী?

উত্তর : আমি সব বামপন্থী দলের প্রতি ঐক্যের আহ্বান জানাচ্ছি। সম্ভব হলে একটিমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে সবাই সমবেত হোন। ছোটখাটো বিতর্ক বিভেদ ভুলে যান। অবশ্য আদর্শিক ও তাত্ত্বিক বিতর্ককে ধামাচাপা দিয়ে নয়, আলোচনার মাধ্যমে ছাড় দেয়ার মনোবৃত্তি নিয়ে এগিয়ে আসুন। তাহলে বামপন্থীরা তৃতীয় ও বিকল্প কার্যকরী শক্তি হিসাবে দাঁড়াতে পারবে।

প্রশ্ন : প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

উত্তর : প্রবাসী ভাইবোনদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যেখানেই থাকুন না কেন, সবাইতো বাংলাদেশেরই অংশ। বাংলাদেশ ভালো থাকলেই আমরা সবাই ভালো থাকব।

ঢাকা, ২৩ এপ্রিল ২০১১

প্রশ্ন : মহাজোট সরকার কেমন চালাচ্ছে বাংলাদেশ?

উত্তর : খুব বাজে। তিনটি বড় ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হয়েছে, চাল-সহ জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়েছে, গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানি দিতে পারছে না, শেয়ার বাজার লুণ্ঠনের কারণে হাজার হাজার মধ্যবিত্তের সর্বনাশ হয়ে গেছে। মানুষের কষ্টে সঞ্চিত অর্থ নিয়ে গেছে কিছু লোক। তাদের ব্যর্থতার অন্ত নেই, তাই এই মহাজোট সরকারের জনপ্রিয়তা এখন শূন্যের কোঠায়।

প্রশ্ন : বিরোধী দলগুলো জনগণের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারছে?

উত্তর : না, সেখানেও আশার আলো নেই, অন্ধকার। জনগণের আসল সমস্যার কথা না বলে তারা অবান্তর ইস্যু নিয়ে মাতামাতি করছে। প্রধান বিরোধী দল জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়নি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে তারা নীরব রয়েছে। বাহাত্তরের সংবিধান পুনরুজ্জীবনে তারা বিরোধিতা করছে। মৌলবাদীদের সঙ্গে তাদের সখ্যতা রয়েছে বলে জনমনে যে সন্দেহ তা তারা দূর করতে পারেনি।

প্রশ্ন : সবদিকেই নিরাশা বলতে চান?

উত্তর : হ্যাঁ, বাংলাদেশের জনগণ সংকটময় সময় অতিবাহিত করছে। দুই জোটের বিকল্প হিসেবে বামশক্তি দাঁড়াতে পারতো। কিন্তু ক্রমাগত ভাঙনের কারণে তারা দুর্বল। বামরা প্রধান শক্তি হয়ে উঠতে পারছে না।

সাপ্তাহিক আজকাল, এপ্রিল ২০১২

তিন. মমতাজউদদীন আহমদের মুখোমুখি

অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ আমাদের কাল ও শিল্প-সংস্কৃতির প্রাজ্ঞ অভিভাবক। মুক্তিযুদ্ধের মহান চেতনার বিরামহীন ধারক, মানুষের জাগতিক ও আত্মিক মুক্তির লাগাতার সংগ্রামে নিয়োজিত শৈল্পিক সৈনিক এবং সাহসের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত । নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে কর্মরত থাকার সময় তাঁর সংগে আন্তরিক আলাপ হয়েছে। সে আলোচনায় কয়েকটি বিষয়ে তার তাৎক্ষণিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমত প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার পর্যবেক্ষণ কী?

উত্তর : বলে রাখি আমার জন্মভূমি বাংলাদেশ সম্পর্কে আমার অন্ধ আবেগ আছে। মায়ের মতো জানি আমার দেশকে। বাংলা সাহিত্যের রচনার ইতিহাস হাজার বছরের দীর্ঘ। বিচিত্র বিষয়ে ও অনুভবের সাহিত্য বাংলা। মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর আধুনিক শিল্পবোধ ও মানবিক চেতনাবোধ আমাকে বিস্মিত করে। বাংলার সংস্কৃতি ও দীর্ঘ আচরণের ফসল। নানাভাবে একটি জাতির সাংস্কৃতিক স্বরূপ বিকশিত ও প্রকাশিত হয়ে ওঠে। এর সংগে প্রতিদিনের খাদ্য, জলবায়ু, প্রকৃতি, রাজনীতি ধর্ম এবং অর্থনৈতিক উত্থান ও পতনের নিবিড় যোগাযোগ। এতদিনের আচরণ ও লোকাচারেঋদ্ধ বাঙালি জাতি। নিত্য প্রবাহমান সঞ্চরণশীল জাতির মধ্যেই প্রাণের সঞ্চার। তাতেই জীবনের বেঁচে থাকার লক্ষণ।

বাঙালি ভোগবাদী, ত্যাগবাদী, নৈরাশ্যবাদী আবার প্রচণ্ডভাবে আশাবাদী। এমন স্বভাবের জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতি কি অনড় অচল হতে পারে?

প্রশ্ন : যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কে আপনারার অভিমত ?

উত্তর : কেবল যুদ্ধকালীন অপরাধ নয়, সকল অপরাধের বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। যুদ্ধ তো মুক্তিযুদ্ধ। বাঙালি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধের রক্তপাত আর লাঞ্ছনার মধ্যে বাঙালি পুনরায় তার শক্তিকে খুঁজে পেয়েছে। স্বাধীনতা অর্জন এ তো সহস্র

বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন। পাকিস্তানিরা তো তাদের মোহের আর ক্ষমতার লালসা সহজে ছেড়ে দিতে চায়নি। মরিয়া হয়ে বাঙালি নিধন করেছে। কিন্তু অবশেষে পরাজিত হয়ে মাথা নিচু করে পালিয়ে বেঁচেছে। তারা তো এদেশের আঁতিপাঁতি কিছুই জানতো না। তারা যে ঘরে ঘরে ঢুকে মানুষ হত্যা করেছে, নারী নির্যাতন করেছে আর তাদেরকে যেসব কুলাঙ্গার স্বদেশী উপযাজক হয়ে বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাহায্য করেছে বা তাদের নৃশংসতার কাজে সহায়ক হয়েছে তারাই যুদ্ধাপরাধী। এমন সব অপরাধ করেছিল জার্মানের কিছু নাগরিক। তারা নির্বিচারে ইহুদি হত্যা করেছে বা ইহুদি নিধনের আয়োজন করেছিল। সুবিবেচনায় তারাই পরবর্তীকালে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যত দূরেই পালিয়ে যাক, যত দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাক, তাদের ধরে আনা হয়েছে, দরকারে তাদের ফাঁসি হয়েছে বা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এমন হয়েছে কম্বোডিয়ায়, হয়েছে বুয়াবায়।

বাংলাদেশেও এরকম বহু নরখাদক আছে। তাদের কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলার নিরীহ নিরপরাধ মানুষ হত্যার কাজে সহায়তা করা। তারা নারী নির্যাতনের সহায়ক, অগ্নি সংযোগে ও সম্পত্তি বিনাশ করার কাজে তারা ছিল উদ্যোগী। এতদিন তাদের বিচার হয়নি। যেহেতু তাদের সহমর্মীরা বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের কারণে ক্ষমতায় ছিল, তাই তারা নিরাপদে বাস করেছে। এখন গণতান্ত্রিক এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার ক্ষমতায় এসেছে। অপরাধীদের বিচার শুরু হয়েছে। বিচারের জন্য তথ্য এবং সাক্ষী সাবুদ সংগ্রহ করা হয়েছে বা তার প্রক্রিয়া চলছে। অতএব এদের বিচার হওয়া প্রয়োজন। যদি নিরাপধ প্রমাণিত হতে পারে তবে মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু দোষী প্রমাণিত হলে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। তা যদি মৃত্যুদণ্ড হয়, তাও সই। কিন্তু যুদ্ধাপরাধীকে শাস্তি পেতেই হবে।

প্রশ্ন : আমেরিকা আপনার কাছে নতুন দেশ। আমেরিকার প্রবাসী বাঙালিদের সম্পর্কে আপনার ধারণা বলুন ।

উত্তর : আমেরিকা আমার কাছে মোটেও নতুন ক্ষেত্র নয়। এবার না হয় একটা কর্মদ্যোগ নিয়ে এসেছি, কিন্তু এর আগে এসেছি নাট্যকলা বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য, এসেছি আমার সন্তানদের সংগে মিলিত হবার জন্য অথবা বেড়াবার জন্য। তাই বলি, আমেরিকা বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক আমার অপরিচিত ক্ষেত্র নয়। তবে হাঁ, আমেরিকার জনগণের পরিচয় আমার সম্যক জানা নেই। তাদের জীবনাচরণও আমার অনুধাবনে শতভাগ প্রকাশিত নয়। এদের খাদ্য, পোশাক-আশাক, এদের সময়নিষ্ঠা বা প্রাত্যহিক ও দাম্পত্যজীবন বিষয়ে আমি সামান্য ধারণা রাখি। তাছাড়া আমেরিকার নিজের মানুষ কোথায়। সবাই তো বাইরের মানুষ। এদেশ তো ল্যান্ড অফ ইমিগ্রান্টস। দুনিয়ার প্রায় সব দেশ-মহাদেশ থেকে দলে দলে মানুষ আমেরিকায় এসেছে। পাশের দেশের মানুষও প্রতিদিন প্রতিমাসে তরঙ্গের মতো আসছে। কারণ হলো আমেরিকা একটা নিয়মের দেশ, শাসন শৃঙ্খলার দেশ। আর বসবাসের জন্য সর্বজনীন দেশ। এখানে কালো সাদা নারী পুরুষ অক্ষম সবলে ভেদ নাই। এখানে ভেজালহীন খাদ্য সুলভে ও সহজে পাওয়া যায়। এখানে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিবিধ সুযোগ সুবিধা আছে। আর খেয়ে পরে থাকার মতো ব্যবস্থাও আছে। এদেশে অনেক বিত্তবান কিন্তু লাখ লাখ মধ্যবিত্ত

আর হাজার হাজার গৃহহীন খাদ্যহীন মানুষও আছে। এখানে আমোদ আছে, আহলাদ আছে তার সংগে আছে নিত্য জীবন সংগ্রাম আর উৎকণ্ঠা। তবু একটা শান্তি আছে যাকে বলে সামাজিক নিরাপত্তা। গভীর নিশীথেও আপনি নারী বা পুরুষ একা একা নগরের পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবেন।

এরকম অবস্থার মধ্যে বাঙালিরা এখানে বাস করছে। এক এই বৃহত্তর নিউ ইয়র্ক নগরের পাঁচ প্রান্তে প্রায় দেড় লাখ বাঙালি বসবাস করছে। এদের সকলেই বৈধ বা সিদ্ধ পরিচয়ের তা হয়তো বলা যাবে না। কিন্তু তবুও আছে। সংখ্যা বাঙালির ক্রমেই বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাড়বে আর নতুন নতুন করে বাংলাদেশের মানুষ আসবে। সকলেই সুখে আছে, তেমন নয়। এই তো সেদিন জ্যাকসন হাইটসে একজন স্বচ্ছল বাঙালি নৈরাজ্যের বেদনায় ক্লান্ত হয়ে আত্মাহুতি দিল। তবু বলি প্রবাসে বাঙালিরা ভালো আছে। আমি তো একজনও বাঙালি ভিক্ষুক দেখিনি। অন্যান্য শহরেও বিস্তর বাঙালি। ছোট বড় প্রত্যেক শহরে। নানা কাজে, নানা রকম ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্যবসা বাণিজ্যে সবাই জড়িয়ে আছে।

এখানে এসে কেউ অবশ্য জন্মভূমি বাংলাকে ভুলে যায়নি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখি বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তর চর্চা হচ্ছে। বাঙালির বিভিন্ন উৎসবের দিনে বাংলার মানুষ বাংলা কবিতা, গান ও নৃত্য পরিবেশন করছে। জন্মভূমির কথা বারে বারে বলছে। দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল আহবান আছে তাদের। কিন্তু ফিরতে পারছে না। আর বোধহয় ফেরা হবে না। মাত্র দ্বিতীয় প্রজন্ম চলছে, তাতেই বাংলার শিশু কিশোররা বাংলা ভুলে ইংরেজি ভাষায় দক্ষ ও সচল হয়ে উঠেছে। তৃতীয় চতুর্থ প্রজন্মে হয়তো বা বাংলার কোনো নিশানা আর থাকবে না। ভাষা থাকবে না, সংস্কৃতি চর্চা থাকবে না, বাংলার খাদ্য থাকবে না। হয়তো বাঙালির সংগে বাঙালির দাম্পত্যজীবনও গড়ে উঠবে না। তখন কী হবে!

তবে কি প্রবাসের বাঙালিরা মেল্টিংপটে গলে গিয়ে মণ্ড পাকিয়ে অন্যরকম হয়ে যাবে। যেমন আফ্রিকানরা হয়েছে, ইউরোপীয় স্পানিসরা হয়েছে। চীনারা, কোরিয়ানরা হয়ে যাচ্ছে। তেমনি কি বাঙালিরা হয়ে যাবে। বাঙালি কি জানবে না ঈদ কী, একুশে ফেব্রুয়ারি কী, বিজয় দিবস কী? রবীন্দ্রনাথ নজরুল কি অন্ধকারের অতলে হারিয়ে যাবে! কী হবে পঞ্চাশ বছর পরে এই সর্বগ্রাসী আমেরিকায়?

আমি বলি, যাবে না। বাংলার জীবনবোধ, বাংলার দেহগঠন, বাংলার স্বভাব আচরণের সংগে বাঙালির নিজের যে চিরকালীন সংযোগ আছে তা কি হারিয়ে যেতে পারে? ব্যক্তি মানুষ হয়তো হারাবে কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাঙালি মানসের চেতনার স্বরূপ হারাবে না। জন্মভূমির যে মৃত্তিকা সম্পৃক্ত সম্পর্ক সেই শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না অভিবাসী বাঙালি। একটা ধারা, তা ক্ষীণ হোক বা প্রবল হোক– তা বইতেই থাকবে।

বাঙালি হয়তো সর্বতোভাবে বাঙালি হয়ে জেগে থাকবে না কিন্তু বাঙালির স্বরূপ একেবারে হারিয়ে যাবে না। আজকের বাঙালি আর আগামীর বাঙালির মধ্যে ব্যবধান হবে কিন্তু তখনো বাংলার হাসিকান্না মান অভিমান নিয়ে আমেরিকান বাঙালির ঘরে বাংলার স্বাধীনতা দিবস উপযাপিত হবে। তখনো রবীন্দ্র সংগীতের সুরধ্বনি বাঙালির কোনো কোনো ঘরে ঘরে শোনা যাবে। বহতা স্রোতে কি জীবনের শূন্যতা কাঁদে? না,

তা হয় না। স্থির হলেই পচন ধরে কিন্তু যে জীবন চলমান, নিত্য সঞ্চরণশীল সে জীবনেই জীবন জেগে থাকে। তাই বাঙালি থাকবে। অবশ্যই থাকবে। মার্কিন বাঙালিও থাকবে।

প্রশ্ন : দার্শনিক মননের ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে গেছি। চিন্তার রাজ্যে নানা আলোড়ন চলছে। এমন কোলাহল কালে আপনার অবস্থান কী?

উত্তর : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়ে গেল। দশবছরে কয়েক কোটি মানুষের জীবন গেল। আরো কিছু আঞ্চলিক যুদ্ধ কলহে প্রতিদিন মানুষ মরছে। এইতো আফগানিস্তান পাকিস্তানে কি কম মানুষ মারা যাচ্ছে। ইরাকের যুদ্ধে কত মানুষ আর শিশু মরেছে তার হিসাব তো হয়নি।

এই মৃত্যু, মৃত্যু আর মৃত্যুর পাহাড়ের মধ্যে ক্ষমতা দখলের ও সম্পদ লুণ্ঠনের নানা ফিকির আছে কিন্তু কোথাও মননের চাষ নাই। এখন শান্তির কথা, বিশ্রামের কথা বা আনন্দের কথার কোনো মূল্য নাই। খালি নৈরাচার, নৈরাশ্য আর ক্লেদ। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ব্যভিচার, হত্যা, লুণ্ঠনের কাহিনী। কে কাকে মারবে, কে কাকে পিছনে ফেলে ছুটে সামনে যাবে তারই নগ্ন প্রতিযোগিতা চলছে সবখানে।

এসবের মধ্যে দর্শনের নীরব চর্চা কোথা হতে হবে? কে হোমার, কে হবে বেদব্যাস? এখন তো অস্থিরতা আর আস্ফালন। এই যে আমেরিকা – এদেশের শাসকরা তো শান্তির কথা বলে বলে মুখে ফেনা তুলছে, কিন্তু গোপনে বানাচ্ছে মারণাস্ত্র। খালি ষড়যন্ত্র আর দখলদারির পাঁয়তারা। এর মধ্যে আর কোথায় সক্রেটিস প্লেটো আসবে? কে সকাল বিকাল অনুগত শিক্ষার্থীদের জীবনের স্নিগ্ধ দিক নিয়ে কথা শেখাবে? আর শিক্ষার্থীরাই বা তা শিখবে কেন? শান্তির কথা, আনন্দের কথা বা বিশ্রামের কথা শোনার সময় কোথায়? দেখছি তো, এই নিউ ইয়র্ক শহরেই সবাই কেবল ছুটছে। কারো বিশ্রাম নাই। কেবল ছুটে চলা। এই অস্থিরতা কেন?

তা কেবল কোনো রকমে বেঁচে থাকার জন্য। এদের জিজ্ঞেস করে দেখেন কেউ সুখের কথা বলতে পারবে না, কেউ শান্তির নীড়ের সন্ধান দিতে পারবে না। সব অনিশ্চয়তা। সবখানেই সংকট ও সংহার।

এমন সময়ে কি মননের চাষ সম্ভব? এমন দুর্দিনে কি পৃথিবীকে আলিঙ্গন করা যায়? যেখানেই নিশ্বাস নেই, কেবল বারুদের গন্ধ পাই, সবখানে। এখন দর্শন আর মনন নির্বাসিত। আমি তেমনি নির্বাসিত একজন এই অভিশপ্ত পৃথিবীর নাগরিক। বড় দুঃখ আমার, বড় যন্ত্রণা আমার। বাঁচব কেমন করে। এই তো আমার দর্শনের সন্ধান। আর কী?

প্রশ্ন : বাংলাদেশের এখনকার টেলিভিশন নাটক সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

উত্তর: কিছু বলতে চাই না। যত কম বলা যায়, ততই ভালো। আমরা তো বাংলার শুদ্ধ জীবনের কথা, সংগ্রামের কথা, জীবনবোধের কথা শুনতে চাই, শোনাতে চাই। তেমন কিছু কি পাওয়া যাচ্ছে? সবই তো কেবল আনন্দ ফূর্তি, আনন্দ রসিকতা। ফাজলামি আর ফিতলামি। এসব তো বাংলার জীবন নয়। না, আর বেশি কথা বলব না।

প্রশ্ন : এই মিশনে আপনার কর্মোদ্যগ নিয়ে কিছু বলুন।

উত্তর: হ্যাঁ আমি বাংলার সংস্কৃতি সঞ্চারের জন্য বিশেষভাবে আহূত হয়ে মিশনে এসেছি। বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি, গান, শিল্প বিদেশের কাছে উদ্ভাসিত করার কাজ আমার। মোট কথা আমার দেশকে বিদেশের কাছে স্বরূপ উদ্ভাসিত করা আমার লক্ষ্য। সরকারি মিশনের অনুশাসনের একটা সীমারেখা আছে। এই সীমারেখার মধ্যে কাজ করার সুবিধা আবার অসুবিধাও আছে। যা করতে বলা হয়, তা নির্বিচারে করা যায় না। আবার যা করতে চাই, তা করার জন্য সম্পদ ও সুযোগ পাওয়া যায় না। যেমন, বাংলার একটি লোকনাট্যকে মঞ্চে আনতে চাই। তারজন্য বিপুল আয়োজন দরকার। শিল্পী চাই, মঞ্চ চাই অন্যান্য অপরিহার্য উপকরণ চাই। এতসব তো মিশন দিতে পারবে না। অথবা থাইল্যান্ডের লোকসংগীতের আয়োজন করতে চাই। তার ব্যবস্থা কি সীমাবদ্ধ সুযোগে করা যাবে।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলার আন্দোলন, বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি। কেবল বাংলা ভাষা নয় বিশ্বের অন্তত আরো দশটি ভাষা নিয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আলোচনার জন্য আয়োজন করতে ইচ্ছা আছে। যেমন কাজে যে পরিমাণ জোগাড় থাকা দরকার তা হয়তো পাব না। কিন্তু তবু চেষ্টা করে যাব। নজরুল গীতির বৈচিত্র্য ও সম্পদ নিয়ে বিদেশিদের কাছে হাজির হওয়ার ইচ্ছা আছে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য শ্যামাকে মঞ্চে তোলার বাসনা আছে। এজন্য বিপুল আয়োজন দরকার।

এতসব বড় কাজ মিশনের মূল কাজের সংগে সংযুক্ত করে জাতিসংঘের আয়োজনের মধ্যে সম্পাদন করা যাবে না– এজন্য একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্র দরকার। বাংলার সংস্কৃতি কেন্দ্র। তেমন একটা উদ্যোগ সরকার নিয়েছেন। হয়তো অল্পদিনের মধ্যেই দিল্লী, লন্ডন এবং নিউ ইয়র্কে বাংলা সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু হবে। সেই কেন্দ্রের মাধ্যমে বড় কাজ সহজে হবে।

প্রশ্ন : বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে আপনার অভিমত কী?

উত্তর : বাংলার শব্দ ভাণ্ডারের আয়তন সামান্য নয়। দেশি, সংস্কৃত, বিদেশি আর আধুনিক বহু ভাষা ও শব্দের সমন্বয় বাংলা ভাষায়। প্রতিদিন চলমান পৃথিবীতে প্রয়োজনে নতুন নতুন শব্দ সংযোজিত হচ্ছে। তেমন শব্দ আমাদের ভাষাতেই ঢুকছে। ক্ষতি নেই, সেটা যদি আমাদের ভাষা গ্রহণ করতে পারে। আমাদের ভাষা আরো সমৃদ্ধ হবে।

এই যে মার্কিন দেশের শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধির জন্য এত উদারতা তাতো কেবল দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই সম্ভব। আমি চলমান জীবনের অনেক কিছু বহন করতে চাই। তেমন উদার নিরঙ্কুশ মন থাকলে, প্রতিনিয়ত নতুন শব্দ ও ধ্বনি এসে আমাকে সমৃদ্ধ করবে। এই যে মেইন স্ট্রিমে বাঙালিরা ক্রমেই ঢুকে পড়ছে মার্কিন দেশে, তাতো আর সামান্য আয়োজনে হবে না। আমাদের তৈরি হতে হবে।

উদারভাবে মার্কিন শব্দ নিতে হবে, আমাদের বোয়াল মাছ, শিঙ মাছ আর কদু খাদ্যকেও মেইন স্ট্রিমে ঢোকাতে হবে। ওদের আমরা চিনব, আমাদের ওরা চিনবে। আমরা যেমন হুইটম্যানকে চিনব, আমাদের নজরুলকে ওরা চিনবে। মার্ক টোয়েনকে যেমন আত্মীয় করব তেমন মুজতবা আলীকে ওরা চিনবে।

এভাবে দেয়া-নেয়াতে আত্মীয়তা গাঢ় হবে। আমরা আন্তর্জাতিক হব। এমনি করেই বিশ্ব নাগরিক হব। চার্লি চ্যাপলিন আর আইনস্টাইন তো এমনি করেই বিশ্বের কাছে চিহ্নিত হয়েছেন। বিশ্বের লাভ হয়েছে।

আমার কথা হলো এখন আর আমি একটা ছোট্ট ভূখণ্ডের অচেনা নাগরিক নই। আমিও বিশ্ব নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকব। তবে মূলভূমি বাংলাকে কখনো অস্বীকার করব না। বাংলার হয়েই, বাংলার থেকেই আমি বিশ্ব সভায় আমার ভাষা, শব্দ, সংস্কৃতিকে উদ্ভাসিত করতে চাই। এরজন্য উদার মন আর সংস্কারহীন আবেগ ও গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে। এ সাধনা কেবল একদিনের বলাতে বা অভ্যাসে হবে না। সময় লাগবে, এক এক করে দীর্ঘ দিন।

যদি নিষ্ঠা থাকে, ঐকান্তিকতা থাকে, তবে আমি আমার ভাষা সংস্কৃতি সম্পদ নিয়ে বিশ্বের ভাণ্ডারে হাজির হব, সেই ভাণ্ডার থেকে প্রাণভরে আহরণ করব। আমি বিশ্বকে সমৃদ্ধ করব, বিশ্ব আমাকে সমৃদ্ধ করবে। তাতেই আমার জনম সার্থক, জীবন সফল।

সাপ্তাহিক আজকাল, ফেব্রুয়ারি ২০১১

চার. ড. নূরন নবীর মুখোমুখি

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার যুদ্ধ নিয়ে এ-পর্যন্ত প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের কাতারে সম্প্রতি সামিল হয়েছে ইংরেজিতে অনূদিত 'বুলেটস অব সেভেনটি ওয়ান।' লেখক ড. নূরন নবী।

ড. নবী স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রণাঙ্গন ও কূটনৈতিক প্রয়াসে যেমন নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন, তেমনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন স্বাধীনতাযুদ্ধের পটভূমি-ইতিহাস রচনায়ও। গ্রন্থে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র-পর্বের পাশাপাশি রয়েছে যুদ্ধের প্রাক-পরিবেশের কথা।

ড. নবী তাঁর কালের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রাম ও জাতীয় স্পন্দনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন, রাজনৈতিক মতবাদে একই জায়গায় অবিচল রয়েছেন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বহন করে অঙ্গীকার পালন করে যাচ্ছেন এখনো– নিজের অবস্থানে থেকে, স্বদেশ থেকে অনেক দূরে বসেও।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিল একটি গণযুদ্ধ, জনগণের যুদ্ধ, এই সত্য যারা অকপটে স্বীকার করেন ড. নূরন নবী তাদের অন্যতম। তাঁর উপলব্ধি হচ্ছে, মুষ্টিমেয় বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ যুদ্ধ করেছেন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। কেউ সশস্ত্র যুদ্ধ করেছেন, কেউ কেউ সাহায্য-সমর্থন দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন যুদ্ধকে। সেই গণযুদ্ধে দলমত-ধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে অংশ গ্রহণ করেছে গোটা জাতি; স্বীকার করেছে বলীয়ান আত্মত্যাগ।

তাঁর গ্রন্থে এসব লেখার পাশাপাশি তিনি বলেন, আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে ভারত সাহায্য-সহায়তা করেছে। তাদের অবদান অতুলনীয়। এমনকি ভারত আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ সফল করতে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়েছে। তাদের অবদান অস্বীকার করলে সত্যকে অস্বীকার করা হবে। একাত্তরে আমাদের লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা

অর্জন আর ভারতের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানকে পরাজিত করা। দু'টি লক্ষ্যের মিলন হয়েছিল তখন। আমরা দুই পক্ষই যার যার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছি।

তিনি তাঁর গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের সফল নেতৃত্বের কথা উল্লেখের পাশাপাশি মাওলানা ভাসানীসহ যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকার কথাও বিশদভাবে তুলে ধরেছেন যা সাধারণত কেউ কেউ করেন না।

তিনি বলেন, ষাটের দশক ছিল আমাদের উজ্জ্বল সময়। রাজনীতি, শিল্পসাহিত্য,সংস্কৃতি সবক্ষেত্রেই আমরা লাভ করেছিলাম চরম উৎকর্ষতা। সারা পৃথিবীতে তখন উপনিবেশ-বিরোধী, স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী সংগ্রাম ও বিপ্লবের ঝড় বয়ে গেছে। সেই ঢেউ লেগেছিল আমাদের মধ্যেও। আমি প্রথম দিকে অনুপ্রাণিত হয়েছি জওহরলাল নেহরু, কর্ণেল নাসের, মার্শাল টিটো, হোচিমিন, চেগুয়েভারা প্রমুখের দ্বারা। ষাটের দ্বিতীয়ভাগে অবিসম্বাদিত নেতা হিসেবে উত্থান ঘটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। তার নেতৃত্বে ও আদর্শে নিজেকে সমর্পণ করেছি তখন।

"উনসত্তুরের মহান গণঅভ্যুত্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় পর্যন্ত এদেশে প্রচলিত হয়েছিল জনতার স্বশাসন। পাকিস্তানি শাসকরা ব্যাপৃত ছিল হত্যাযজ্ঞ ও দমন-নিপীড়নে। মানুষ নিজেকে নিজে শাসন করেছে। দেশে চুরি-ডাকাতি ছিল না, জিনিসপত্রের দাম বাড়েনি, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার উদ্যোগে গণআদালত পর্যন্ত গঠিত হয়েছিল। বিশেষ করে টাঙ্গাইলে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে যুদ্ধের পাশাপাশি মুক্তঞ্চলে গণপ্রশাসন গড়ে উঠেছিল। যেসব প্রয়াসের মাধ্যমে জনগণ জানিয়ে দিয়েছিল তারা কেমন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা চায়। কিন্তু স্বাধীনতার পর সেই গণপ্রত্যাশার সম্প্রসারণ কেন ঘটেনি" – এমন প্রশ্নের উত্তরে ড. নূরন নবী বলেন, পৃথিবীর দেশে দেশে বিপ্লব বা উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রামে বিজয়ের পর মুক্তিযোদ্ধারাই সাধারণত ক্ষমতা পরিচালনা করেন। কিন্তু বাংলাদেশে যুদ্ধের পরপরই মুক্তিযোদ্ধাদের নিষ্ক্রিয় করে যার যার ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ ধরনের আরো কিছু ভুলের সুযোগ গ্রহণ করে স্বাধীনতা-বিরোধীরা। অবশ্য বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে ক্রমান্বয়ে স্বপ্ন পূরণের দিকে যাওয়া যেত। কিন্তু তাঁকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীত দিকে পরিচালিত হতে থাকে দেশ। বিশেষ করে সামরিক শাসন আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। তবুও আমি বিশ্বাস করি আমাদের অসীম সম্ভাবনার বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলো নিয়ে অচিরেই উঠে দাঁড়াবে। আমাদের সব অর্জন স্বাধীনতা পেয়েছি বলেই। স্বাধীন না হলে আজ এ পর্যায়ে আসতে পারতাম না। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র বজায় রাখতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে আইনের শাসন।

ড. নবী প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরণা দিয়ে বলেন, এখানে সততা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের মূল্য আছে। ধৈর্য্য ধরে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে। সম্পৃক্ত হতে হবে মূলধারায়।

সাপ্তাহিক আজকাল, মার্চ ২০১১

পাঁচ. গৌতম ঘোষের মুখোমুখি

গৌতম ঘোষ উপমহাদেশের প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার। বাংলা ক্লাসিকধর্মী বেশ কিছু কথা সাহিত্যের চলচ্চিত্র রূপ দিয়ে সাফল্য ও সুনাম অর্জন করেছেন। বিশেষ করে অন্তর্জলিযাত্রা ও পদ্মা নদীর মাঝি বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয় ও আলোচিত হয়েছে। সম্প্রতি চলচ্চিত্রে রূপ দিয়েছেন মরমী সাধক লালন ফকিরকে নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'মনের মানুষ' উপন্যাসের। এই ছবি শুধু সুনামই অর্জন করেনি, বাণিজ্যিকভাবেও বেশ সফল হয়েছে। সারা পৃথিবীতে যখন ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়গত অস্থিরতা বিরাজ করছে তখন লালন ফকিরের মরমী উদাত্ত আহবান সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে সন্দেহ নেই।

মনের মানুষ লালন ফকিরের আক্ষরিক ইতিহাস নয়, নিরেট আত্মজীবনীও নয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ইতিহাস-আশ্রয়ী লেখা এটি। ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাসের বিস্তৃত দিগন্ত ও সুবিধা রয়েছে। মহামতি এরিস্টটলেল ভাষায় "ইতিহাসে সন-তারিখ ছাড়া আর কোনো চিরন্তন মানব সত্য নেই। অন্যদিকে সাহিত্যে-সন তারিখ ছাড়া সবই সত্য। এ সত্যের অর্থ সাহিত্যের সত্য, বাস্তবকে অবলম্বন করলেও বাস্তবকে অতিক্রম করে যায়।" সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর লেখায় বাস্তব অতিক্রম করে সুখপাঠ্য করেছেন উপন্যাসকে; আর গৌতম ঘোষ তাঁর চলচ্চিত্রে যোগ করেছেন আরো অগ্রসর মাত্রা। সব মিলিয়েই মনের মানুষ হয়ে ওঠেছে একটি মহান শিল্প। গৌতম ঘোষের অন্যান্য ছবির মতো মনের মানুষেও সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অঙ্গিকার পালনের পাশাপাশি হাত ধরে হেঁটে চলেছে শিল্পের নান্দনিক সৌন্দর্য এবং আধুনিকতম প্রয়োগ-প্রকরণ। প্রতীকে এবং প্রত্যক্ষে, বাস্তবে এবং পরাবাস্তবে– সব ক্ষেত্রেই উজ্জ্বল রয়েছে শৈল্পিক সৌকর্য। নিউ ইয়র্কে এই ছবির উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে অংশ নিতে গৌতম ঘোষ এখানে তাঁর এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন : আপনার ছবিতে, কিংবা বলা যায় ছবির জন্য আপনি যে গল্প বাছাই করেন সেখানে আমরা প্রায়ই এক নতুনতর বসতি দেখতে পাই। পদ্মা নদীর মাঝিতে সে বসতি গড়েছেন হোসেন মিয়া আর মনের মানুষে গড়েছেন লালন ফকির। কোন ধরনের প্রেরণা থেকে এই বাছাই করেন?

উত্তর : স্বপ্ন থেকে। এসব বসতি স্বপ্নের বসতি, আইডিয়ার বসতি। নবতর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন করে শুরু করার স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখা এবং দেখানোই প্রধান লক্ষ্য।

প্রশ্ন : মনের মানুষ শেষ করেছেন পরাবাস্তব এক নৌযান ও তার আরোহীদের দিয়ে। এই পরাবাস্তবতা কি সেই স্বপ্নের অনুসঙ্গ?

উত্তর : হ্যাঁ, সেই পরাবাস্তবতাও নবতর স্বপ্নকে, নতুনতর জীবনকে সামনে রেখে চিত্রিত হয়েছে।

প্রশ্ন : একজন শিল্প নির্মাতা হিসেবে আপনার চোখে বাস্তবতা থেকে পরাবাস্তবতার দূরত্ব কতটুকু? ইন্দ্রিয় থেকে অতীন্দ্রিয়তা?

উত্তর : আমরা বাস্তবে বাস করি। কিন্তু স্বপ্ন দেখি বাস্তবের জমিনে বসেই। শিল্পীর কাছে এসবের দূরত্ব খুব বেশি নয়। তাছাড়া আমাদের বাস্তব জীবনেও তো ইন্দ্রিয়াতীত বা পরাবাস্তব এমন অনেক ঘটনা ঘটে যার বাস্তব ব্যাখ্যা নেই।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ দুই বাংলাভাষী ছবি পাড়াতেই বাংলা ছবির দুর্দিন চলছে। আপনার পর্যবেক্ষণ কী?

উত্তর : হ্যাঁ, বিকৃতিও চলছে। পশ্চিমা, হিন্দি ও তামিল ছবির অন্ধ অনুকরণ চলছে। চলছে ভিডিও মিউজিকের নৈরাজ্যও।

প্রশ্ন : আপনি এবং উৎপলেন্দুসহ একটি গ্রুপ যে ধারা গড়ে তোলার সংগ্রাম করছেন তাকে এগিয়ে নিতে নতুন প্রজন্মের মেধাবীরা কি এগিয়ে আসছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তা আসছেন। ভবিষ্যত নিয়ে আমি আশাবাদী।

প্রশ্ন : প্রতি বছর অসংখ্য হিন্দি স্থূল বাণিজ্যিক ছবির পাশাপাশি আগে শ্যাম বেনেগাল, গোবিন্দ নেহালিনী, মোজাফ্‌ফর আলী, সুবাস ঘাই প্রমুখের সুস্থ-দায়বদ্ধ ধারার ছবিও দর্শকরা দেখতে পেতেন। এদের ধারাটা দিন দিন ক্ষীয়মান হয়ে আসছে কেন?

উত্তর : আগেই বলেছি, নৈরাজ্য-বিকৃতি গ্রাস করে চলছে সব। এর মধ্যে অনেক ভালো ছবিও হচ্ছে। আশা ছেড়ে দেয়ার কিছু নেই।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের কোনো লেখকের গল্প-উপন্যাসের চলচ্চিত্র রূপ দেয়ার পরিকল্পনা আছে?

উত্তর : হ্যাঁ আছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই নিয়ে ছবি বানাব।

উত্তর : হ্যাঁ, অনেকদিন থেকে ভাবছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ছবি করার। সে ইচ্ছা বহাল আছে। অপেক্ষায় আছি।

প্রশ্ন : ঘটনার কাছাকাছি সময়ে ছবি করতে গেলে অনেক সময় আবেগ বস্তুনিষ্ঠতাকে অতিক্রম করে ফেলে। আপনি কি আবেগ আরো থিতিয়ে আসার অপেক্ষা করছেন?

উত্তর : আমি স্থান, কাল, পাত্র, সুযোগ সব কিছুর জন্যই অপেক্ষা করছি।

সূচীপত্র

Jemon Dekhechi One Eleven
by Ahmed Musa
Published by Sucheepatra
Cover Design : Niaz Chowdhury Tuli
sucheepatra>dhaka>bangladesh
e-mail : saeedbari07@gmail.com

ISBN 978-984-8558-06-5